চিকিৎসক ও সমালোচক।

ভূমিকা।

চিকিৎসা বিষয়ক, সাহিত্য, কবিতাদি, জ্যোতিষ, উপন্যাস প্রভৃতি নানা বিষয়িনী প্রবন্ধ এই পত্রিকায় আলোচিত ও প্রকাশিত হইবে বলিয়া উহা উপরোক্ত নামধেয় হইল। চিকিৎসক সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিকিৎসার ইতিহাস, পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্মীলনতা বা সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান তদ্বিষয় অগ্রে বর্ণনা আবশ্যক। এবং বর্ত্তমান সময়ে যদিও চারি প্রকার চিকিৎসা প্রণালী ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশেও প্রধানতর প্রতিষ্ঠি আছে কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে ত্রিবিধ আমাদিগের বক্ষ্যমান ও আলোচনীয় বিষয় এবং তাহা এই পত্রিকায় সন্নিবেশিত হইবে। এই তিন প্রকার যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদীক, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নামে অবিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে হিন্দুদিগের "আয়ুর্ব্বেদীক চিকিৎসা সর্ব্বাধিক পূর্ব্বতন এবং হোমিওপ্যাথিক নিতান্ত আধুনিক। এখানে বলা আবশ্যক যে, পুরাকালে সভ্যজাতির মধ্যে (হিন্দু, গ্রীক, মীশর আরব,) চিকিৎসা শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রের আনুসঙ্গিক ছিল। আমাদিগের মুনি, ঋষিরাই চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। কতদিন পূর্ব্ব হইতে যে ইহার উদ্ভাবন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কারণ, মনুষ্য সৃষ্টির পর যখন রোগের সৃষ্টি হয়, তখন হইতে যে উহার আরোগোপায় হইয়াছে, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। যাহা হউক অত্রি মুনি যে আত্রেয় সংহিতা বা চরক সংহিতা নামক চিকিৎসা গ্রন্থ লিখিয়া যান উহাই হিন্দুদিগের আদি চিকিৎসাশাস্ত্র। ধন্বন্তরী যিনি ইন্দ্রসভায় দেবচিকিৎসক ছিলেন, তিনি জগৎ হিতার্থে দিবোদাস নামে বারানসীতে জন্ম পরিগ্রহ করিলে, তৎসন্নিধানে বিশ্বামিত্র পুত্র সুশ্রুত

চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তৎকর্ত্তৃক যে সুবিখ্যাত চিকিৎসা শাস্ত্র বিরচিত হয়, উহা আয়ুর্ব্বেদ বা সুশ্রুত বলিয়া বিদিত আছে। ইহা প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল। অর্থাৎ প্রথম খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি রোমান এম্পারার অগাষ্টাস্ সিজরের সমকালিন। এই সময়ে বা কিছু পরে বায়ভট্ট কর্ত্তৃক আর একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণীত হয়। এবং ইহার পর আরও কএকখানি গ্রন্থ প্রণীত হয়। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের অন্য প্রকার চিকিৎসা প্রকরণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক, তন্ত্রশাস্ত্রান্তর্গত আছে। পরে মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুশীলন বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। সুতরাং উহার উন্নতি পথ এককালে রুদ্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক আধুনিক আমাদিগের চিকিৎসা গ্রন্থ মধ্যে চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ, ভৈষজ্য-রত্নাবলী ও আরও কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ, বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসা। এই চিকিৎসার উৎপত্তি গ্রীস্ দেশ। গ্রীকেরা হিন্দুদিগের পরই সভ্যজাতি মধ্যে গণ্য, সুতরাং ইহাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র হিন্দুদিগের পরই পূর্ব্বতন বলিতে হইবে। গ্রীকদিগের সূর্য্য দেব (এপলো)-পুত্র ইস্কলোপিয়েস্ চিকিৎসা শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার স্মরণার্থে বিবিধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরের পুরোহিতেরা কেবল মাত্র চিকিৎসা শাস্ত্র জ্ঞাত ছিলেন এবং এইরূপে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। পরে এই অনুষ্ঠিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে অর্থাৎ পুরোহিত বংশ ব্যতীত অপর ব্যক্তি যখন ছাত্ররূপে পরিগণিত হয়, তখন হিপক্রেটিস্ নামা জনৈক এথেনিয়েম এই শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যান, সুতরাং তাঁহাকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার জন্মদাতা বলিয়া আরোপিত হইয়া থাকে। হিপক্রেটিস যে সুশ্রুতের পূর্ব্বতন ছিলেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে; কারণ তিনি ৪৬০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রীসে যে তাঁহার সময়ে বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন ও উহার উন্নিতি সাধন

ও শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহাও অনায়াসে সপ্রমানিত হইতে পারে; যেহেতু হিপক্রেটিস, পিথাগোরস্, প্লেটো, এরিসটটল্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ তদ্‌সমকালীন ছিলেন। এরূপ মীশর দেশে যখন টলেমিরা, বাদসাহ ছিলেন, তখন চিকিৎসা ও অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছিল। পরে গ্রীশ দেশাধিপতি আলেকৃজণ্ডার দি গ্রেট, মীশরে যুদ্ধ প্রলয় উপস্থিত করিলে, তদবধি এই চিকিৎসা প্রণালীর প্রাদুর্ভাব হয়। রোমানদিগের সহিত যখন গ্রীকদের যুদ্ধ বাধে, তখন গ্রীস হইতে যে সকল ক্রীত দাস রোমে আনিত হয়, উহারা অনেকে চিকিৎসা কার্য্য দ্বারা আপনাদের স্বাধীনতা লাভ করে, এবং ইহারাই প্রথম রোমান চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। টাইবিরিয়াস্ এবং ক্লডিয়স, রোমান বাদসাহের রাজত্বকালে গ্যালিনাস্ (গ্যালেন) নামা জনৈক খ্যাতাপন্ন চিকিৎসক এই চিকিৎসাস্ত্রে অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়া যান। এনাটমি বা মানবদেহতত্ব বিষয়ে ইনি অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর পর বাইজ্যান্‌সিও দিগের রাজত্ব কালে চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চ্চা, এক কালে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়, কিন্তু ৬০৪ খৃষ্টাব্দ মহম্মদের সময়, ইহার পুনরভ্যুদয় লক্ষিত হয়। মীশরে গ্রীকদিগের কর্ত্তৃক যে, চিকিৎসাধ্যয়ন বিদ্যালয় অবস্থাপিত হইয়াছিল, তথা হইতে আরবেরা চিকিৎসা পথ প্রথম প্রদর্শিত হয়। ৯০০।১০০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে আরব দেশে কতিপয় খ্যাতনামা চিকিৎসক আবির্ভুত হইয়াছিলেন—রাজেস্, এবিসেনা, আল্‌বুকেসস্, অবেনজোয়াস্ ইত্যাদি। শোষাক্ত চিকিৎসক, অস্ত্র বিদ্যা বিশারদ ছিলেন এবং ইনি অনেকগুলি অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। চারলস্ মার্টেল কর্ত্তৃক আরবদিগের প্রতাপ খর্ব্বিত হইলে, পরে চিকিৎসা শাস্ত্র, স্পেন দিয়া ইউরোপে পরিবর্ত্তিত ভাবে প্রত্যাক্ষিত হয়। স্পেন্ ব্যতীত ইটালীতে এই সময় চিকিৎসা শাস্ত্রধ্যায়ান বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। দক্ষিণ ইটালীতে স্যালার্ণো নামক স্থানে যে চিকিৎসা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তথা হইতে উত্তীর্ণ ছাত্র-

লোকে ডাক্তার বা ম্যাজিষ্টার উপাধি প্রথম প্রদত্ত হয় বলিয়া উহা অদ্যাবধি খ্যাতনামা। এই সময় হইতে প্রায় ২০০ শত বৎসর পর্যন্ত ইউরোপে চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা বা শ্রীবৃদ্ধি কিছুই লক্ষিত হয় না। পরে ১৫০০।১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এনাটমির রীতিমত উন্নতি স বিত হইলে, চিকিৎসা শাস্ত্র বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি প্রাপ্ত হয়। বেসাল, ফ্যালোপিও, ইউস্টেসিও, বর্ত্তমান এনাটমির জন্ম দাতা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন। পারসেল্সাস, পূর্ব্বতন গ্যালেনীয়, ও আরবীয় ভ্রমাত্মক দেহ-তত্ত্ব বিষয়ক সংস্কার সংশোধিত করেন এবং হারবি, রক্ত সঞ্চালন ও এসেলি লিম্ফ্যাটিক মণ্ডলী আবিষ্কার করত দেহ-তত্ত্ব সংক্রান্ত বহু দিবসাবধি প্রচলিত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার এককালে নির্ম্মূলীত করিয়া যান। ১৬০০।১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে ক্ষৌরকারেরা (নাপিত) অস্ত্র চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিল। ফরাসীদিগের মধ্যে আম্ব্রোজ পারি, প্রথমতঃ এই শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অতীব ধীশক্তি, অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতা নিবন্ধন অবশেষে সেণ্ট্ কমি (St. come) নামক ফরাসীদিগের অস্ত্রবিদ্যাবিৎসভার মেম্বর রূপে নির্ব্বাচিত হন। যেমন বেসাল দ্বারা এনাটমির প্রথম সংস্করণ হয়, পারি কর্তৃক অস্ত্রবিদ্যারও সেইরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, বন্ধনী দ্বারা বিচ্ছিন্ন নাড়ী হইতে রক্তরোধ করণ উপায় পারি দ্বারা প্রথম উদ্ভাবিত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে বিশেষতঃ ফ্র্যান্স, জর্ম্মানি ও ইংলণ্ডে চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতিপদারূঢ় হইলে সার্জ্জারী ও এনাটমি নূতন আকার ধারণ করে। ফ্রান্সে পিটাট, ডেসণ্ট, পার্সী; ইটালীতে, স্কার্পা; ইংলণ্ডে, পারসিভাল, পট, উইলিয়ম ও জন হণ্টার, বেঞ্জামিন্ বেল, আলেক্জণ্ডার মন্রো প্রভৃতি মহাত্মা দ্বারা উপরি উক্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিনব সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯০০ শতাব্দীতেও ঐ সকল প্রদেশে অনেক মহামহোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করিয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের যে কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা ভাবিতে গেলে আমাদিগকে এককালে বিমোহিত

ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। সেই সমস্ত মহাত্মা যাঁহারা গত হইয়াছেন এবং যাঁহারা এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন তদসমুদায়ের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, তবে দুইটী বিষয় এখানে আমরা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যেহেতু এতদ্বারা পৃথিবীর সভ্য জাতী মধ্যে যেরূপ উপকার উপলব্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। এই দুইটী যথাক্রমে ক্লোরোফরমের আবিষ্কার এবং ভ্যাক্সিনেসন বা গোবিজে টীকা দেওয়া। আমেরিকায়, মর্টন নামা জনৈক দন্ত চিকিৎসক তাঁহার বন্ধুর (ডাং জ্যাকসন) পরামর্শে কোনও ব্যক্তির দন্তোৎপাটন কালে সল্‌ফিউরিক্ ইথর শুঁকাইয়া সে হতজ্ঞান হইলে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। রোগী পরক্ষণই চেতনা প্রাপ্ত হইল এবং দন্তোৎপাটন জনিত কোন ক্লেশানুভব করিল না। তদবধি আবশ্যক হইলে অস্ত্র চিকিৎসা কালে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। পরে ১৮৫৯ সালে এডিনবরার সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত ধাত্রীবিদ্যা বিশরাদ ডাং সিমসন্ (Dr Simpson) ইথরের পরিবর্ত্তে ক্লোরোফরম, অনেক পরীক্ষার পর, অস্ত্র চিকিৎসা কালে ইহার ব্যবহার অনুমোদন করিয়া যান। ইহা দ্বারা যে কি উপকার উপলব্ধি হইতেছে, তাহা কাহার অবিদিতি নাই। অপর একটী বিষয় যাহা উপরে লিখিত হইয়াছে উহা ভ্যাক্সিনেসন নামে সর্ব্ব সাধারণ বিদিত। ইহা দ্বারা মানবজাতীর যে কি মহোপকার সাধিত হইতেছে তাহা বর্ণনা করা লেখনীর অসাধ্য। গোবিজে টীকে দেওয়া প্রথা ডাং সর উইলিয়ম জেনার কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়। সহস্র সহস্র লোক বসন্তরোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে এবং স্ত্রী ও পুরুষ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অপহৃতত্তা হইতে যে, নিবারিত হইতেছে তাহা কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। এই ১৯০০ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হইয়া, ৩০।৪০ বৎসরের বেশী নয়, প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। জর্ম্মণির জনৈক বৈজ্ঞানিক হানিমান এই চিকিৎসার জন্মদাতা

বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন। এই চিকিৎসা এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইংলণ্ডের এবং ইউরোপের অনেক প্রদেশে ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক ইহা পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু আমেরিকায় ইহার বিশেষ আস্থা দেখা যায় এবং তথায় এই চিকিৎসা শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য কএকটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় রোগীর চিকিৎসার্থে কোনও ডাক্তার আহুত হইলে, তিনি রোগীর সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি কোন প্রকার চিকিৎসাধীন হইতে মনোনীত করিয়াছেন, এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক? ইহা দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমানিত হয় যে, তথাকার চিকিৎসকদিগকে এই দ্বিবিধ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, নতুবা তাঁহার ব্যবসা (Practice) বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গদেশে বেরিগ্নি সাহেব, রাজেন্দ্রলাল দত্ত ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পথ প্রথম প্রদর্শিত হয়। অতঃপর ভারবর্ষের প্রায় অনেক স্থানে এবং এ প্রদেশে এই চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিগণিত অথবা অন্তর্গত না হইলেও কতিপয় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ডাক্তার উভয়বিধ চিকিৎসা করিতেছেন, আর কেহ কেহ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা এক কালে বিসর্জ্জন দিয়া কেবল উহাই অবলম্বন করিয়াছেন।

উপরে তিন প্রকার চিকিৎসার ইতিহাস কথঞ্চিৎরূপে লিখিত হইল, এক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে পরস্পরের কিরূপ সম্মিলনতা বা কতদূর সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহাই আলোচ্য। আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইলেও আজ পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসক গণ তন্মতাবলম্বী হইয়া চলিতেছেন। সুশ্রুতে সার্জ্জরী বা অস্ত্রচিকিৎসা বিষয় বিশেষরূপ বর্ণিত আছে। অস্ত্রের আকার, গঠন, ব্যবহার ও কোন যন্ত্র কোথায় কিরূপ প্রযোজ্য এ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। অর্শ রোগের চিকিৎসা কিরূপ আদেশীত হইয়াছে দেখা যাউক। ১, ক্ষার ঔষধি ব্যবহার (আধুনিক কষ্টিক)। ২, বন্ধন। বন্ধনী দ্বারা বন্ধন করা

(আধুনিক লিগেচর্) ৩, অস্ত্র দ্বারা ছেদ (Removal by incision) ৪, লেপ ও বাহ্যিক প্রয়োগের নিমিত্ত (External applications—ointment,suppository &c) ঔষধ সমূহ ব্যবহার্য্য। উপরি লিখিত যে কয়েক প্রকার অর্শ রোগের চিকিৎসা লিখিত হইল, উহা অপেক্ষা আর কোনও বিশেষ চিকিৎসা এপ্যাথিক্ মতে দেখা যায় না। যাহা হউক এলোপ্যাথিক চিকিৎসার সাজ্জারী বা অস্ত্র-চিকিৎসা এতদুর অগ্রসর ও উন্নতি পদারূঢ় হইয়াছে যে, স্বভাবকে হেয়জ্ঞান ও বিলজ্জিত করিতেছে। পায়ের গঠনের বিকৃতি (কুশ পা) এবং তজ্জনিত চলিবার ব্যাঘাত, দ্বিখণ্ডিত বা বিভক্ত ওষ্ঠ এবং তজ্জনিত বাক্যোচ্চারণের অস্পষ্টতা ও জড়তা এবং সৌন্দর্য্যের ভ্রষ্টতা ইহার প্রভাবে সংশোধিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৌন্দর্য্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমরা এস্থলে সামান্য মাত্র উদাহরণ দিলাম। ইহা অপেক্ষা কত শত গুরুতর ব্যাপার ইহার মাহাত্মে যে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে আমাদিগকে এক কালে বিমোহিত ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত হইলেও অস্মদেশীয় কোন্ আয়ুর্ব্বেদীক চিকিৎসক অস্ত্র-চিকিৎসা অবলম্বন করিয়াছেন? সার্জ্জরী আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ হইতে, যে এককালে অপসৃত হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইতেছে, ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে সুশ্রুত বলিয়া গিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ চিকিৎসক হইতে গেলে তাহাকে উভয়বিধ চিকিৎসা (রোগ ও অস্ত্র চিকিৎসা) অবলম্বন করা উচিত। ইহার মধ্যে একের অভাবে অর্থাৎ কেবল এক প্রকার চিকিৎসা অবগত থাকিলে, তাহাকে এক পক্ষ হীন পাখীর মতন নির্দ্দেশ করা যায়। রোগ চিকিৎসা সম্বন্ধেই বা বিশেষ উন্নতি কৈ? একটী লক্ষণ, নাড়ী বিষয়ে অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবেক। ভিন্ন ভিন্ন রোগে নাড়ীর বিভিন্ন অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ বায়ু, কফ, পিত্ত নাড়ী জ্ঞানাত্মক বলিয়া, যখন যে রোগ বর্ত্তমান থাকে, তখন সেইরূপ নাড়ীর

অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বা দুই বা তিনটী পরস্পর যখন যাহার রোগে প্রাধান্য থাকে, তখন সেইরূপ নাড়ীর অবস্থা কথিত হয়। এতদ্ভিন্ন গতি ও অন্যান্য অবস্থানুসারে পক্ষী, সরীসৃপ, প্রভৃতির গমনের সহিত উপমিত হইয়া থাকে, যথা—হংস গতি, শিখী গতি, বায়স গতি, ভেক গতি, সর্প গতি ইত্যাদি। উপরে নাড়ী সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল ইহা নিতান্ত কুটিল ও দুর্ভেদ্য, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুরাকালে এনাটমি এবং ফিসিওলজি, অধুনা উহারা যেরূপ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, বোধ হয়, ততদূর অগ্রসর হয় নাই। তাহা হইলে কখনই নাড়ী জীব-জন্তুর গতির সহিত উপমিত হইত না। আমরা এরূপ বলিতে চাহি না যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাড়ী চক্রের বর্ণনা বিষয়ের অসদ্ভাব, বরং সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসকগণ কেবল মাত্র নাড়ীর বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া অনেক স্থলে রোগ চিকিৎসার সফলতা লাভ করেন। আমাদিগের উদ্দেশ্য যে, আধুনিক এনাটমি ও ফিসিওলজী শাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত থাকিলে সুদ্ধ নাড়ীকেন, আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির পীড়া নির্ণয় ও চিকিৎসা বিষয়ে সুফল প্রাপ্তি হইতে পারিতেন এবং আমাদিগকে অনেক দুঃসাধ্য রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে সুপথ প্রদর্শিত করিতে সক্ষম হইতেন। যাহা হউক ঔষধ প্রয়োগ বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদীক ও এলোপ্যাথির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে, উদ্ভিজ্য, জান্তব, ধাতব ও পার্থিব পদার্থ উভয় চিকিৎসার ব্যবহার্য্য। উদ্ভিদ লতা, ত্বক্, মূল পত্র, ইত্যাদি,—কাণ্ড, ক্বাথ, জলীয় সার, উভয় চিকিৎসায় তুল্যরূপে সমাদৃত হইয়া থাকে। কেবল দেশ, কাল, প্রভেদানুসারে ঐ সকল পদার্থের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এদিকে ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীক মতে এত পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ যে, পদার্থের মূল্য ততোধিক না হইলেও ঔষধ সকল অতি দুর্ম্মূল্যে বিক্রীত হয়। রসায়ণ শাস্ত্রের প্রভাবে অধুনা কি সমারোহ ব্যাপার না সম্পন্ন হইতেছে? এই রসায়ন শাস্ত্র, আমাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্রোন্তর্গত হইলেও

উহা যেরূপ ছিল, আজও তাহাই আছে, কেহই উহার উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনে যত্নবান ও অগ্রসর নহেন। যদি ইহার অনুশীলন দ্বারা যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত তাহা হইলে ঔষধ প্রস্তুত এত কঠিন ব্যাপার হইত না এবং ইহা প্রস্তুত হইলে যে সর্ব্ব সাধারণের আয়ত্তাধীন হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কিছু অতঃপর ব্যক্তব্য নাই, কারণ ইহার ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ, চিকিৎসা প্রণালী উপরিলিখিত দুইটী চিরনির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা প্রথা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাতে আমাদিগের দেশীয় ঔষধ অদ্যাবধি গৃহীত হয় নাই, প্রায় অধিকাংশ আমারিকের ও ইউরোপীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা প্রকরক ও পদ্ধতি ক্রমে লিখিত হইবে। স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া (Vis madicatrix naturæ) অধিকাংশ স্থলে যে রোগ আরোগ্য প্রাপ্ত হয় এই বচনটী এই চিকিৎসায় বিশেষ রূপ প্রযোয্য এবং কি আয়ুর্ব্বেদে বা কি এলোপ্যাথিক সকল চিকিৎসা প্রথায় ইহা ধ্রুব বাক্য সরূপ আদরণীয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

উপসংহারকালে চিকিৎসক ও সমালোচকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। আজ কাল এতদ্দেশে যেরূপ লেখাপড়ার চর্চ্চা চলিতেছে তাহাতে সাধারণ ব্যক্তি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িয়া থাকেন। এমন কি অন্তঃপুর মধ্যে ইহাদিগের সমাগম নিতান্ত ন্যুন লক্ষিত হয় না। এতদবস্থায় যে কোনও চিকিৎসা ও সাহিত্য, কবিতাদি বিষয়ক প্রবন্ধ সকলের পড়িতে আগ্রহাতিশয় ও ঔৎসুক্য জন্মিবে ইহা আশা করা যায়। অধিকন্তু চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, গ্রন্থাদি হইতে পাঠ করিলে কোন কার্য্যকর হয় না, সকলের পক্ষে সম্ভবেনা; পরন্তু উহা অনেকের অপ্রয়োজনীয় ও অনধিকার চর্চ্চা হইতে পারে। সংসারে পরিবারবর্গ মধ্যে যে সকল পীড়া সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, অথচ ভীষণ ও মারাত্মক সেই সকল রোগের বৃত্তান্ত পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিলে,

রোগী যথা সময়ে চিকিৎসাধীন হইতে পারে এবং তাহার পক্ষে মঙ্গলকরও হইয়া থাকে। অনেক পীড়া এরূপ গুপ্তভাবে দেহে ক্রমশঃ সঞ্চার হয় যে, তাহা সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব এবং চিকিৎসকগণেরও অনেক সময়ে উহাদিগের নির্ণয় অনায়াস সাধ্য নহে। নিম্নে এতদ্‌সম্বন্ধে একটী উদাহরণ প্রকটিত হইল। অর্দ্ধ কাল শিশু ও নিতান্ত বালিকের লিবারের পীড়া কিরূপ সাধারণ, তাহা কাহার অবিদিত নাই এবং এই রোগ দ্বারা যে কত শত শিশু ও বালক অকালে কাল কবলিত হইতেছে তাহা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই রোগ নিতান্ত দুরূহ পীড়া হইলেও যদি প্রারম্ভ হইতে উহার রীতিমত চিকিৎসা হয়, তাহা হইলে মৃত্যু সংখ্যার নিতান্ত হ্রাস হয়, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপর একটী উদ্দেশ্য, চিকিৎসা ব্যবসায়ী যাঁহারা ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপ অবগত নহেন, সুতরাং মেডিকেল্ জারনাল্ (ডাক্তারী পত্র) পাঠে সুবিধা হয় না বা অসমর্থ বিশেষতঃ যাঁহারা পল্লীগ্রামে চিকিৎসা কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা পাঠে দুরূহ পীড়া সমূহের বিবরণ ও নূতন আবিস্কৃত চিকিৎসা প্রণালী ও ঔষধাদি দ্বারা যথাবিহিত চিকিৎসা অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন এবং তাহাদিগের দৃষ্টিপথে এবংবিধ রোগ পতিত হইলে অনায়াসে চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন। অপর পক্ষে অর্থাৎ ইংরাজী ভাষজ্ঞ হইলেও এক স্থানে রোগ বিশেষের বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা প্রণালী যদ্দারা উহা আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত অবগত হইতে পারিলে তাঁহাদিগের সময় বিশেষে উপকারে আসিবে ইহা বিচিত্র নহে। তবে যাহারা বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করিলে গৌরবের লাঘব হইবে এরূপ বিবেচনা করেন তাঁহাদিগের সংস্কার যে নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে এবং যাহারা চিকিৎসা বিষয়ক এবংবিধ বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠ করিতে সঙ্কুচিত হন তাঁহারা উপন্যাস, কবিতা, সাহিত্যাদির কারণ পাঠ করিলে যে কথঞ্চিৎরূপে সন্তুষ্ট ও

উপকৃত, এবং হয়ত ২। ১টী নূতন বিষয় ও জানিতে পারিবেন ইহা বলা বাহুল্য নহে।

পরিশেষে ব্যক্তব্য এই যে, অনিয়মিত প্রকাশ, মাসিক পত্রের একটী প্রধান দোষ মধ্যে গণ্য কিন্তু চিকিৎসক ও সমালোচকে নাটক, উপন্যাস, সাহিত্য, কবিতা, ডাক্তারী, কবিরাজী ইত্যাদি সকল প্রকার প্রবন্ধ থাকিবে বলিয়া উহার নিয়মিত প্রকাশ অসম্ভব নহে।

জগতে চিকিৎসকত্ব কাহাতে সম্ভব।

স্বকুলিনজাত; সদ্ভাবাপন্ন, বেদাধ্যায়ণ বিশিষ্ট, সুদেহী এবং সুমধুর ভাষী, সত্বভাবাপন্ন ও বংশানু ক্রমে যাঁহারা চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের চিকিৎসকত্ব সম্ভব ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময় আমরা অনেক চিকিৎসকই দেখিতেছি কিন্তু তাঁহারা যে কোন জাতি ও কুলীন কি অকুলীন এবং তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে চিকিৎসক ছিলেন কি না তাহাও জানিবার কোন সম্ভব নাই, যদি অকুলীন হস্তে বেদাদিন্যস্ত করণই পদ্ধতি থাকিত তাহা হইলে মনু পুনঃ পুনঃ ভাবে নিষেধ করিতেন না। যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে অর্থের জন্যই হউক অথবা পাণ্ডিত্য প্রকাশ জন্যই হউক এরূপ চলিয়া আসিতেছে। এখণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন২ লোক জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য করিতেন অথবা পণ্ডিতি করিয়া আসিতেছেন; মধ্যে খেয়াল হইল, নিদানশাস্ত্র পড়ি। তিনি নিদান শাস্ত্র কিছুদিন পড়িয়া বিশেষ একটী উপাধিযুক্ত শাইনবোর্ড লিখিয়া এক জন সুচিকৎসক হইয়া পড়িলেন। কোথায় এই শাস্ত্র যে,কতদিনেই পড়িলেন ও কত দিনেই ঔষধাদি চিনিলেন আহার ত কিছু মাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। যদি ২।৪ পৃষ্ঠা নিদান পড়িলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা ও তাহাতে সংস্কার হইত তবে অনেক লোকেই এই শাস্ত্র শিক্ষা

করিতে সক্ষম ও অগ্রসর হইত। আয়ুর্ব্বেদ শব্দের যে অর্থ তাহাও একবার তলিয়া বুঝিয়া দেখিলেন না। যাহার অবগতে দেহী দিগের ইষ্ট হইতে পারে, যাহা অধ্যয়ণে ধর্ম্ম, অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল লাভ করিতে পারা যায় এবং জীবনমৃত্যু যে শাস্ত্রাধীন; সেই শাস্ত্র এক্ষণে অশিক্ষিত লোক হস্তে পতিত হওয়ায় এই দুর্দ্দশা গ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে। যে শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবে ধন্বন্তরী, দিবোদাস, কাশিরাজ প্রভৃতি মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া খ্যাত নামা ছিলেন, বর্ত্তমান সময় সেই শাস্ত্রের নামে কলঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সেই সময়টীরই অভাব হইয়া পড়িয়াছে; তাহার কারণ বর্ত্তমানসময় পূর্ব্বোক্ত সমস্তের অভাব, কাজেই সুচিকিৎসকের অভাব। চিকিৎসকের যাহা যাহা আবশ্যক হওয়া উচিত তাহা সমস্ত যাজ্জল্যমান থাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় সুচিকিৎসক নামে পরিচয় দিতে পারিতেন। প্রথমতঃ শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা, দ্বিতীয় দয়া তৃতীয় ধর্ম্ম, চতুর্থ দ্রব্যগুণ, পঞ্চম পুরুষানুক্রমের চিকিৎসক, ষষ্ঠ যারণ ও মারণ, সপ্তম সুদ্ধ শাত্তিক ভাবে থাকা ইত্যাদি গুণ যদি চিকিৎসক গণের থাকে তাহা হইলে তাঁহারা চিকিৎসক বলিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ের অনেক চিকিৎসক প্রায়ই অর্থ লোলুপ; কিন্তু অত্যন্ত অর্থ লোলুপ হওয়া আমাদের শাস্ত্রের বিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় প্রায় লোকেই অবগত আছেন। চিকিৎসকের দয়া, ক্ষমা, ধীরতা ও বিজ্ঞতা, এবং দান, হোম ও যজ্ঞাদিতে রত থাকাই একমাত্র অলঙ্কার তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, কিন্তু সেই অলঙ্কার কয়টী চিকিৎসকের দেখা যায়? যাঁহার শরীরে উক্ত কয়েকটী গুণ আছে তিনিই যথার্থ সুচিকিৎসক। যদি একটী গরীব রোগী দেখেন হয় ত, তাহার রোগের কথা আদৌ কর্ণপাত করিলেন না, বর্ত্তমান সময়ের দয়া ত এই, তবে এই কথা বলা আবশ্যক যে, যেখানে দয়া নাই সেখানে রোগীর রোগের উপরও যত্ন নাই। আমাদের প্রথম শ্লোকে কথিত আছে যে, চতুবর্গ ফল চিকিৎসকে লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু চতুবর্গ ফল মধ্যে অর্থ ফলই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়; এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে,

জগতের কৃত্রিম ভিন্ন কোন কার্য্যই আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে কি আয়ুর্বেদ চিকিৎসাও কৃত্রিম হইয়া উঠিল? হা বিধাত এমন যোগ ধর্ম্মের পরিণাম ফল কি শেষে এই হইয়া উঠিল? কোন জিনিষ বিনিময় করিতে হইলে যেমন তাহা পুনঃ পুনঃ দেখা উচিত হয়, এমন মহা মূল্যবান শরীর যে, চিকিৎসকের হস্তে দিলেন, তাঁহার অবস্থা ও তদ্রূপ দেখা উচিত কিনা? আর চিকিৎসকটীর দয়া, বিজ্ঞতা, ধর্ম্মপরায়ণতা এবং বংশানুক্রমের চিকিৎসক কি না, না দেখে এই মহা মূল্যবান শরীর চিকিৎসকের হস্তে ন্যস্ত করিবেন না।

এমন সময় পড়িয়াছে যে, কেবল আশবাব ও ধুমধাম দেখেই লোক মোহিত হইয়া পড়েন, চিকিৎসকের গুণ থাকুক আর না থাকুক, তাঁহার হস্তে অবলীলাক্রমে জীবন সমর্পণ করেন। যাঁহারা পূর্ব্বে জমিদারী লাইনে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, অথবা স্কুল লাইনে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের দেখিতেছি যে লম্বা চওড়া শায়েনবোর্ড লিখিয়া এবং বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বিশেষ একজন সংস্কারক—কবিরাজ হইয়াছেন। কৈ তাঁহারাত কখনও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এ জন্মেও দেখেন নাই ও যথারীতি অভ্যাস করেন নাই। তবে তাঁহারা কি রকম কবিরাজ? সমাজে কি তাঁহারা কখনও আটক পড়িয়াছেন ও তাহাদের কি দয়া, ধর্ম্মপরায়ণতা, বিজ্ঞতা এবং ধর্ম্মের ভয় জন্মাইয়া থাকে। বেশী রকম বলিতে গেলে বাজার অত্যন্ত গরম হইয়া পড়িবে কাজেই এইক্ষণ ক্ষান্ত রহিলাম। যদি ঈশ্বর সময় দেন তবে ক্রমশঃ চিকিৎসকের লক্ষণ ও গুণাদি সংস্কৃতে মূল প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

দিন দিন আমাদের দেশে কুইনাইন কর্ত্তৃক প্যাটেণ্ট ঔষধ ব্যবহারে দেশ মাটি হইয়া আসিতেছে। কুইনাইন জগতে যেমন ইষ্টকারী ও অপর পক্ষে তেমনি অনিষ্টকারী, জগতের নিয়ম এই যে যাহাতে ইষ্ট আছে তাহাতে অনিষ্টও আছে, তবে প্রয়োগকারীদের জন্যই ইষ্টানিষ্ট ঘটিয়া আসিতেছে। দেশ কাল, পাত্র, বল, বয়ঃক্রম ও অগ্নি এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, হীম, শিশির,

বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এই সমস্ত দেখিয়া যদি কুইনাইন প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে [illegible] প্রাপ্তি করিয়া দেহীদিগের শরীর পুষ্টি করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (হিতৈষীরৈষধ্য বলং) অন্ন সেবন করিলে যেমন বল ও দেহ পুষ্টি হইয়া থাকে কুইনাইনও অন্নের ন্যায় রীতিমত ব্যবহার করিতে পারিলে জরারোগ্য করিয়া শরীর পুষ্টি করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু রোগ উপশম করিতে হইলে নিম্ন শ্লোকটির প্রতি লক্ষ রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। "রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোনন্তর মৌষধং ততোকর্ম্ম ভিষক পশ্চাৎ জ্ঞান পূর্ব্বং সমাচরেৎ"। অগ্রে রোগ পরীক্ষা করিতে হইবে, তদনন্তর ঔষধ পরীক্ষা করিয়া রোগীদিগের বল ও বয়ঃক্রমানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা চিকিৎসক মাত্রেই বোধ হয় জ্ঞাত আছেন, কিন্তু লিখিত শ্লোকের নিয়মানুসারে ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, যথেচ্ছাচারে ব্যবহার করেন বলিয়া রোগী সকল অকারণ রোগ যন্ত্রণায় চিরকাল কষ্টভোগ করেন।

ক্রমশঃ

আশা।
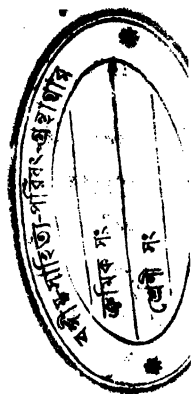
সাঁজের আঁধার ছায় ঢাকে ধরণী
কোথা গেল কর্ণধার কোথা তরণী।
ভরা এ সাঁজের বেলা
আঁধারে আঁধারে মেলা
প্রকৃতির স্তব্ধ খেলা।
কোথা সজনি।
ওই দেখ অন্ধকার ঢাকে ধরণী।

আঁধার কুলের কাছে ফেলে একেলা
কোথায় লুকা'য়ে তুমি করিছ খেলা?
আশায় ছলিয়ে মোরে
দিনে দিনে ভোরে ভোরে
আনিলে যতন করে
সাগর বেলা।
এখন লুকালে কোথা ফেলে একেলা!

সুমুখেতে বারি রাশি নাহি সীমানা
কোথায় হয়েছে শেষ নাহি নিশানা;
পাগল তরঙ্গ রাশ
হাসে পাগলের হাস
আসিছে করিতে গ্রাস

আপন মনা
কোথায় গেলেগো তুমি কোন ঠিকানা ?

পিছনে অনন্ত মাঠ অনন্ত ধরে।
একেলা এখানে রই কেমন করে ?
সংসার আঁধারে ঢাকা
প্রকৃতি আঁধারে আঁকা
আকাশ আঁধার মাখা
দিগন্ত ধরে।
এখন এখানে রই কেমন করে ?

ওগো তুমি ফেলে মোরে কোথায় গেলে ?
কাছে এসে চাও তুমি নয়ন মেলে।
তোমা বিনে মর মর
হিয়া কাঁপে থর থর
ভয়ে তনু জর জর
কোথায় গেলে ?
কাছে এসে চাও তুমি নয়ন মেলে।

বুঝেছি, দিবে না দেখা কুহক ছলা !
মিছামিছি আশা তোরে কাঁদিয়া বলা।
তুমি কুহকিনী মায়া
ফেলিয়া আপন ছায়া
গ্রাসিলে আমার কায়া ;

কুহক ছলা।
মিছামিছি ডেকে ডেকে কাঁদিয়া বলা।

আর কেন মায়াবিনি ? লহগো মোরে
দিতেছি এ ভগ্নপ্রাণ তোমারে ধরে।
যাহা খুসি তুমি কর ;
যারে সাধ তারে ধর,
শুধু মোরে কৃপা কর
লহগো মোরে
দিলাম এ ভগ্নপ্রাণ সঁপিয়া তোরে।

শ্রীমতীন্দ্রমোহন বসু।

বনফুল।

অনেক ঋষি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া একটি ক্ষুদ্র শিশু কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। নিঃসহায়া ক্ষুদ্র বালিকা, কোন অভাগিনী জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য মধ্যে ক্রন্দন করিতেছিল। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী তাহাকে সে অবস্থায় সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে সক্ষম হইলেন না। শিশু তাঁহার আশ্রমে নীতা হইল।

হিমালয়ের দুর্ভেদ্য প্রদেশে প্রকৃতির শোভায় শোভমানা নির্জ্জন উপত্যকা মধ্যে ঋষির আশ্রম। লোকালয় হইতে শতক্রোষ দূরে, সংসার হইতে বহুবাহিরে, কুটির নির্ম্মাণ করিয়া ঋষি বাস করিতেন; কেহ কখন তাঁহার আশ্রমে আসিত না, কোথায় সে আশ্রম তাহাও কেহ জানিত না। এই জনমানব শূন্য হিমালয়ের দূর্ব্বাদল শোভিত উপত্যকা মধ্যে শিশু দিন দিন বয়োপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ঋষি তাহার নাম রাখিলেন “বনফুল”।

বালিকা “বনফুল” বনের মন প্রাণহারি ফুলের ন্যায় দিন দিন প্রস্ফুটিতা হইতে লাগিল। হরিণ হরিণীগণ তাহার সহিত খেলিত, ভ্রমিত, নাচিয়া বেড়াইত। বানর বানরীগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া কতই ক্রীড়া করিত, মার্জ্জার মার্জ্জারি তাহার পায়ে পায়ে ফিরিত। যখন “বনফুল” কুটির হইতে নিষ্ক্রান্তা হইত, অমনি পাপিয়া পঞ্চম তানে ডাকিয়া শাখা পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকটস্থ হইত, কপোত কপোতী তাহার পৃষ্ঠে, বক্ষেঃ, স্কন্ধে, মস্তকে আসিয়া বসিত, ক্ষুদ্র বৃহৎ কত শত পাখী আসিয়া তাহাকে বেড়িত। বনের পশু পক্ষী তাহাকে পাইয়া কতই আনন্দ লাভ করিত।

“বনফুল” তাহাদের কত যত্ন করিত। পিতৃসম ঋষি ব্যতীত সে আর মানব মুখ দেখে নাই। ঋষিকেও সে প্রায় দেখিতে পাইত

না, তিনি কোথায় থাকিতেন, কোথায় যাইতেন “বনফুল” তাহার কিছু জানিত না। সে প্রাতে উঠিয়া পিতার জন্য পুষ্প চয়ন করিত, সারাদিন তাহার চিরসঙ্গী সঙ্গিনী, হরিণ হরিণী, কপোত কপোতী কর্ত্তৃক বেষ্টিতা হইয়া বনে বনে ফল মূল আহরণ করিত, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পিতার আহারীয় প্রস্তুত করিত, তৎপরে ফুলের হার গাঁথিতে গাঁথিতে পশু পক্ষীর সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, বালিকা “বনফুল” যৌবনোন্মুখীনা হইল। প্রস্ফুটোন্মুখ গোলাপ কলিকার ন্যায় “বন-ফুলের” শোভা বন আলোকিত করিল। তাহার চিকুর কেশ তাহার বল্কল বেশ আবরিত করিয়া, বক্ষঃ পৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া চন্দ্রমা বিভাষিত কৃষ্ণ ঘনদামের ন্যায় শোভা পাইত। তাহার বঙ্কিম গ্রীবা অধিকতর বঙ্কিমভাব ধারণ করিল, তাহার বাহুদ্বয় অধি-কতর মাংসল হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় বিকাশ করিল, বক্ষঃ পীনন্নত পয়োধর যৌবন বিভা বিকাশ করিয়া মনমোহন কমল কলির ন্যায় উন্নত হইল, নিতম্ব করেণুনিন্দিত হইয়া মাতঙ্গিনীকে পরাভূত করিল; সেরূপ, সে সৌন্দর্য্য, সে মনমোহন ভাবে “বন-ফুলের” প্রাণ এক অভূতপূর্ব্ব ভাব উপলব্ধি করিতে লাগিল।

এ কি? এরূপ সে পূর্ব্বে ছিল না। কেন তাহার প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠে? কেন সান্ধ্য সমীরণ তাহার অঙ্গে লাগিলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়? কেন মুহুর্মুহু তাহার নয়ন তাহার পিনোন্নত পয়োধর প্রতি আকৃষ্ট হয়? কেন সদাই তাহার প্রাণ, যেন কি এক নূতন লজ্জা অনুভব করে?

আর সে বালিকা নাই। আর তাহার সে চাঞ্চল্য নাই। আর সে হরিণ হরিণীর সহিত নাচিতে পারে না, আর তাহার কপোত কপোতী লইয়া খেলা করিতে ইচ্ছা হয় না। আর তাহার প্রাণের ভিতর সে বাল্য আনন্দ নাই।

তাহার একি পরিবর্ত্তন হইল? কোথা হইতে কিরূপে

তাহার প্রাণের ভিতর এ অভূতপূর্ব্ব ভাব প্রবিষ্ট হইল? তাহার প্রাণ হুহু করে কেন? ফুলের সৌরভে তাহার প্রাণ আকুল হয় কেন? সান্ধ্য সমীরণে তাহার শরীর শীতল হয় না কেন? কোমল কৌমুদী শোভায় তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে কেন?

কপোত কপোতী তাহার বক্ষঃ পৃষ্ঠে বসিলে তাহার প্রাণ কাঁপে কেন? পাপিয়া ডাকিয়া উঠিলে তাহার প্রাণের অন্তস্তম প্রদেশ পর্য্যন্ত কেন আলোড়িত হইয়া উঠে? আর "বনফুল" সে সদানন্দময়ী বনফুল নাই।

একলা বসিয়া একমনে নির্জ্জনে চিন্তা করিলে, একাকিনী বিরলে বসিয়া থাকিলে, তাহার প্রিয় সঙ্গি পশু পক্ষীগণের নিকট হইতে দূরে পলাইলে, সে কতক শান্তি উপলব্ধ করে! সে কি ভাবে, তাহার প্রাণ কি করে, বুকের ভিতর হৃদয় কি হুহু করে, তাহা সে বুঝিতে পারে না।

দুই হস্তে সবলে বুক চাপিয়া ধরিয়া সে চক্ষু মুদিত করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতে থাকে। গাত্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শীতল দূর্ব্বাদল শয্যায় শয়ন করিয়া শান্তি লাভের প্রয়াশ পায়। অধিরা কুলকুল নাদিনী স্রোতস্বতী নীরে নিমগ্ন হইয়া সমস্ত দিবস কাটাইয়া দেয়,—কই, তবুও তো তাহার প্রাণের সে বাল্য আনন্দ, সে পূর্ব্ব শান্তি আইসে না।

একদিন দুই প্রহরের সময় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে যে দিকে প্রাণ চাহিল সেই দিকে ছুটিল,—নদীর তীরে তীরে ছুটিল। তাহার অপূর্ব্ব সুন্দর ললাটে স্বেদবিন্দু মুক্তাপাতির ন্যায় শোভা পাইল। তাহার পয়োধরদ্বয় তুষার মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় বিরাজ করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঝর ঝর ঝরে স্বেদ ঝরিল। তবু ও সে ছুটিল, ছুটিতে ছুটিতে শেষ ক্লান্ত হইয়া স্রোতস্বতীর তীরে বসিয়া পড়িল।

বসিয়া বসিয়া সহসা "বনফুল" কাঁদিয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে সে সেই দূর্ব্বাদল শয্যায় শয়ন করিল। কখন কিরূপে সে জানে না, ঘুমাইয়া পড়িল।

সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। সে সলজ্জ ভাবে তাহার বল্কল বসন টানিয়া অঙ্গ আবরিত করিবার প্রয়াস পাইল; তাহাতে অকৃত মনোরথ হইয়া তাহার আজানুলম্বিত কৃষ্ণকেশ টানিয়া বক্ষঃ আবরিত করিল। অভূতপূর্ব্ব এক নূতন লজ্জায় তাহার কপোল যুগলে গোলাপ প্রস্ফুটিত হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথরি কাঁপিয়া উঠিল।

এক অপরিচিত পুরুষ তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। সে রূপ, সে সৌন্দর্য্য, সে অপূর্ব্ব ভাব "বনফুল" আর কখনও দেখে নাই।

যুবকের পৃষ্ঠে ধনু তুন বিলম্বিত, স্বর্ণখোচিত উষ্ণীষ মস্তকে সুশোভিত; রাজবেশ "বনফুল" কখনও দেখে নাই, নতুবা যুবকের সুন্দর সুবেশ দেখিয়া সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত যে, যুবক রাজপুত্র না হইলেও ধনীর সন্তান, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

"বনফুল" বনের নানা অপূর্ব্ব সুন্দর ফুল দেখিয়াছে, "বনফুল" আকাশের নানা মনোহর সুন্দর পাখী দেখিয়াছে,—সে পর্ব্বতের অপূর্ব্ব প্রকৃতির অপূর্ব্বশোভা দেখিয়াছে, কিন্তু সে এরূপ সৌন্দর্য্য আর কখনও দেখে নাই। প্রকৃতির মন প্রাণ মুগ্ধকারি শোভা দেখিয়া সে যে আনন্দ লাভ করিত, আজ এই যুবককে দেখিয়া তাহাপেক্ষা সে শতগুণ আনন্দ উপলব্ধি করিল। তাহার প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।

যুবক অতি আদরে, অতি যত্নে "বনফুলের" নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। 'বনফুল' লজ্জায় অধিকতর মস্তক অবনত করিল। যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন;—আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন 'বনফুল' অতি সলজ্জভাবে নিজ নাম বলিল। তখন যুবক একে একে তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। "বনফুল" একে একে তাহাকে নানা কথা কহিল।

অর্দ্ধ ঘটিকা যাইতে না যাইতে সরলা "বনফুল" যুবকের সহিত ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় কত কথা কহিতে লাগিল। সে তাহার হরিণ হরিণীর

কথা, বানর বানরীর কথা, তাহার পাপিয়া বৌ-কথাকওর কথা, তাহাদের আশ্রমের কথা, তাহার পিতা বৃদ্ধ ঋষির কথা, কত কথাই কহিল। যুবকের হাতে হাত রাখিয়া, তাঁহার অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া, তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া,ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায়, চপল শিশুর ন্যায়, কত কথা কহিল। সে কখনও কথা কহিয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই, তাহার পিতা প্রায়ই কথা কহিতেন না,—সে তাহার পশু পক্ষীর সহিত কথা কহিত, কিন্তু তাহাতে কি প্রাণের কথা কহিবার তৃষা মিটে! আজ যুবককে পাইয়া তাহার প্রাণ মন খুলিয়া গিয়াছে, সে কত কথা কহিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা হইল। মলয় পবন ধীরে প্রবাহিত হইল, নানা ফুলের নানা কলি ফুটিয়া চারিদিকে সৌরভ বিস্তৃত হইল, জগত হাসাইয়া কোমল কৌমুদী চারিদিকে বিভাসিত হইল। যুবকের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, তাঁহার মস্তকে এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন উপস্থিত হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, শিরায় শিরায় আগুন ছুটিল।

ঠিক এই সময়ে দূরে বৃক্ষ পত্রমধ্য হইতে চারিদিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল। "বনফুল" সহসা প্রাণে বানবিদ্ধবৎ চমকিয়া যুবকের দিকে চাহিল। অমনি চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। যুবক আর আত্মসংযমে সক্ষম হইলেন না। তিনি দুই হস্তে "বনফুলকে" হৃদয়ে টানিয়া লইয়া তাহার ওষ্ঠে শত শত চুম্বন করিলেন।

"বনফুল" চক্ষু মুদিল। তাহার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, অঙ্গ শিথিল হইল। উগ্র সুরাপান করিলে মানব শরীরে যে বিদ্যুৎ ছুটিতে থাকে, মস্তক যেরূপ ঘুরিতে থাকে, ক্রমে ক্রমে চৈতন্য যেরূপে বিলুপ্ত হয় "বনফুলের" ও ঠিক সেই অবস্থা হইল। সে ঢলিয়া পড়িল।

যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন সে আর তাহার পূর্ব্ব লোকে রাজ্যে নাই, তাহার জীবনের এক ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

সে প্রকৃতি রাজ্যের এক নূতন চিত্র দেখিয়াছে, এক নূতন আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছে।

এত দিনে প্রাণের জ্বালা মিটিল। কোমল কৌমুদী বিভাবিত যামিনীর মাধুরীতে বিভোর পরিমলময় মলয় মারুতে বিমুগ্ধা হইয়া, প্রাণের অপরিমেয় আনন্দে ব্যাকুলিতা হইয়া "বনফুল" আশ্রমের কথা, ঋষির কথা, তাহার সাধের হরিণ হরিণীর কথা, কপোত কপোতীর কথা ভুলিয়া গেল। "বনফুল" আনন্দে আত্ম বিস্মৃতা হইয়া যুবকের হাত ধরিয়া গভীর অরণ্য মধ্যে অন্তর্হিতা হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ঋষি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়া "বনফুল" বলিয়া ডাকিলেন;—উত্তর নাই। অন্যান্যদিন পিতার আহ্বানে বনফুল চপলা হরিণ শিশুর ন্যায় ছুটিয়া নিকটে আসিয়া পিতৃ চরণরেণু মস্তকে লইত, ছুটিয়া গিয়া ঋষির আহারিয় আনিত, আলোক জ্বালিয়া কুটিরে ধুপ ধুনা প্রদান করিত; ঋষিকে একবারের অধিক দুইবার "বনফুল" বলিয়া ডাকিতে হইত না। কিন্তু আজ ঋষি পুনঃ পুনঃ "বনফুল" বলিয়া ডাকিলেন, তাঁহার স্বরে চারিদিকের প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল, কিন্তু উত্তর নাই। "বনফুল আশ্রমে নাই।

ঋষি ধীরে ধীরে নিজ আসনে গিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যানে প্রতিবন্ধকতা ঘটিল। আজ "বনফুলের" সাধের হরিণ হরিণী হাসিয়া তাঁহার অঙ্গে অঙ্গ নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। শত শত পাখী আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল, বানর বানরী সকরুণ নিনাদে তাঁহার শান্তি ভঙ্গ করিয়া তুলিল। তিনি বুঝিলেন, বনের পশু পক্ষী "বনফুলের" জন্য ব্যাকুলিত হইয়াছে, যথার্থই "বনফুল" আশ্রম ত্যাগ করিয়াছে।

তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন; কমণ্ডলু তুলিয়া লইলেন। তৎপরে তিনিও ধীরে ধীরে সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সাজান বাগান শুখাইয়া গেল। সুখের আশ্রম ভাঙ্গিয়া গেল,

বনের পাখী বনে ছড়াইয়া পড়িল, হরিণ হরিণী গভীর অরণ্যের গভীর বিজনে লুকাইল, প্রস্ফুটিত ফুল ঝরিয়া গেল, সুন্দর বল্লরী টলিয়া পড়িয়া ঘুমাইল, আশ্রমের চারিদিকে দেখিতে দেখিতে আগাছা জন্মিয়া সমস্ত আশ্রম জঙ্গলে পরিণত হইল।

যাহার অভাবে সুন্দর আশ্রমের এ দশা ঘটিল, সে "বনফুল" কোথায়? বিদেশী বিলাসে লালিতপালিত রাজকুমার মৃগয়ায় আসিয়া তাহার চক্ষে পড়িলেন, সে তাহার হৃদয় আবেগে ভাসিয়া গেল! তাহার হৃদয় কোরক যুবক সমাগমে প্রস্ফুটিত হইল। প্রেম হলাহল পান করিয়া সে উন্মাদিনী হইয়া সকল ভুলিয়া তাহাতেই আত্ম বিসর্জ্জিতা হইল। সে রাজকুমারের সহিত তাঁহার শিবিরে আসিল।

একমাস কাটিয়া গিয়াছে। এক মাসে যুবকের সখ মিটিয়া গিয়াছে। কাননের পাখী রাজশিবিরে, বিলাস দ্রব্য বিভূষিত প্রমোদ নিকেতনে এক অভূতপূর্ব্ব নূতন জীবন লাভ করিয়া কাননের সুখ ভুলিয়া গিয়াছে। প্রথম কয়দিন নূতন রাজ্যের নূতন সুখ সাগরে নিমগ্না হইয়া "বনফুল" বনের কথা ভুলিয়াছে।

কিন্তু রাজকুমারের সখ মিটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আদরেরও লাঘব ঘটিয়াছে। "বনফুল" কিছুই বুঝে না; সরলা কানন বালা ভালবাসা কি তাহা জানে না; কেবল হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে ইহা উপলব্ধি করিয়াছে মাত্র। রাজকুমারের তাহার প্রতি আর সে প্রেম, সে আদর, সে ভাব নাই, ইহা সে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু মনে মনে কি যেন বুঝিয়াছে, কিসের যেন অভাব উপলব্ধি করিয়াছে।

যখন সে কাননে কাননে, পাখীর ন্যায় হর্ষে বনে বনে বিচরণ করিত, তখনও সে প্রাণে কিসের যেন অভাব বোধ করিত।

ক্রমশঃ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল।

চিকিৎসক ও সমালোচক।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড } ফাল্গুন, ১৩০১ সাল। { ২য় সংখ্যা।

ক্লোরোফর্ম্।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকারেই ক্লোরোফরম ব্যবহৃত হয়। অদ্য আমরা ইহার বাহ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলিব। ক্লোরোফরম চর্ম্মে লাগাইলে শোষিত হইয়া শারীর বিধান মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তথাকার চৈতন্যোৎপাদক স্নায়ুর চেতনা শক্তির হ্রাস হয়. এই নিমিত্ত বেদনা স্থানে ইহার মর্দ্দন প্রয়োগ করিলে, বেদনা নিবারক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। দেহের কোন স্থানে বিশুদ্ধ ক্লোরোফরম পড়িলে উৎপতিষ্ণু (উড়িয়া যাওয়া) গুণ থাকা প্রযুক্ত, সেই স্থানে যেন কোন প্রকার শীতল দ্রব্য পড়িয়াছে এইরূপ অনুমিত হয় এবং বাতাস লাগিলে উহার আধিক্য বোধ হয়।

শৈত্যকারক স্বরূপ ক্লোরাইড্ অব এমোনিয়া লোসনের সহিত ইহার ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্লোরোফরমকে প্রথমে সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া, পরে ক্লোরাইড অব এমোনিয়া ও জল মিশ্রিত করিলে অনায়াসেই ইহা মিশ্রিত হইতে পারে।

লিণ্ট্ বা তৎসদৃশ কোন প্রকার বস্ত্রে ক্লোরোফরম সিক্ত করনান্তর দেহের কোন স্থানে প্রয়োগ করিয়া, যদ্যপি ফ্লানেল, তুলা প্রভৃতি উষ্ণ বস্ত্র বা একটি কাঁচের গেলাস দ্বারা, যদ্যপি সেই স্থান উত্তমরূপে আবৃত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত শীতলতা অনুভব না হইয়া প্রথমতঃ এক প্রকার উষ্ণতা ও পরে সেই স্থান প্রদাহিত হয়, তখন অত্যন্ত জ্বালা করে। এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ রাখিলে পর উহা অসহ্য হইয়া উঠে এবং ক্রমে ফোস্কা উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত সময়ে সময়ে স্থানিক উগ্রতা সাধনার্থে ব্যবহৃত হয়। বেদনা স্থানে ব্লিষ্টার প্রয়োগের পরিবর্ত্তে, ক্লোরোফর্ম্ উগ্রতা সাধক স্বরূপ ব্যবহার করিয়া, আমরা অনেক স্থানে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। দন্তশূল রোগে, তুলি দ্বারা ক্লোরোফর্ম্ প্রয়োগ করিলে আশু বেদনার হ্রাস হয়। বেদনা যুক্ত ও ক্ষয় প্রাপ্ত দন্ত গহ্বরে ক্রিয়েজোট, অহিফেনের অরিষ্ট বা কর্পূর সহ ক্লোরোফর্ম্ মিশ্রিত করিয়া তুলি দ্বারা স্থানিক প্রয়োগ করিলে আশাতীত ফল লাভ হয়। দন্ত গহ্বরে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ কালে রোগীকে তাঁহার অপর পংক্তির দন্ত দ্বারা তুলিটী চাপিতে এবং মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ এরূপ করিলে দন্ত গহ্বরে উহা উত্তম রূপে প্রবিষ্ট হইবে অধিকন্তু মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে ক্লোরোফরম শীঘ্র উড়িয়া যাইবে না। ডাং সিমসন্ বলেন, ফটফোবিয়া অর্থাৎ আলোকাতঙ্ক নামক চক্ষুরোগে, হস্ততালুতে কিঞ্চিৎ ক্লোরোফরম্ ঢালিয়া চক্ষুর নিকট রাখিয়া, তদুত্থিত বাষ্প (Vapour) চক্ষুতে লাগিলে উক্ত রোগের অনেক উপশম হয়, এবং রোগী ক্রমে আলোক প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সক্ষম হয়। রজঃকৃচ্ছ্র রোগে (Dismenorhaæ) এবং জরায়ু মধ্যে ও উহার স্কন্ধদেশে কর্কটিকা (Cancer) প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় ক্লোরোফরমের বাষ্প (Vapour) রবারের নল দ্বারা ব্যবহার করিলে যাতনার অনেক উপশম হয়।

বিবিধ স্নায়বীক ও পার্শ্বকাপালিক শিরঃ পীড়ায় ইহার স্থানিক প্রয়োগে রোগী সচ্ছন্দতা অনুভব করে। পৈশিক বেদনায় ইহার

মর্দ্দনের (Liniment) সহিত, লিনিমেণ্ট বেলাডনা, লিনিমেণ্ট ওপিয়াই প্রভৃতি বেদনানিবারক ঔষধ, সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে, বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে। বিবিধ স্নায়ুশূল (Nuralgia) লম্বেগো, সায়েটিকা প্রভৃতি রোগে ক্লোরোফার্মের বাহ্যিক প্রয়োগ বিশেষ ফলদায়ক। কোরিয়া রোগে পৃষ্ঠ দণ্ডোপরি ইহার মর্দ্দন দিবসে দুই তিন বার ব্যবহার করিতে অনেকে অনুমোদন করেন। কথিত আছে ধনুষ্টঙ্কার রোগেও ইহার বাহ্যিক প্রয়োগ উপকারক।

ঠাণ্ডা লাগিয়া স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভূত হইল, স্পঞ্জ বা ফ্লানেল গরম জলে ভিজাইয়া এবং ভাল করিয়া নিংড়াইয়া, তাহাতে কতকটা লিনিমেণ্ট ক্লোরোফর্ম্ম লইয়া উক্ত স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। আর্টিকেরিয়া (চুলকানি), লাইকেন্, প্রুরাইগো, দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগে, যন্ত্রণা এবং চুলকানি নিবারণার্থে ইহার ধৌত (Lotion) ও মলম ব্যবহৃত হয়। ২।৪ ড্রাম ক্লোরোফরম এক পাইণ্ট জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ধৌত এবং এক আউন্স ভেসেলিন বা লার্ডের সহিত ১।২ ড্রাম ক্লোরোফর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। এবারে ক্লোরোফর্ম্মের বাহ্যিক প্রয়োগের আলোচনা করিলাম, বারান্তরে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগের আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

ফেনোকোল হাইড্রোক্লোরাইড।

(PHENOCOLL HYDROCHLORIDE.)

আজ কাল এণ্টিফেব্রিন্, ফেনাসিটিন, এণ্টিপাইরিন, রেসর্সিন্ কাইরিন্, এসিড সেলিসিলিক্ প্রভৃতি উত্তাপ হারক অনেকানেক নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত, নবাবিষ্কৃত ফেনাকোল্ হাইড্রোক্লোরাইডের (Phenocoll Hydro chloride) ক্রিয়া বিবরণ সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা

করিব। ইংলণ্ডের অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক উহার ব্যবস্থা করিয়া আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন। খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার (Dr Serna) সের্ণা এবং (Dr Carter) ডাক্তার কার্টার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া উহার যে উপকারিতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল।

(১) সাধারণ মাত্রায় রক্ত সঞ্চালনের উপর ইহার কোন ক্রিয়া দর্শায় না।

(২) অধিক মাত্রায় ব্যবহারে, রক্ত সঞ্চালন বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডের কোন অপকার হয় না।

(৩) ফেনাকোল হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যস্থিত যন্ত্রগুলিকে উত্তেজিত করিয়া নাড়ীর বেগ হ্রাস করে।

(৪) ইহা সেবনে, এক ঘণ্টার মধ্যে বিবিধ জ্বরের উত্তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ফুস্‌ফুস্, হৃদ্‌পিণ্ড ও পরিপাক যন্ত্রের কোন অপকার হয় না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসকদ্বয়ের মতে অন্যান্য জ্বরনাশক ঔষধ অপেক্ষা ফেনোকোল নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রফেসর ভনমেরিন্ (Pofessor Vonmerin) বলেন, নিউমোনিয়া ও টাইফয়েড্ জ্বরে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে ফেনোকোল রোগীর দুর্ব্বলতা বা অন্য কোন প্রকার অপকার না ঘটাইয়া দুই ডিগ্রি উত্তাপের হ্রাস করে। ৩০ গ্রেন এণ্টিপাইরিন্ ও ১২ কিম্বা ১৫ গ্রেন ফেনাসিটিন ব্যবহারে যে পরিমাণে উত্তাপের হ্রাস হয়, ১৫ গ্রেন ফেনোকোল সেবনেও তদ্রূপ ফল লক্ষিত হয়।

ডাক্তার হার্লেটের (Dr Harlet.) মতে জ্বর এবং বাতনাশই ইহার প্রধান ক্রিয়া। ৭॥ গ্রেন হইতে ১৫ গ্রেন মাত্রায় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার, তাহার নির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ বিধি। তিনি প্রথমতঃ এক মাত্রায় ৭॥ গ্রেন ফেনোকোল সেবনে এক ঘণ্টার মধ্যে অর্দ্ধ ডিগ্রি পরিমাণে উত্তাপের হ্রাস হইতে দেখিয়াছেন; এবং তিন মাত্রা সেবনের পর এক ডিক্রি উত্তাপ কম হইয়াছিল।

এক মাত্রায় ১৫ গ্রেন ফেনাকোল ব্যবহার করিলে, ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই ১ হইতে ১।।০ ডিগ্রি উত্তাপের হ্রাস হয়, অধিক উত্তাপজনক জ্বরে, ৭৫ গ্রেণ্ ফেনোকোল্, মাত্রা বিভাগ করিয়া প্রয়োগ করিলে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তাপের হ্রাস হয় এবং রোগী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পরন্তু ঘর্ম্ম, কম্পন, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গাদি সংঘটিত হয় না। উক্ত চিকিৎসক ৩।৪টী তরুণ বাতরোগ গ্রস্থরোগীকে প্রথমতঃ এণ্টিপাইরিনি, সোডা সেলিসিলাস্ ও ফেনাসিটিন ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় নাই, পরিশেষে তিনি ৭৫ গ্রেন্ ফেনোকোল, মাত্রা বিভাগ করিয়া, ব্যবস্থা করেন, এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রোগী-দের বেদনা ও অন্যান্য উপসর্গাদির উপশম হইয়াছিল। ৭০ গ্রেন সেবনের পর, মূত্র কিঞ্চিৎ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু মূত্রাশয়ের কোন অপকার হয় নাই।

৭৫ গ্রেন ফেনোকোল মাত্রা বিভাগ করিয়া প্রয়োগ করিলে, সাধারণ জ্বরের বিচ্ছেদ হয়। যক্ষ্মা রোগের প্রথমাবস্থায়, হেক্‌টিক্ ফিবার রোগে, ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হবে কি আমার ?

(১)

অতি দীনহীন আমি, দিবানিশি দীর্ঘশ্বাস,
নয়নের জল,
বিমর্দ্দিত মরমের, ব্যথিত কাহিণী শুধু,
আমার সম্বল।
গুণহীন অতি হেয়, নাহিক আপন কেহ,
নাই ঘর দোর,
তা ছাড়া পাগল আমি, আপনার কল্পনায়
আপনি বিভোর।
মান অপমান মোর সকলি সমান,
ওদের ও উপহাস করি ছার জ্ঞান॥

(২)

ওরা, কত জহরত হেমে, সাজায় আপন জনে,
আমি তা পারিনে,
ওরা, বচনে সাগর সেঁচে, মাণিক দিতে যে জানে,
আমি তা জানিনে।
আমি শুধু দিতে পারি, ক্ষুধায় কাতর প্রাণ,
ভাষা ভাবহীনা,
তুচ্ছ এর বিনিময়ে, অমূল্য পরাণ দিতে
এত কি বাসনা ?

ভাল ক'রে ভেবে দেখ, কাঁদালে এ জনে,
সঁপোনা সরল প্রাণ, হায়! জেনে শুনে॥

(৩)

আমারে বাসিয়ে ভাল, কাঁদিবে কি চিরকাল,
হা! কোমল প্রাণ?
জেনে শুনে তবু বালা! জাচিয়ে করিছ কেন,
আপনারে দান?
আমি শুধু দেখে সুখী, জানিনা'ক প্রণয়ের
আদান প্রদান;
নিরেলা নিকটে রাখি, আমি সুখে ব'সে থাকি,
নীরব ধেয়ান!
এমন অধমে তবু দিতে চাহ প্রাণ,
হায়! জেনে শুনে কেন এই আত্ম বলিদান?

(৪)

চাঁদের জ্যোছনা টুকু, কুসুমের হাসি টুকু,
ভ্রমরের তান,
মলয়ের অভিমান, ক্ষুদ্রবীচি তটিনীর
আকুল আহ্বাণ।
দিগন্ত প্রসারি কাল নিবিড় তিমিরজাল,
ঘোর মেঘমালা,
নিশীথিনী আত্মহারা, পবন পাগল পারা,
বিদ্যুতের ঝালা।
উষার অরুণ-কান্তি, সৌম্য শান্ত সন্ধ্যামূর্ত্তী,
পাখির ঝঙ্কার,

প্রকৃতীর ভীম কাণ্ড, এই সব রঙ্গ নিয়ে
ব্যবসা আমার।
জগৎ ফেলিয়ে রাখি, কল্পনার স্বর্গে মোর
নীরব পয়াণ।
প্রকৃতির সনে মোর, হাসি কান্না বারমাস,
পাগলের গান!
বাস্তব এ জগতের ধরিনা'ক ধার,
অবাস্তবে নিশিদিন প্রণয় আমার।

(৫)

আপনারে যথাযথ, বিশ্লেষণ করি তোমা,
দেখাইনু হায়!
এখনও বাসনা কিগো, দেববালা! আত্মদান
করিতে আমায়?
না দেখিয়ে না শুনিয়ে, আপনা বিলায়ে দেওয়া
একি ছেলে খেলা!
আবেগে যেওনা ভেসে, ভাল ক'রে ভেবে ওগো,
দেখ এই বেলা।
এ বড় বিষম দান, যারেক করিলে ভুল,
নাহি'ক উপায়—
আপনারে দিয়ে হায়! ফিরিয়া চাহিলে আর
নাহি পাওয়া যায়।
তখন কেবল ভেসে, বেড়াইবে দেশে দেশে,
শিরে করাঘাত!

কি করিতে কি করেছি, না বুঝে আপনা দিছি,
ঘোর বজ্রপাত!
কিছু না গোপন করি, অকপটে ভবিষ্যত
দেখানু তোমার
সরলা বালিকা রাণি, এখন বলত তুমি,
হবে কি আমার?

শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত।

কাঙ্গালিনী ।

(১)

কে ওই বালিকা কুটীর দুয়ারে
ছিন্নবাস পরা মলিন মুখ ;
উদাসনয়নে কেন চায় ধীরে
কে দিয়াছে ওর মরমে দুখ !

(২)

মুখ খানি ওর গিয়াছে শুখায়ে
চুলগুলি উড়ি পড়িছে মুখে ;
চোখ দুটি আহা ! গিয়াছে বসিয়া
চাহেনা ফিরিয়া কাহারো দিকে ।

(৩)

কেন হেথা তুমি কাঙ্গালিনী মেয়ে
এ মরু-সংসারে কিসের লাগি ?
ভেবেছ কি মনে পাইবে হেথায়
সুখের দুখের সমান ভাগী ?

(৪)

সে দারুণ আশা হবে না পূরণ
কেহ না ভাবিবে তোমার তরে ;
না ডাকিবে কেহ করিতে যতন
অনাদরে সবে ত্যজিবে দূরে ॥

(৫)

জান না কি এই স্বার্থপর দেশে
কাঙ্গালের স্থান কোথাও নাই ;
তবে কেন মিছে, পরমুখ চেয়ে
ঘুরিয়া বেড়াও, যাচিয়া ঠাঁই ॥

(৬)

কাঙ্গালীকে দয়া এ দেশেতে নাই
ক্ষুধিতকে দান কেহ না করে ;
বিপদে উদ্ধার দেখিতে না পাই,
নিজ কাজে সবে ঘুরিয়া মরে ॥

(৭)

যাও গো অভাগি ! ত্যজি এ "সাহারা,"
যাও সেই দেশে যেখানে সবে,
ভুলি নিজ সুখ, পরের দুখেতে
আত্মহারা হ'য়ে বেড়ায় ভবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

আমার কাহিনী।

Alas. the human heart is unaccountable if seeks repose where there is none."

(*GOETHE.*)

তখন সবে মাত্র কৈশোর অতিবাহন করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। জীবন তখন স্বপ্নময় ছিল। ভাল মন্দ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। তখন সকলই কি এক প্রহেলিকার আচ্ছাদনে আবৃত ছিল। জগৎ এক মোহকর দৃশ্য আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিয়াছিল। তখন হৃদয়ের মাঝে অননুভূতপূর্ব্ব কি এক তাড়িত-প্রবাহ ছুটিত, প্রাণে কি এক মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হইত। কৈশোর যৌবনের এই সঙ্গম স্থলে,—হৃদয়ের এই মত্তাবস্থায়, এ মদির-নয়নে যাহা দেখিতাম, তাহাই প্রাণের গভীরতমপ্রদেশে কি এক কুহকজাল বিছাইত, কি এক কাল্পনিক সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিত। মনে হইত এ জগৎ যেন আর কখনও দেখি নাই; মনে হইত, এ সংসারের সহিত, এ প্রাণিসমাজের সহিত, এ সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির সহিত যেন আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ! প্রস্ফুট কুসুমে ভ্রমর দেখিলে, আত্মহারা হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতাম। মনে হইত, এমন ফুল বুঝি আর কখনও কোথাও দেখি নাই। আবার মনে হইত, এমন ফুল হয়ত আর কোথাও দেখিয়া থাকিব, কিন্তু প্রস্ফুটিত কুসুমে এমনতর ভ্রমর বোধ হয় আর কোথাও দেখি নাই—প্রকৃতির এমন "ললামশোভা" আর কখনও চক্ষুর গোচরে আসে নাই। তাই কখন ফুলের দিকে, কখনও বা ভ্রমরের দিকে চাহিতাম, আবার কখন ফুল এবং ভ্রমরকে একত্র করিয়া দেখিতাম। দিবাশেষে তরুণারুণ নিস্প্রভ হইলে, সন্ধ্যাবধুর নীলাম্বরী শাটী দিগন্ত আচ্ছন্ন করিলে, তারামালা লইয়া

তারানাথ গগনে উদয় হইত। তরঙ্গিণী তরঙ্গে প্রতিভাত হইয়া শত চন্দ্রের বিকাশ হইত। তরঙ্গিণী, সলিল-তারায় ছাইয়া যাইত। সে সুন্দর দৃশ্যপট দেখিয়া মোহিত হইতাম। কত যত্ন করিতাম, কিন্তু প্রকৃতির এ রঙ্গের রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না।

কতদিন বসন্তের মধুপ্রভাতে, আশার নেশায় বিভোর হইয়া, কল্পনার ছবি আঁকিতে আঁকিতে, আপনার মনে, কাননে-কাননে মৃদু পদে বেড়াইতাম। এমন সময়ে পাতার আড়ালে বসিয়া কুহু কুহু রবে কোকিল ডাকিয়া উঠিত। সে কূজন কর্ণে পশিয়া, আমার আশার নেশা ঘুচাইত; আমার কল্পনার ছবি মুছিয়া ফেলিত! শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, কি এক তাড়িত প্রবাহ ছুটিত, প্রাণের মাঝে কি এক নব রসের উৎস উচ্ছ্বসিত হইত! আকুল হইয়া চারিদিকে চাহিতাম, প্রাণের সেই অবক্তব্য ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। কোকিলের কুহুস্বর, নন্দনের বার্ত্তা আনিত, প্রাণের জড়তা ঘুচাইত, সংসার ভুলিয়া যাইতাম, কল্পনাস্বর্গে বিচরণ করিতাম। হৃদয়পটে একখানি প্রতিকৃতি প্রকটিত হইত। কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না, সে ছবিখানি কার। কানন ছাড়িয়া গৃহে আসিতাম, সংসারের কোলাহলে প্রাণের সে একাগ্রতা ঘুচিয়া যাইত, সে সাধের প্রতিকৃতিও তারই সাথে বিলীন হইত। আবার কখন বা কাল্পনিক নিরাশায় কাতর হইয়া ভগ্নপ্রাণে, গৃহ ছাড়িয়া তরঙ্গতোয়া তটিনীরতটে বসিতাম। সহসা সে মোহ টুটিত, কল্পনার সে কুহক জাল বিচ্ছিন্ন হইত! নদীর কল্লোলে শ্রবণ আকৃষ্ট হইত! ভাবিতাম, আহা! তটিনী কেমন কলকল তানে সাগর পানে ছুটিয়াছে! সুদীর্ঘ বিরহের পর এ মিলন কি মধুর, কি সুখের! নিজের জীবন বিশ্লেষণ করিতে বসিতাম। অমনই তখন কি অস্পষ্টভাবে সারা হৃদয় ছাইয়া ফেলিত; প্রাণের অন্তস্তল শূন্য বোধ হইত। ভাবিতাম, চিরকালই কি এমনই করিয়া যাইবে! এ শূন্যহৃদয়ের এমনতর সর্ব্বগ্রাসিণী পিপাসা লইয়াই কি আজীবন সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইব? এ অশান্তির কি উপশম নাই, এ আগ্রহ কি মিটিবে না? হায়! তখনও জানিতাম

না যে, এ আগ্রহ মিটিবার নয়; এ অশান্তি ঘুচিবার নয়। রাবণের চিতা নিবিবার নয়! তোমাকে যা বলিতে বসিয়াছি, বলি শোন।

জীবনের সেই স্বপ্নময়ী উষায়, একদিন আকুল প্রাণের আশ্রয় লইয়া নিভৃতে বসিয়া আপনার মনে এ পোড়া অদৃষ্টের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলাম। প্রকৃতির কান্তি সে সময়ে বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল। সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আকাশের কোলে দুই একটি নক্ষত্রও দেখা দিয়াছে। শরৎ কাল, সুতরাং আকাশ বেশ পরিচ্ছন্ন। কেবল দুই এক খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ, আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ছুটাছুটি করিতেছিল। কিন্তু সে মেঘের খেলা আকাশের পরিচ্ছন্নতার কোন বিঘ্ন না ঘটাইয়া বরং তাহার সৌন্দর্য্যেরই বৃদ্ধি করিতেছিল। আকাশের নিম্নে কল কল প্রবাহিনী তটিনী। সান্ধ্যপবনের মৃদু হিল্লোলে তরঙ্গিণীর অনাবিল বারিরাশি, তরঙ্গায়িত। সে তরঙ্গ নিকর কোলে করিয়া, নদী আপনার মনে কুলকুলস্বনে অনন্ত সাগরপানে ছুটিয়াছে। প্রকৃতির সেই মোহকরী অবস্থায় একাকী বসিয়া তরঙ্গিণীর সেই মিলন প্রয়াস, মেঘে মেঘে সেই মেশামিশি দেখিতেছিলাম। আর দেখিতেছিলাম, অদূরে অশোক শাখায় বসিয়া, প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া চক্রবাক দম্পতী চন্দ্রের সুধা পান করিতেছে। মনে হইতেছিল, চিরদিন এমনই করিয়া একলা কি প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া থাকিব? বিহঙ্গ দাম্পতীর ন্যায় জগৎ সংসার ভুলিয়া প্রেমবিভোর প্রাণে কি প্রকৃতি রাণীর এ মাধুর্য্য, এ সৌকুমার্য্য উপভোগ করিতে পাইব না? হায়! এমন সময়ে প্রাণের এ আবেগময়ী আকুল অবস্থায় তুমি দেখা দিলে। বান্ধুলি অধরে মৃদুহাসি রেখা ফুটাইয়া বলিলে.—"আমি তোমার সঙ্গিনী হইব, আমরা দুজনেও ঐ চক্রবাক চক্রবাকীর ন্যায় অমনই করিয়া, সৌম্যময় শান্তি সন্ধ্যায় বিমোহিত প্রাণে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিব।" সহসা প্রাণের কপাট খুলিয়া গেল, প্রাণে মলয় মারুত প্রবাহিত হইল। বড় আশায় হৃদয় বাঁধিলাম। তোমাকে পাইয়া সব পাইলাম। অমিত তেজ, অদম্য

উদ্যম, প্রগাঢ় একাগ্রতা, অনন্ত উৎসাহ, অপূর্ব্ব যোগ্যতা, কার্য্যশীলতা প্রভৃতি সকলই দেখা দিল। কৃচ্ছ্রসাধ্য ভাবিয়া যাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সুসাধ্য ভাবিয়া আবার তাহার সম্পাদনে প্রয়াস পাইলাম। কল্পনায় সুখের ছবি আঁকিয়া তোমাকে লইয়া সংসারে নামিলাম প্রাকৃতিক রাজ্যে তোমাকে অধিষ্ঠাত্রীদেবী ভাবিয়া আত্মহারা হইয়া তোমার ধ্যানে মোহিত থাকিতাম। বড় সুখেই দিন যাইতেছিল। দুঃখ কাহাকে বলে, জানিতাম না; অশান্তির লেশ মাত্রও ছিল না। চিরসুখ, চিরশান্তি, চির প্রফুল্লতায় দিন কাটিত। এই পৃথিবীই যেন স্বর্গের নন্দনকানন বলিয়া প্রতীয়মান হইত। প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রকৃতি, নূতন তর দৃশ্য আনিয়া নয়নের সম্মুখে ধরিত, প্রাণ, বিভোর হইয়া থাকিত।

কিন্তু বিধির যে কি নিগ্রহ, এ দগ্ধাদৃষ্টের যে কি ফের, তা'বলিবার নয়। যতই দিন কাটিতে লাগিল, তুমি যেন ততই কেমনতর হইতে লাগিলে। প্রত্যেক নূতন প্রভাত, তোমাতে রাশি রাশি পরিবর্ত্তন আনিতে লাগিলেন! অবসাদ ও বিরক্তি, প্রতি নিয়ত তোমার নয়নে প্রতিভাত হইত। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া যেন আর তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। কি এক নূতন পিপাসায় তুমি অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলে। কত যত্ন করিতাম, কিন্তু তোমার সে অশান্ত পিপাসা মিটিত না। তোমার সে কিসের তৃষ্ণা জানিতে কত প্রয়াস পাইতাম, কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। ভাবে একদিন বুঝিতে পারিলাম, তোমার 'প্রতিজ্ঞা' হইতে তুমি বিচ্যুতা হইতে বসিয়াছ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আর তোমার শান্তি নাই, আমাতে তোমার আর আরাম নাই। তোমার সরল প্রাণ, সংসারে মিশিয়া আবিল হইয়াছিল। অর্থের জন্য, সংসারে নামের জন্য, সমাজে প্রতিপত্তির জন্য, তোমার লালসা বাড়িয়াছিল। কিন্তু তোমার সে লালসা মিটাইবার ক্ষমতা আমার নাই। তখনও ছিল না; এখনও যে আছে, তা নয়। কাজেই তুমি আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলে; আর একত্র থাকিতে চাহিতে না। দূরে দূরে থাকিয়াই

যেন তুমি সুখী হইতে, আমাকে চক্ষুর অন্তরালে রাখিলেই যেন তোমার শান্তি হইত। তখন বুঝিতে পারিলাম, এ পোড়া অদৃষ্টে সুখ নাই, এ উদ্দম হৃদয় শান্ত হইবার নয়। "তোমাকে লইয়া সুখী হইব" এ মোহ ঘুচিবার উপক্রম হইল। কিন্তু সহসা প্রাণের ভিতর কে যেন বলিয়া উঠিল, "কর কি, জান না, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছিল মরিবার জন্য।" সে তন্দ্রা না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, তাই আবার যত্ন করিয়া চক্ষু মুদিলাম, আলস্যের আশ্রয় লইলাম. সে মোহনিদ্রা ফিরাইবার প্রয়াস পাইলাম।

কিন্তু হায়! সহসা একদিন সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম আমার সাধের নন্দনকানন প্রবল বাত্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শ্রীহীন হইয়াছে; আদরের লতাটী ভূমিতে অবনত হইয়া পড়িয়াছে; আশার ফুলটি শুকাইয়া গিয়াছে; কল্পনা প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া প্রকৃতির গৃহ, মলিন করিয়াছে। দেখিলাম, ঘুম না ভাঙ্গিতেই, উৎসাহ, আনন্দ, প্রফুল্লতা, প্রভৃতি একে একে বিদায় লইয়াছে। অবসাদ অশান্তি হৃদয়ে, আশ্রয় পাইয়াছে; নয়নে কালিমা পড়িয়াছে, শ্বাস দীর্ঘ হইয়াছে। এ ঘটনা সেই দিনকার, যেদিন তুমি মলিনবদনে নিকটে আসিয়া কাতরস্বরে কহিলে,—'প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্যে আর আমার সাধ মেটে না; ওরা কেমন হেম-হীরায় সাজিয়াছে, সমাজে ওদের কত মর্য্যাদা! আমারও বড় ইচ্ছা হয়, ঐরূপ সুন্দর সাজে সাজিয়া, ঐ রকম করিয়া সমাজের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করি।" কিন্তু তোমাকে হীরা জহরতে সাজান আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তাই তুমি আমাকে ফেলিয়া একাকিনী সংসার পথে চলিলে। ভগ্নপ্রাণে, অনুৎসাহে, আমি সংসারের এক কোণে পড়িয়া রহিলাম। আমি কিছু চিরদিন এরূপ ছিলাম না। আমারও হৃদয় পূর্ণছিল, আমিও সুখী ছিলাম। এ কেবল যেদিন তুমি আমাকে ছাড়িলে, সেই দিন এমনতর হইয়াছি। সেইদিন হইতে সুখ হর্ষে জলাঞ্জলি দিয়া, হৃদয়ে দুঃখের ভার লইয়া বসিয়াছি। এ কিছু আমার দোষ নহে, তোমাকেই যে দোষী বলিতেছি, তাও নহে,

সবই অদৃষ্টের দোষ! সবই বিধির নিগ্রহ! তাই এখন কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবি,—

কিন্তু হায়!, হায়! তবুও "আন করল হিয়ে, বিহি কৈল আন।
"অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরান॥"

শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত।

কলিকাতায় বসন্ত।

কলিকাতায় আজ কাল বসন্ত রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইতিমধ্যে সহরে গ্রীষ্মও খুব পড়িয়াছে, ওলাউঠার এখনও তেমন বাড়া বাড়ি হয় নাই। বসন্ত রোগে মৃত্যু সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। গরীব রোগীরা চিকিৎসিত হইবার জন্য শিয়ালদহ ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে যাইতেছে কিন্তু ক্যাম্বেলে আর স্থান নাই বলিলে হয়। আর একটি নূতন ওয়ার্ড খুলিবার কথা হইতেছে, বোধ হয় শীঘ্রই উহার আবশ্যক হইবে। এখন সহরবাসীদের মধ্যে অনেকেই ভীত হইয়াছেন; গায়ে হাতে সামান্য বেদনা হইলে "বসন্ত হইল" বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। বস্তুতঃ এ সময় যখন এই ব্যাপার, তখন বৈশাখ, জৈষ্ঠমাসে কি হইবে বলাযায় না। পরন্তু উত্তম বর্ষন না হইলে কেবল বসন্ত কেন, ওলাউঠা, উদারাময় প্রভৃতি রোগও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া বোধ হয়। বসন্তের ভয়ে অনেকে টিকা লইতেছেন; কাহারও বা ফল হইতেছে, কাহারও বা উঠিতেছে আবার কেহ কেহ টিকা লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসন্তরোগাক্রান্ত হইতেছেন। যাহা হউক বসন্তের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য যাঁহারা টিকা না লইয়াছেন তাঁহাদের এই সময় টিকা না লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ টিকা লইয়া কএকটি লোক, রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। কই, মাগুর প্রভৃতি মৎস্যের গায়েও নাকি বসন্ত দেখা দিয়াছে। যাঁহাদের বসন্তে ভয়; তাঁহারা

কই, মাগুর যেন না খান। হরিতকীর বিচি, হাতে, মাদুলির ন্যায় বান্ধিলে বসন্ত আক্রমন করেনা। "হিতবাদীতে" নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রকাশিত হইয়াছে। "কণ্টিকারির কাঁচা মূল ২ টা, ২॥০ টা গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে, যাবজ্জীবন বসন্ত হইবেনা। যাহাদের গাত্রে বসন্ত হইয়াছে, তাহাদের সেবন করাইলে তাহারাও মুক্ত হইবে। ক্ষত স্থানে ভেকের বসা, ব্যবহার করিলে ক্ষত শীঘ্র ভাল হইবে।" এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তি আরোগ্য হইয়াছে। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ডাক্তার গিবন্স্ অনুমতি করিয়াছেন যে, যাহারা আরোগ্য লাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া যাইবে, তাহাদের পুরাতন বস্ত্র যেন প্রত্যর্পন করা না হয়, কারণ রোগ স্পৃষ্ট বস্ত্রে "বসন্ত বীজ" সংশ্লিষ্ট থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আর এই বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহারা লোকালয়ে যাইলে, সুস্থ ব্যক্তির বসন্ত হইবার অনেক আশঙ্কা আছে। রোগীদের এখন বস্ত্রাভাব হইতেছে, এজন্য ডাক্তার গিবন্স্ রোগীদের জন্য বস্ত্র ভিক্ষা চাহিতেছেন। আশাকরি ডাক্তার গিবন্সের এই সাধু উদ্দেশে, দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে তাঁহার নিকট বস্ত্রাদি পাঠাইয়া যথা যোগ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। বারান্তরে "বসন্ত ব্যাধি" নামক বিস্তৃত প্রবন্ধ চিকিৎসক ও সমালোচকের গ্রাহক বর্গকে উপহার দিব।

ডাক্তার সার জোসেফ ফেরার।

কে, সি, এস, আই, এম, ডি; এফ, আর, সি, পি; এম, আর, সি, এস; এল, এল, ডি; এম, আর, সি, এস, কিউ, এইচ, পি।

ডাক্তার জোসেফ ফেরারের নাম বোধ হয় কাহারও নিকট অপরিচিত নাই। ডাক্তার ফেরার একজন স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ। চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। নিজ অসীম ক্ষমতা বলে, তিনি প্রায় জগতের সকল স্থানেই সুপরিচিত আছেন। ফেরার

সাহেব এখন রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে বাস করিতেছেন। ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডের অন্তর্গত মিলনথ্রপ নগরে ১৮২৪ সালে ৬ই ডিসেম্বর, মহাত্মা জোসেফ্ ফেরার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রবার্ট জন্ ফেরার রাজকীয় রণপোতের নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ্যের পদে অধিরূঢ় ছিলেন। জোসেফ ফেরার ষোড়শ বৎসর বয়স হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৭ সালে ডাক্তারী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া এম, আর, সি, এস, উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি রাজকীয় রণপোতের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হন। ডাক্তার ফেরার, ফ্রাঙ্কো ইটালিয়ান যুদ্ধের সময়ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫০ সালে ২৯এ জুন, তিনি ইষ্টইণ্ডিয়ান কোম্পানীর অধীনে নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষে আসিয়া, প্রথমে তিনি দমদমার রয়েল আরটিলারীর তত্ত্বাবধানে এবং ছিরা পুন্‌জির যাবতীয় ভার গ্রহণে নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ সালে তিনি লক্ষ্ণৌয়ে এসিষ্টাণ্ট পলিটিক্যাল রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

১৮৫৫ সালে মহাত্মা ফেরার বঙ্গীয় সৈন্যের (Bengal army) মেজর জেনারল এলড্ স্পেন্সারের প্রথমা কন্যা জৈথয়া মেরিকে বিবাহ করেন। লক্ষ্ণৌ অবস্থিতি কালে প্রসিদ্ধ সিপাহী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সেই ভীষণ বিপ্লবের সময়, ডাক্তার ফেরার আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। সেই সময়ে তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় মন্ত্রণা সভায় (Council of war) যোগদান করিয়া, উপস্থিত সিপাহী বিদ্রোহে কিরূপ কার্য্য করা বিধেয়, তৎ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তার ফেরার যে বাঙ্গালায় বাস করিতেন, সেই সময়ে তাহা পীড়িত সৈন্যগণ দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। কারণ সেই স্থান হইতে ঘটনাস্থল অধিক দূর ছিল না। ১৮৫৭ সালে ৪ঠা জুলাই, স্যর জন্ লরেন্স বিপক্ষদিগের দ্বারা বিশেষরূপে আহত হইয়া উক্ত বাঙ্গালায় প্রাণত্যাগ করেন। আহত সৈন্যগণ আরোগ্যলাভ করিলে, ডাক্তার ফেরার তাহাদিগের সহিত, কানপুর সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধারণার্থে কানপুরাভিমুখে যাত্রা করেন। সিপাহী যুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে মহারাণীর এসিষ্টাণ্ট

সার্জ্জন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ সালে জানুয়ারী মাসে ডাক্তার ফেরার সি, এস্, আই, উপাধি লাভ করেন।

১৮৫৯ সালে, ডাক্তার ফেরার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অস্ত্র বিস্তার (Surgery) অধ্যাপক এবং প্রাধান চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন, উক্ত পদদ্বয় তিনি ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত (যতদিন না তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন) প্রশংসার সহিত অধিকার করিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে ডাক্তার ফেরার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সভার সভাপতি (President of the Faculty) নির্ব্বাচিত হন। এবং প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্র চিকিৎসার পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। কিছুদিনের জন্য তিনি যাদুঘরের সভাপতির আসনও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার ফেরার বড়লাট সাহেবের অতিরিক্ত অবৈতনিক সার্জ্জন এবং হাওড়া জেনারল হাঁসপাতালের পরামর্শক (Consulting) চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮৭০ সালে ডিউক অফ্ এডিনবরার দেশপর্য্যটন সময়ে, ডাক্তার ফেরার, ডিউকের অবৈতনিক সার্জ্জন এবং যুদ্ধকালীন তাঁহার চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন।

১৮৭০সালে ফেরার মহারাণীর অবৈতনিক সার্জ্জন নিযুক্ত হন। তিনি ডিউক অফ এডিনবরার(Ordinary)চিকিৎসক এবং যুবরাজপ্রিন্স অফ ওয়েলসের অবৈতনিক সার্জ্জন নিযুক্ত হুন। এবং ঐবৎসরের শীতকালে প্রিন্স অফ ওয়েল্স, ফেরারের সহিত ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন। ফেরার, সিলেটের সৈন্থিক মেডিকেল কলেজের ও নেটলির (Netley) সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং সৈনিক ও নাবিক দিগের অস্থিবিদ্যা (Anatomy) ও প্রাণী-বিদ্যার (Physiology) পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ সালে ডাক্তার ফেরার কে, সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ সালে রোমের ইন্টার ন্যাসন্যাল সেনিটারি কংগ্রেসের (Intrnational Sanitary Congress) এবং ১৮৮৩ সালে এমস্টার্ডামের ইন্টার ন্যাস্নাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত

হন। ১৮৮৯ সালে ন্যাসনাল লেপ্রোসি কমিশনের (National Leprosy Commission) সভ্য এবং ১৮৯০ সালে রিভাইভড সেনিটরি সভার সভ্য নিযুক্ত হন।

উপাধি লাভ — ১৮৪৮ সালে ডাক্তার ফেরার, রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ডি; ১৮৫৯ সালে, এডিনবরার এম, ডি; ও এফ, আর, সি, এস; ১৮৭২ সালে লণ্ডনে এফ, আর, সি, পি; ১৮৭৮ সালে বিলাতে এফ, আর, সি এস; ১৮৭৮ সালে এডিনবরার এল, এল, ডি; ১৮৯০ সালে সেণ্ট্‌ এনড্রুসে এল, এল, ডি; প্রভৃতি উচ্চ উপাধিগুলি লাভ করেন।

রাজকীয় সভার সভ্য — ডাক্তার ফেরার রাজকীয় প্রায় সমস্ত সভার সভ্যপদ গুলি লাভ করেন। ফেরার লণ্ডন ও এডিনবরার রাজকীয় সভার (F, R, S,) সভ্য; Fellow of the Royal Medico Chirurgical Society; Member Council of the Pathological Society; Ex-President, London Epidemiological and Medical Societies; corresponding Member—Academy of Medicine, Paris; Member of the Royal Academy of Medicine of Rome; Phisician to the Secratory of State for India in Council; Corresponding Member, Academy of Natural Sciences, Philadelphia; Foreign Corresponding Member of the Royal Academy of Sciences of Lisbon; Foreign Associate of the College of Phisicians, Philadelphia and Governor of Guy's and Charing cross Hospital, London.

ফেরারের গ্রন্থাবলী — ডাক্তার ফেরারের ন্যায় একত্রে এতগুলি গুণবিশিষ্ট লোক প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ফেরার লিখিত পুস্তক সমূহ মধ্যে যে গুলি জনসমাজে অধিকতর সুপরিচিত, আমরা সেই গুলিই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। জগতে যতদিন চিকিৎসা শাস্ত্র প্রচলিত থাকিবে, ডাক্তার ফেরারের নামও সেই সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের নিকট প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

১৮৬৬ সালে "clinical Surgery in India"; ১৮৭৩ সালে "clinical and Pathological Observations in India";

১৮৭৩সালে 'Thanatophia of India"র দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৯১সালে "On Dysentry, Diarrhæa and other Forms of Tropical Disease".১৮৮২সালে "On Climate and Feyers of India" "On the Physiological action of the poison of Naja tripudians and other venomous snakes". "The Indian Bael fruit and its uses" "chronic diarrhæa of the tropics of India". "preservation of Health in India". "The Royal tigar of Bengal". "With the Indian princes". "Tropical diseases". "Lever Abscess". "Rules regarding defective vision". "Rain fall and climate of India". "Destruction of Life by Wild animals and snakes in India". "The naturál History of chobra". "Carlsbad Waters"এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আরও অনেক গ্রন্থ, পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু সেগুলি জন সমাজে তত পরিচিত নহে। তন্নিমিত্ত তাহাদের উল্লেখ করিলাম না। ডাক্তার ফেরার একজন 'ক্ষণজন্মা পুরুষ। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, সকলের নিকট মহাত্মা ফেরারের গ্রন্থ আদরের বস্তু। চিকিৎসা শাস্ত্রে, বিশেষতঃ অস্ত্রবিদ্যায় এতদূর ক্ষমতা, বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর কাহারই দেখা যায় নাই।

১৮৯২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে, ৬৫ বৎসর বয়সে ডাক্তার ফেরার রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করেন। ডাক্তার ফেরার একজন সাহসী ও পারদর্শী চিকিৎসক বলিয়া ভারতবর্ষে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি এখন স্বদেশে (বিলাতে) বাস করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ।

আধুনিক বঙ্গ।

প্রাচীন বা প্রকৃত বঙ্গ বাঙ্গলার অতি সামান্য অংশ মাত্র এবং ঐ অংশও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন, ভিন্ন দেশাগত আর্য্য সন্তান দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালীগণের

দ্বারা ইতিহাসের সমালোচ্য কোন কার্য্য সমাধিত হয় নাই, পুরাণেও যুদ্ধ বিগ্রহের কথা কিছুই লেখা নাই। কিন্তু ইহা আদৌ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস। এখন যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য করা যাইতেছে, তাঁহারা বঙ্গদেশের নহেন। কান্যকুব্জের, মৎস্যের, অঙ্গের —এখন যাহারা এখানকার বাঙ্গালী, তখন তাঁহারা কান্যকুব্জের, মৎস্যের ও অঙ্গের। বোধ হয়, কাহাকেও আর নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে, আদি শূরের সময় (খৃঃ ৯৫০—১০০০) কান্যকুব্জাগত যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন, এবং রাজা কর্ত্তৃক পাঁচ খানি গ্রাম ও প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা এতদ্দেশে বাস করেন। পাঁচ জন কায়স্থ ঐ পঞ্চজন ব্রাহ্মণের সহিত আগমন করেন; এখনকার ব্রাহ্মণ, কায়স্থগণ ঐ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের সন্তান সন্ততি।

পৌরাণিক সময় ছাড়িয়া দেই। কেননা, তখনকার ইতিহাস এখনকার জ্ঞান দৃষ্টিতে অপ্রমাণ্য। প্রকৃত ইতিহাসে বিজয়-সিংহের সিংহল বিজয় উল্লেখ আছে।

বেশভূষায় বাঙ্গালীরা কিরূপ ছিলেন, নিশ্চয় বলা যায় না। মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ধুতি, উত্তরীয় অঙ্গে অঙ্গ-রক্ষা (আংরাখা) ছিল, উষ্ণীষও থাকা সম্ভব। বৌদ্ধদিগের পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ মস্তক-মুণ্ডন করিয়া শিখা ধারণ করিতেন না। বৌদ্ধশ্রমণেরা প্রথমে একবারে মস্তক-মুণ্ডন করিতেন, তাহা হইতে ব্রাহ্মণেরা মস্তক মুণ্ডন করিতে শিখেন। বোধ হয়, পূর্ব্বে জটা-জুট গুম্ফ সকলেরই ছিল—ক্রমে বৌদ্ধদিগের দেখা দেখি সকলই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিনামা ব্যবহার হইত কি না বলা যায় না; কিন্তু কাষ্ঠ পাদুকা ছিল অথবা কাষ্ঠ ও চর্ম্ম নির্ম্মিত এক প্রকার পাদুকা ছিল। ছত্র, শিবিকা, গোযান ছিল। এখনকার মত ঘোটক যানাদি ছিল না। মুসলমানদিগের সময়ে, পাশ্চত্য প্রদেশীয় বেশ বাহনাদি প্রচলিত হইয়াছে।

ভোজন বিষয়ে এমন বেশী কিছুই পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না।

অন্ন ব্যঞ্জন প্রায় একরূপ ছিল, খিচুড়ী ছিল না, পক্কান্ন ও পায়স ছিল। তবে পায়সটা এখনকার মত কি অন্যরূপ ছিল, তাহা ঠিক করা কঠিন। অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা মাংসভোজী ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধাধিকার হইতে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ হয়। এক্ষণে যে প্রকার ঘৃত ও তৈল পক্ক জলপানীয় দ্রব্য ব্যবহার আছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। মিষ্টান্নের মধ্যে মোদক, সন্দেশ ও পিষ্টক ছিল। এতদ্ব্যতিত সমস্তই মুসলমানগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত। জলপানীয়ের পদ্ধতি এ প্রকার ছিল না, কেননা তাঁহারা দ্বিভোজন করিতেন না। ব্যঞ্জনের মধ্যে কপি, আলু, সাল্‌গাম্‌ গাজর ছিল না। অন্যান্য ফলের মধ্যে পেঁপে, বাতাপি লেবু ও বিলাতী ফল মাত্র ছিল না।

বাটী ঘরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তখন তুষার ধবলকায় কপাট যুক্ত বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজী কোথাও নয়ন-গোচর হইত না। গ্রাম, নগর, বিপনী, নদী ও সরোবর আছে, পুষ্পোদ্যানে অমরাবতী তুল্য কবি কল্পনা-সমা অট্টালিকা কেহ কখন দেখেন নাই। সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তি, গৌড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটী নগর ছিল, তথায় প্রশস্ত স্থূল স্থূল ইষ্টক ও প্রস্তরময় প্রাসাদ ছিল, কিন্তু তাহাতে অন্য প্রকার কারুকার্য্য ও হস্ত চাতুর্য্য ছিল। কাঁচের দ্বার কি চূণের আবরণ, কি বিনিময় ঝিলমিলি ছিল না। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান উপকরণ বাষ্পীয় যন্ত্র, ইংরেজ রাজের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসিয়াছে। ঘটিকা, আগে দণ্ড পল হিসাবে কোন প্রস্তুত পাত্রে জলের দ্বারা ঠিক্‌ করা হইত। মাদক দ্রব্য তুরিতানন্দ ও সিদ্ধি ছিল—মুসমমানেরা, চরস ও তামাকু প্রচলিত করেন। সোমরস ও এক প্রকার ফুলের দ্বারা প্রস্তুত সুরার ব্যবহারও ছিল।

গীত বাদ্য বহুদিন হইতে এ দেশে প্রচলিত ছিল—দুর্গোৎসব পদ্ধতি মধ্যে, রাগাদির সহিত মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে গীত সমূহে, রাগের উল্লেখ আছে।

ক্রমশঃ।

চিকিৎসক ও সমালোচক

মাসিক পত্র

১ম খণ্ড। } চৈত্র, ১৩০১ সাল। { ৩য় সংখ্যা

বসন্ত ব্যাধি।

গত কয়েকমাস মধ্যে, কলিকাতা নগরে বসন্ত রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এই রোগের বিষয়ে গুটিকত কথা, এই সময়ে উল্লেখ করা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। ইহার প্রভাবে সহস্রাধিক নর নারী ইতি মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে—এবং বহু সহস্র লোক কথঞ্চিৎ উদ্ধার লাভ করিয়া, চিহ্নিত চর্ম্মে অপর মনুষ্যের ভীতি উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। বাস্তবিক, বসন্ত রোগের ন্যায় ভীষনতম পীড়া, মনুষ্য জাতি মধ্যে আর কিছুই নাই। ইহা কি দরিদ্র, কি ধনী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলকেই সমভাবে আক্রমণ করে এবং চিকিৎসক গণের নিকটে কিছুমাত্র পরাজয় স্বীকার করে না। টীকা দেওয়া প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এই রোগ আরও প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। যখন জেনার সাহেব টীকা প্রণালী সভ্যজগতে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তখন পৃথিবীর সমস্ত মৃত্যুসংখ্যার দশম ভাগ, বসন্ত

রোগদ্বারা সম্পাদিত হইত। অষ্টাবিংশতি শতাব্দীতে ইউরোপখণ্ডে ৫ কোটী মানব ইহার দুরন্ত হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আইসলণ্ড দ্বীপের জনসংখ্যা ৫০ সহস্র মাত্র ছিল, কিন্তু সেই বৎসরের মধ্যে ১৮ সহস্র নর নারী ইহার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সন ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে—গ্রীনলণ্ড দ্বীপে প্রায় শতকরা ৭০ জন অধিবাসী ইহার অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু অধুনা টীকাপ্রণালী দ্বারা এই রূপ মৃত্যুসংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। তাহা না হইলে আজ এই কলিকাতার মধ্যস্থলে কিরূপ শোকাবহ দৃশ্য দেখিতে হইত, তাহা জগৎপাতার আশীর্ব্বাদে আর অনুভব করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বসন্ত মহামারী কিরূপে কলিকাতা নগরে আনীত হইল, সেই সম্বন্ধে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তার সিম্‌সন্ সাহেব অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী সত্য বাহির করিয়াছেন। ইহার প্রাদুর্ভাব ১৮৯৪ সালের আরম্ভেই প্রথম প্রকাশিত হয়। কালীঘাটের কালীমন্দিরে একটী ছাগবিক্রেতা কলিকাতার বাহির হইতে এই রোগ প্রথমে কলিকাতায় আনয়ন করে। কিন্তু তাহার জীবদ্দশাতে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। তাহার শবদেহ দগ্ধ করিবার সময় শ্মশানস্থ রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতেই ইহার সংবাদ প্রথমে পাওয়া যায়। ইত্যবসরে তাহার বাসগৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে আরও গুটিকত লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। সেই সময়ের মধ্যেই আলিপুর হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ ডাক্তার ক্রম্বি, সহরের স্বাস্থ্যরক্ষকের নিকট বিজ্ঞাপন করেন যে, হেয়ার ষ্ট্রীটে একটি ফিরিঙ্গি পরিবার মধ্যে ৭ ব্যক্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা ইতিপূর্ব্বে ভাগলপুরে বাস করিত, কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন এইরোগে প্রাণত্যাগ করায়, ইহারা কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াছে। এইস্থানে পৌঁছিবা মাত্রই ঐ সাত জনকে রোগ স্পর্শ করিয়াছিল। যাহা হউক, শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের সকলকে সরকারী হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়াতে উক্তস্থানে আর কাহাকেও আক্রমণ করে নাই। উহার পরে কয়েকদিবস মধ্যে, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে একটি ও

নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেনে একটি লোক, উক্ত রোগাক্রান্ত হয়, কিন্তু সত্বরে উহাদিগকেও হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং ঐ ঐ স্থানে আর কিছুই হয় নাই। তৎপরে কলুটোলা ষ্ট্রীটে দুইটি লোককে বসন্ত আক্রমণ করে। প্রথমটির মৃত্যুর পূর্ব্বে কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যখন দ্বিতীয়টির সংবাদ পাওয়া যায়, তখন রোগীর অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সেব্যক্তি একটি বৃহৎ মস্‌জিদে থাকিত কিন্তু ঐ মস্‌জিদের মৌলবী উহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে দেয় নাই। গুপ্তভাবে নিকটস্থ একটী বাটীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিল। তদনন্তর রোগটী ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া যোড়াবাগানের মাড়োয়ারীদিগকে আক্রমণ করিল তাহার কারণ এই যে, মাড়োয়ারীজাতি সাধারণতঃ টীকা প্রথার বিশেষ বিরোধী এবং তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া কালীঘাটে যাওয়া আসা করিয়াছিল। গত জুন মাসে মারীভয় কিঞ্চিৎ কম পড়িয়াছিল, কিন্তু গত কয়েকমাসে বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষক সিমসন্ সাহেব আরও বলেন যে, কলিকাতা সহরে প্রতি চার কি পাঁচ বৎসর অন্তর বসন্তমহামারী হইয়া থাকে। প্রতিবারে দুই বৎসর কাল ইহার প্রতাপ থাকে, তবে কোনবার শান্তভাবে আর কোনবার অতিভীষণ ভাবে আসিয়া থাকে।

যদি কাহারও বাসগৃহে কোনলোকের বসন্তরোগ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার কি করা উচিত বা অনুচিত সে বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। যদি রোগীকে সরকারী হাঁসপাতালে পাঠাইতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে প্রেরণ করা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নতুবা সর্ব্বপ্রথমে রোগীকে স্বতন্ত্র করিতে হইবে। বাটীর দুই একজন ভিন্ন অপর কাহাকেও রোগীর সহিত সংশ্রবে আসিতে দেওয়া উচিত নয়। কেন না রোগীর শরীর হইতে এবং তাহার বিষ্ঠা, মূত্র, ঘর্ম্ম বা কফ হইতে সতত বসন্তরোগের বিষ উত্থিত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। সেই বিষ বড় সংক্রামক এবং উহার প্রবলতা অনেককাল পর্য্যন্ত থাকে। এমন কি

বসন্তরোগীর মৃতদেহ হইতে এবং বসন্ত জন্মাক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে, রোগীর শরীর হইতে সেই বিষ বহির্গত হইয়া অপরকে আক্রমণ করিতে শুনা গিয়াছে। যে গৃহে রোগী থাকিবে, তাহাতে সুন্দররূপে বায়ু সঞ্চালন আবশ্যক; যেহেতু বসন্তবিষ, বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত হইলে পর আর তাহার অনিষ্টশক্তি থাকে না। বাস্তবিক আবদ্ধ বায়ুতে বসন্তবিষ বড় ভয়ানক হইয়া উঠে। কিন্তু তাহা বলিয়া রোগীর ঠিক গায়ের উপরে শীতল বায়ুপ্রবাহ লাগা ভাল নয়। সেই গৃহে যত কম সম্ভব তত অল্প পরিমাণে জিনিষপত্র থাকিলেই ভাল হয়, যেহেতু সেই সমস্ত দ্রব্যে বসন্তবিষ সংলগ্ন হইয়া, পরে পুনর্ব্বার আর কাহারও শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এমত জানা গিয়াছে যে, বসন্তরোগীর গৃহে স্থাপিত একখানি পুরাতন চিঠি, কয়েক বৎসর পরে পুনরায় সেই গৃহে নূতন লোককে রোগাক্রান্ত করিয়াছে। পরিচ্ছদাদির মধ্যে পশমী কাপড়ে বিষ অধিককাল সংলগ্ন থাকে; অতএব যে দুই এক ব্যক্তি রোগীর সেবার জন্য সেই গৃহে থাকিবে তাহারা কোনরূপ পশমী কাপড় না পরিয়া, সময় মত উত্তমরূপে ধৌত করা যাইতে পারে এমন বস্ত্র ব্যবহার করিবেন। সাদা তুলার কাপড়ই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রোগীর গৃহে সর্ব্বদা সালফিউরাস এসিড, ক্লোরিন, অগ্নির উত্তাপ প্রভৃতি ডিস্‌ইন্‌ফেকটাণ্ট অর্থাৎ সংক্রমাপহ দ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রোগীর মলমূত্র কার্ব্বলিক লোসন সংযুক্ত কোন পাত্রে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং গৃহ হইতে ঐ পাত্র লইয়া যাইবার সময় উহার উপরে পুনরায় কার্ব্বলিক লোশন দিলে ভাল হয়। রোগীর খাদ্যদ্রব্য অপর কাহারও খাওয়া উচিত নয়, এবং ভোজনের পর পাত্র গুলি কণ্ডিস্‌ লোশনে ডুবাইয়া অপর স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত। রোগী সুস্থ হইলে বা দুর্ভাগ্যক্রমে কালপ্রাপ্ত হইলে আরও কয়েকটী নিয়ম পালন করিতে হইবে। রোগীর ব্যবহৃত বিছানা এবং বস্ত্রাদি সমস্ত পুড়াইয়া ফেলা উচিত। ঘরের ভিতরের অপরাপর অল্পসংখ্যক জিনিষপত্র যথেষ্ট অগ্ন্যুত্তাপ বা কোন ডিস্‌ইন্‌ফেকটাণ্ট্ দ্বারা বিশুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; এবং গৃহের মধ্যে একবার চুণের, কলি ফেরান কিম্বা

একটী বড় আগুন জ্বালান উচিত। প্রভূত উত্তাপে সংক্রামক রোগের বিষ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরের বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মহামারী, একেবারে নির্ম্মূল করিয়াছিল। রোগী বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে, আরও কিছুকাল অপরের সহিত মেশামিশি করিতে দেওয়া উচিত নহে। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইলে কোনও চিকিৎসকের অনুমতি পত্র ভিন্ন পুনরায় বিদ্যালয়ে যাতায়াত করা অনুচিত।

বসন্ত রোগের বিস্তার নিবারণ করিতে বহুকালাবধি অনেক প্রকার বিধি প্রচলিত আছে। কিন্তু টীকা গ্রহণ করাই এক্ষণে ইহার সর্ব্ব-প্রধান নিবারক ঔষধ।

বাসগৃহের সন্নিকটে কোন ব্যক্তির বসন্ত রোগ হওয়ামাত্র, আবাল বৃদ্ধবণিতা সকলেরই পুনরায় টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। বসন্ত রোগীর নিকটে যে দুই একজন থাকিয়া তাহার সেবা করিবে, তাহাদের পুনরায় টীকা দেওয়া না থাকিলে, অনতিবিলম্বে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এডোয়ার্ড জেনার সাহেব নূতন টীকা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া জগতের যে কতদূর উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা বর্ণনা-তীত। যদি এই প্রণালী ইতিমধ্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সতর্কতার সহিত সর্ব্বশরীরে ব্যবহৃত হইয়া থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় আজ আর বসন্তরোগের নাম এত শোনা যাইত না। যে যে দেশে টীকা দেওয়া প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই খানেই বসন্তরোগজনিত মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম হইয়া গিয়াছে। এমন কি, এই মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে অধিকাংশ লোকের আদৌ টীকা দেওয়া হয় নাই, এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ড দেশে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে একটী তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অপ্রাপ্তটীকা লোকের মধ্যে বসন্তজনিত মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৫৬ জন এবং সুচিহ্ন-বিশিষ্ট টীকাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে ঐ মৃত্যুসংখ্যা তিন জন মাত্র। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শরীরে উত্তম টীকার চিহ্ন থাকিলে বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইলেও মৃত্যুর সম্ভাবনা কত অল্প। কেননা, টীকাতেই

শরীরে যে, বসন্তরোগ কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, তাহা সচরাচর শান্তজাতিরই হইয়া থাকে, এবং উহা যে চিহ্ন সকল রাখিয়া যায়, তাহাও দুই চারি বৎসর পরে আর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অপ্রাপ্ত টীকার শরীরে বসন্তরোগ হইলে তাহা বড় মন্দজাতীয় ও বিপদজনক হইয়া থাকে ; এবং রোগী দৈবযোগে বাঁচিয়া গেলেও তাহার গভীর কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সকল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বীভৎসরূপে বর্ত্তমান থাকে।

অধুনাতন টীকাপ্রণালীর পূর্ব্বে আর একপ্রকার টীকাপ্রণালী অনেক দেশে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তাহাতে এত শুভজনক ফল উৎপন্ন হইত না। সেই টীকা প্রকৃত বসন্তরোগের বীজ দ্বারা সম্পন্ন হইত, কিন্তু আধুনিক প্রণালী গোবসন্তের বীজদ্বারা হইয়া থাকে। যদিও সেই প্রকার টীকা দেওয়া হইলে পর, আধুনিকের ন্যায়, মনুষ্যের আর বসন্তরোগ হইবার সম্ভাবনা প্রায় থাকিত না, তথাপি অনেক সময়ে টীকা দিবার সময়েই ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া, টীকা প্রাপ্ত মনুষ্য কালগ্রাসে পতিত হইত। কিন্তু অধুনাতন টীকা দিবার সময়ে সেরূপ কোন ভয় নাই। যদিও কদাচিৎ দুই এক স্থলে ঠিক টীকা দেওয়ার পর এখনও বসন্তরোগ জন্মাইতে দেখা যায়, তথাপি সেই গুলি কখনই টীকা হইতে উৎপন্ন নয়। সেই বসন্তবিষ নিশ্চয়ই টীকা দিবার পূর্ব্বে অন্য কোন কারণ হইতে আসিয়াছে, এইরূপ অনেক স্থলে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বতন টীকা দেওয়ার আরও একটী দোষ ছিল। সেই টীকার পর যে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইত, তাহাতে সকলস্থলে সংক্রামকত্ব দোষ সম্পূর্ণ বিদ্যমান থাকিত, এবং তাহা হইতে চতুর্দ্দিকে অনেক অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত। কিন্তু আধুনিক টীকাপ্রণালীতে সেই দোষ কিছু-মাত্র বিদ্যমান নাই ; ইহাই এই টীকার সর্ব্বোত্তম সুবিধা বলিতে হইবে। যাহা হউক, সেই পুরাতন দোষমিশ্রিত টীকাপ্রণালী উঠিয়া গিয়া, এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক নূতন টীকা প্রচলিত হইতেছে, ইহা আমাদিগের পরম আহ্লাদের বিষয়।

কিন্তু এখনও পৃথিবীতে অনেক লোকে টীকা দেওয়ার বিরোধী

আছেন। তাঁহারা বলেন যে, যখন টিকা দিলেও মানব শরীরে সময়ে-সময়ে বসন্তরোগের আবির্ভাব হয় তখন আর টীকা দিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সেরূপ রোগীর সংখ্যা অতিশয় অল্প, এবং তাহার মধ্যে সুচিহ্নিত টীকাবিশিষ্ট রোগীর সংখ্যা আরও অল্প। অধিকন্তু ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, সেরূপ রোগীর দেহে, যে প্রকার বসন্তের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা অতিশয় শান্তজাতীয় ও তাহা হইতে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। ইহা কি টীকা প্রণালীর একটি বিশেষ কল্যাণজনক গুণ নহে? টীকা বিরোধীগণের ভয়ের কারণ কতকটা সেই পুরাতন বসন্তটীকা প্রণালী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বতন বসন্ত টীকা সম্পূর্ণরূপে সংক্রামক ছিল বলিয়া তাঁহারা এই অভিনব গোবীজ টীকাকেও সংক্রামক বলিয়া সাধারণের ভীতি উৎপাদন করেন। কিন্তু পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সে কথা সত্য নহে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা এই বলিয়া আর একটি বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যে সন্তানের টীকা হইতে বীজ লইয়া নূতন সন্তানকে টীকা দেওয়া যায়, তাহার শরীরে কোনপ্রকার পৈতৃক বা নবজনিত রোগ বিদ্যমান থাকিলে; সেই রোগ বীজের সহিত, নূতন টীকা প্রাপ্ত সন্তানের শরীরে প্রবেশ করে। ইহা বাস্তবিক যথার্থ কথা। কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া শুনিয়া নীরোগ সন্তানের বীজ দ্বারা টীকা দিলে ভয়ের কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেরূপ অশুভ ঘটনা নিশ্চয়ই টীকাদাতার মূর্খতার পরিচায়ক, এবং কোন ক্রমেই টীকাপ্রণালীর দোষ প্রদর্শক নহে। যে অস্ত্র দ্বারা অসংখ্য মানব মৃত্যুগ্রাস হইতে উদ্ধার পাইয়াছে তাহা কোন অনভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ব্যবহৃত হইলে, বিশেষ অমঙ্গলের হেতু হইয়া উঠে। তাহাতে অস্ত্রের প্রতি দোষারোপ করা নিতান্ত অযুক্তিসম্ভূত। কেহ কেহ টীকা দেওয়াকে ইচ্ছাধীন করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের সন্ততিবর্গ অপ্রাপ্তটীকা থাকিলে; তাহাতে পরে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সকলকে আইন অনুসারে টীকা

লইতে বাধ্য করা উচিত। টীকা বিরোধীগণের আরও একটু বুঝিয়া দেখা উচিত যে, এই টীকাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া বসন্তরোগজনিত মৃত্যুসংখ্যা পৃথিবীতে কত অল্প হইয়া গিয়াছে।

কাহাকেও নূতন টীকা দিতে গেলে কি কি বিষয় পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত, তাহা এইবার দেখা যাউক। টীকা দেওয়া সাধারণতঃ তিন প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথম, কিয়ৎপূর্ব্বে টীকাপ্রাপ্ত কোন সন্তানের পক্ক টীকা হইতে; দ্বিতীয়, গোবৎসের বসন্তবীজ লইয়া; এবং তৃতীয়, রক্ষিত বীজ লইয়া। তিন প্রকারেরই কয়েকটী গুণাগুণ আছে, কিন্তু এই তিন প্রকারই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকল সময়েই টীকা দেওয়া ছুরী খানি সর্ব্বতোভাবে পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। টীকাগ্রহীতা সন্তানটির স্বাস্থ্য তৎকালে ভাল থাকিবে, ও তাহার গাত্রে কোনরূপ চর্ম্মরোগ থাকিবে না। তাহার বাহুর উপরে টীকা ফুটাইবার সময় তাহার কৃষ্ণবর্ণ শিরাগুলি দেখিয়া লওয়া উচিত। কেননা কোন কোন স্থলে বিপদজনক রক্তপাত হইতে শুনা গিয়াছে। প্রথম প্রকারের টিকা লইতে গেলে দেখিতে হইবে যে, টীকা দাতা সন্তানটি সুস্থ ও সবল, এবং তাহার শরীরের কোন স্থলে উপদংশ, স্ক্রফুলা ইত্যাদি নষ্টরোগের কোন চিহ্ন নাই; তাহার পিতামাতারাও তদ্রূপ সুস্থ; এবং তাহার টীকা হইতে বীজ লইবার সময় রক্তপাত না হইলেই ভাল। দ্বিতীয় প্রকারের টীকা লইতে গেলে যে, গোবৎসটীর ৫ কি ৬ দিন হইল বসন্তোৎপত্তি হইয়াছে, সেইটিই মনোনীত করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন, যে এই-রূপ টীকায় আরও নিশ্চিত ও দীর্ঘব্যাপী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, ইহা দ্বারা যে, অপরের নিকট হইতে টীকার সহিত অন্য রোগ সুস্থ শরীরে আগমন করে না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় প্রকারের টীকা লইতে গেলে দেখা উচিত যে, টীকাবীজটী সুদক্ষ ও বহুদর্শী টীকাদাতা দ্বারা শুষ্কভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে কিনা। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, বিশেষ কারণ ভিন্ন, সন্তানের তিন মাস বয়সের মধ্যে টীকা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে ১ বৎসরের মধ্যে

টীকা দেওয়া আইন সঙ্গত। তৎপরে ১০। ১২ বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার টীকা দেওয়া উচিত; কারণ টীকাবীজের সজীবতা তৎকালের অধিক বিদ্যমান থাকে না। তৎকাল পরে টীকা দিলেও যদি টীকাস্থান বেশ পাকিয়া না উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বটীকাবীজ এখনও শরীরমধ্যে সজীব আছে। কিন্তু যাহাই হউক, যখন কোন স্থানে প্রবল বসন্ত রোগের মহামারী হইয়া পড়ে, তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই পুনর্ব্বার টীকাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কাহার কোনও দ্বিধা করা উচিত নহে; করিলে তিনি হয়ত, নিজের পরিবারবর্গের, প্রতিবেশী গণের, কিম্বা সমস্ত নগরবাসীর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিবেন। এবং সর্ব্বোপরি অনুরোধ—বিশুদ্ধ জীবন যাপন কর। বিজ্ঞান যাহাকে অবিশুদ্ধ কহে সেই দ্রব্য সকল কখনই শরীর যন্ত্রে নিয়োগ করিও না। বিশুদ্ধ গৃহে বাসকর, বিশুদ্ধ ভাবে খাদ্য ভক্ষণ কর, বিশুদ্ধ জল পান কর, বিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরিধান কর, এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কর। দেখিবে ঘোর মহামারী মধ্যেও তুমি নীরোগ ও সবল। দেখিবে, বসন্ত কি বিসূচিকা বা অন্য ব্যাধি তোমার বিশুদ্ধ শরীরে কখনই প্রবেশ করিতে সাহস পাইবে না, এবং তুমি সুস্থদেহে ও সবল অন্তঃকরণে দেবতার ন্যায়, ব্যাধিগ্রস্ত জগতের অনেক উপকার করিতে পারিবে।

ডাক্তার শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ শেঠ।

ডাক্তার নরের আবিষ্কৃত এণ্টিপাইরিন্।

সুবিখ্যাত ডাক্তার নর্ (Dr. knorr) পাইরজোলের উপর (Pyrazol) যে বহু যত্ন পূর্ব্বক, নূতন উদ্ভাবন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা অবশেষে "এণ্টিপাইরিন্" আবিষ্কারে পরিনত হইয়াছিল। উক্ত পাইরজোলের এক সর্ব্বজ্বর নাশক শক্তি থাকাতে

উহা এণ্টিপাইরিন্ (Antipyrin) নামকরণ হইয়াছে। উক্ত মিশ্র পূর্ব্বে কেবলমাত্র ঐ নিমিত্তই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এক্ষণে উহা কতদূর পর্য্যন্ত ফলদায়ক ও ইহার গুণাগুণ নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ভৌতিক গুণসমূহ।

(PHYSICAL PROPERTIES.)

এণ্টিপাইরিন্ প্রায় মিছারির গুঁড়ার ন্যায়, কিন্তু কদর্য্য তিক্ত আস্বাদযুক্ত। কোনরূপ গন্ধ বা বর্ণবিহীন। ইহার আসল মিশ্র প্রায় ১১৩° (সি ডিগ্রিতে) তাপাংশে গলিতে থাকে। ইহা শীঘ্রই জলেতে মিশিয়া যায় এবং রেক্টিফায়েড্ স্পিরিটে (Rectified Spirit) ও ক্লোরোফরমে (Chloroform) দিলেই সংমিলিত হয়, কিন্তু একত্রে উভয়ের সহিত মিশাইলে শীঘ্র মিশ্রিত হয় না। এণ্টিপাইরিনের জলীয় দ্রবে, লাইকর ফেরি পাইক্লোরাইড্ মিশ্রিত করিলে উক্ত দ্রব ঘোর লাল বর্ণ ও নাইট্রস্ এসিড সংযোগে পীতাভ নীলবর্ণ ধারণ করে। এণ্টিপাইরিন্‌কে ডাইমিথিল্ অক্সিচিনিসিন্‌ও বলে।

রাসায়নিক প্রকৃতি।

(CHEMICAL NATURE & CHARACTERS.)

এণ্টিপাইরিন্ যে পাইরজোল হইতে আবিষ্কৃত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত দুই ঔষধ ও উহাদের মধ্যবর্ত্তী পাইরজোলের যে রাসায়নিকসম্বন্ধ আছে তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

ডাক্তার নরের প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে কেবল ফেনিল্ হাইড্রেজিন্ এবং এসিটোয়েসিটিক্ ইথার এই উভয়ের পরস্পর রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা প্রস্তুত। উক্ত মিশ্র উত্তাপ সংযোগে ইথিল্ এল্‌কোহল্ (Ethyl Alcohol) ও ফেনিল্ মিথিল্ পাইরজোলন

(Phenylmethyl pyrazolon) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এবং দ্বিতীয় বস্তুটীতে অন্য একটি মিথিল্ জাতীয় পদার্থ সংযোগ করিলে এণ্টিপাইরিন্ প্রস্তুত হয়।

এণ্টিপাইরিন্ বাস্তবিক বেস্ (base) বলিয়া পরিগণিত এবং উহা অন্যান্য রাসায়নিক মিশ্রের সহিত উক্তভাব আচরণ করিয়া থাকে। ইহা এমোনিয়া (Ammonia) ও এলকেলইডের (Alkaloids) মত এসিডের সহিত মিশ্রিত হইলে সল্ট্ অর্থাৎ লবণ প্রস্তুত হয় এবং এল্কলইডের সহিত ইহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, এণ্টিপাইরিন্ জলেতে মিশ্রিত হইলে কিরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া সমূহ লক্ষিত হয়।—

(ক) প্রথমতঃ নাইট্রস্ এসিডের সহিত মিশ্রিত হইলে যে, সলিউসন্ বা দ্রব প্রস্তুত হয়, তাহা ঈষৎনীলের আভাযুক্ত সবুজ। উক্ত পরীক্ষায় (Test) ১০০০০অংশে এক অংশ মাত্র এণ্টিপাইরিন্ লক্ষিত হয়।

(খ) ফেরিক্ ক্লোরাইডের (Ferric chloride) দ্বারা উক্ত দ্রব গাঢ় লোহিত বর্ণ হয় এবং উহাতে দুই এক বিন্দু সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক দিলে ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে এক অংশ এণ্টিপাইরিন্ ১০০,০০০ অংশ দ্রব মধ্যে লক্ষিত হয়।

(গ) নাইট্রিক এসিড্ উক্ত দ্রবে দিলে পীতবর্ণ হয় এবং উহা উত্তাপ সংযোগে লোহিত বর্ণ ধারণ করে।

পরীক্ষা।

(TESTS.)

বিশুদ্ধ এণ্টিপাইরিন্ বর্ণহীন এবং জলের সহিত মিশ্রিত হইলে কোন রূপ বর্ণ লক্ষিত হয় না অথবা পরীক্ষা পত্রেও (Test'paper) কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এণ্টিপাইরিন ১১০° (সি) ডিগ্রির ন্যূন উত্তাপে দ্রবিভূত হয় না। ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়াতে (British Pharmacopœa) এইরূপ প্রণালী প্রচলিত। কিন্তু যখন উত্তাপ,

কিঞ্চিৎ অধিক পরিমানে প্রয়োগ করা হয় তখন উহা একেবারে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পরন্তু আসল পদার্থটী, সকল সময়েই সাম্যভাব ধারণ করে। অতএব ইহা যে কোন স্থানে রাখিলে, বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। কাঁচ পাত্রে রাখিলে কখনও নষ্ট হয় না।

দৈহিক কার্য্য।

PHYSIOLOGICAL ACTIONS.

এণ্টিপাইরিনের দৈহিক কার্য্য তদানীন্তন অধ্যাপক ডিম্ (R. Demme) সহেব দ্বারা অনুমোদিত। ইহার প্রয়োগে নাড়ীর উষ্ণতার হ্রাস হয় এবং রক্ত প্রবাহক নাড়ীর কঠিনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অধ্যাপক ফিল্‌নি (W. Filehne) এ বিষয়ে অনেক তত্বানুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন ফল প্রকাশ করেন নাই।

এণ্টিপাইরিনের দৈহিক কার্য্য এবং গুণাগুণ প্রথমে কপোলা সাহেব (F. Coppola) কর্ত্তৃক জন সাধারণের সম্মুখে প্রথম রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় রিপোর্টে লেখেন যে, একের তিন হইতে দুয়ের তিন গ্রেণ এণ্টিপাইরিন্ ভেকের প্রতি প্রয়োগ করিলে, পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ স্পাইনেল্ কর্ডের (Spinal Cord) বক্রভাব লক্ষিত হয় এবং উক্ত ঔষধের দ্বিতীয়মাত্রা প্রয়োগ করিবার পর, মস্তিষ্কের কার্য্য সকল ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং অবশেষে ধনুষ্টঙ্কারে পরিণত হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সেবন করাইলে এমন কি উহার পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত আনয়ন করে। কিন্তু এরূপ কার্য্য সত্বেও হৃদয়ের কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় না। কেবল মেডালা অব্‌লঙ্‌গেটা (Medulla oblougatta) ও স্পাইনেল কর্ডের অর্থাৎ কশেরুকা মজ্জার (Spinal cord) কিঞ্চিৎ বৈচিত্রতা লক্ষিত হয়।

ডিম্ সাহেব যাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। এমন কি তিনি বলেন যে, ইহা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলে উষ্ণ বা অনুষ্ণ দেহে বিষবৎ কার্য্য

সম্পাদন করে। সঞ্চালিত রক্তের উপর এণ্টিপাইরিণের যে, এক অসাধারণ ক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহা ডাক্তার বেটেলহিম্ (K. Bettleheim) কর্ত্তৃক বিশেষ যত্নসহকারে কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল। শিরাতে পিচকারী করিলে (Injection) প্রথমে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া মন্দিভূত হয় এবং পরে যদিও শরীরের উর্দ্ধদিক উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু অবশেষে প্রথম অবস্থাই বিরাজমান থাকে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কার্য্য দ্বারা যে, রক্ত প্রবাহের আধিক্য বা অনাধিক্য লক্ষিত হয়, তাহা সুবিখ্যাত পেলিকেনি (Pellicani) সাহেব কর্ত্তৃক প্রথমে অনুমোদিত হয়। যখন অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, তখন নাড়ীর পরিবর্ত্তন প্রায় সমভাবে থাকে। (ক্রমশঃ)

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

ষোড়শ বর্ষীয় একটী বালক কোন কারণ বশতঃ হটাৎ বাক্‌শক্তি রহিত হয়। এই ঘটনার প্রায় ১৫ মিনিট পরে আমি ঐ রোগীকে দেখিবার জন্য তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। রোগীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জানিলাম যে, প্রায় ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ বালক মাটী হইতে কুড়াইয়া লইয়া কতকগুলি জাম ভক্ষন করিয়াছিল। রোগীর নিকট গিয়া দেখিলাম যে, তাহার সমস্ত শরীর হইতে অনবরতঃ ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে ও প্রায় প্রত্যেক মিনিটে সর্ব্ব শরীরে আক্ষেপ হইতেছে এবং মস্তক পশ্চাৎ দিকে বেঁকিয়া গিয়াছে অপরন্তু নিশ্বাস দ্রুত ও অগভীর। নড়ী মৃদু ও দুর্ব্বল। এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই নিশ্বাস বন্ধ ও শ্বাসকষ্টের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বালকের আকার প্রকৃতি দেখিয়া বোধহইল যেন সে বক্ষগহ্বরের নিকট বিশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে। বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়া, শ্বাসনালী প্রদাহের (ব্রঙ্কাইটিস্) চিহ্ন পাওয়া গেল। আমি তাহাকে বমন করাইবার নিমিত্ত নিচের ঔষধটি দিয়া ছিলাম।

প্রঃ,	সলফেট্ অব্ জিঙ্ক্	...	১ ড্রাম
	জল	... ...	১ আং। এক মাত্রা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহার বাক্‌শক্তির সহিত গিলন শক্তিও রহিত হইয়া গিয়াছিল। তখন আমি হৃৎপিণ্ডের উপর ৪ × ৪ ইঞ্চি ও প্রত্যেক ভেগস্ স্নায়ুর (vagus nerve) উপর ৩ × ১ ইঞ্চি করিয়া এই তিন খানি মাষ্টার্ড প্লাষ্টার্ লাগাইয়াছিলাম এবং ইহার ৫ মিনিট পরে, বালক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল অধিকন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ এবং গিলিবার শক্তিও পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন আমি উপরোক্ত ঔষধটি পুনরায় আর একবার খাইতে দিয়াছিলাম এবং কতিপয় মিনিট পরে রোগী অনেকটা বমি করিল ও উহার সহিত পাকাশয়ের আহারীয় দ্রব্যের কিয়দংশ ও শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া গেল। তখন আমি রোগীকে পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া আসিলাম। এবং শ্বাসনালী প্রদাহের (Bronchitis) জন্য নিচের লিখিত ঔষধটি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম।

গ্রঃ, কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়া	...	...	৫ গ্রেণ।
স্পিরিট্ ইথর্ নাইট্রিক	...	...	১০ মিং।
ঐ ক্লোরোফর্ম্	...	...	১৫ মিং।
সিরাপ্ টোলুটেনাস	...	...	১ ড্রাম।
ভাইনম্ ইপিকাক্	...	...	১০ মিং।
কর্পূরের জল	...	...	সমষ্টি ১ আঃ।

এইরূপ ১ মাত্রা। দিবসে ৪ বার করিয়া ঐ ঔষধ সেবন করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম এবং উক্ত ঔষধ কএক দিবস সেবন করায় বালকটি আরোগ্য লাভ করে।

ডাক্তার শ্রীচারুচন্দ্র রায়।

কেলি কার্বনিকাম্।

শ্বাস যন্ত্র পাকাশয়, আর জরায়ুতে।
প্রধান ইহার ক্রিয়া পাইবে দেখিতে।
সর্দ্দি কাশী যাহাদের লেগে থাকে সদা,
এক যায় এক আসে নাহয় অন্যথা;

বাতাস হাঁচেতে সর্দ্দি ক্রমে বেড়ে যায়,
নিয়তই শীত শীত অনুভূত হয় ;
আগুণ পোহাতে রোগী বড় আহ্লাদিত,
অথবা সতত রোগী থাকে বস্ত্রাবৃত ;
সর্দ্দি প্রবণতা এর প্রধান লক্ষণ,
হৃদ্ দুর্ব্বলতা হয় যাহার কারণ ;
নিমোনিয়া অন্তে যদি হৃদ রোগ থাকে,
পুনঃ পুনঃ সর্দ্দিযদি নহি ছাড়ে তাকে ;
সাধারণ দুর্ব্বলতা বোধ করে যদি,
তথায় কেলি কার্ব্বন হয় মহৌষধি ;
বেদনা ইহার সদা এইরূপ হয়,
সূচী কিম্বা খোঁচা বেঁধা সরিয়া বেড়ায় ;
একস্থান হতে ব্যথা যায় স্থানান্তরে,
বিশেষতঃ বক্ষে আর হৃদ্ অভ্যন্তরে ,
সাঁই সাঁই শব্দ হয় বক্ষের ভিতর,
কাশীলে উঠেনা কাস অতি কষ্ট কর ;
নড়ে যায় সূচী বেঁধা ব্যথার লক্ষণ,
শ্বাস কষ্ট বোধ হয় বক্ষে আকুঞ্চন ;
শীতলেতে বাড়ে ব্যথা উষ্ণ হতে চায়,
উষ্ণগৃহে গেলে ব্যথা উপসম হয় ;
পলসেটীলার রোগী, ঠাণ্ডা ভাল বাসে,
যার নামে কেলী কার্ব ভীত হয় ত্রাসে ;
কেলি কার্বনের প্রিয় উষ্ণ গৃহ হয়,
যেখানে থাকিলে ব্যথা বাড়ে ব্রাওনিয়ার ;
গণ্ডমালা চক্ষুরোগে সদা কষ্ট পায়,
হরিৎ সবুজ শ্লেষ্মা নাকে দেখা যায় ;
সর্দ্দির ভয়েতে রোগী নাহি যায় জলে,
বাতাস লাগিবে বলি নাহি বস্ত্র খোলে ;

থলির সমান ফুলা চক্ষের পাতায়,
নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ ইহা সদা দেখা যায় ;
সামান্য আহারে পেট পরিপূর্ণ বোধ,
বৃথা মল বেগ সহ থাকে কোষ্ঠ রোধ ;
আম্বাতের মত কণ্ডু হয় গাত্র ময়,
রজঃকালে স্ত্রীলোকের যাহা দেখা যায় ;
মূত্রাধার পাকাশয়ের তরুণ রোগেতে,
সম্পূর্ণ না সারে যদি নক্স সেবনেতে ;
কেলি কার্বণের গুণ তথায় দেখিবে,
"সহকারি" হয়ে তথা কায দেখাইবে ;
সমস্ত রোগের বৃদ্ধি হলে নিশা শেষ,
তিনটার পরে রোগী পায় বড় ক্লেশ ;
একাকী থাকিলে রোগী ভয়েতে আকুল,
উৎকণ্ঠা, মৃত্যুভয়, চিন্তায় ব্যাকুল ;
সামান্য বালক যদি থাকে সেই ঘরে,
তা'হলে সাহস হয় রোগীর অন্তরে ;
কি এক ঘটনা যেন ঘটিবে বলিয়া,
ভয়াকুল হয় রোগী ভাবিয়া ভাবিয়া ;
সহজেই ত্রাস হয় রাত্রে ভুল বলে,
চমকিয়া উঠে রোগী গায়ে হাত দিলে ;
মোটা মোটা ধাতু হয় মেদ প্রবণতা,
সহজেই সর্দ্দি লাগে পেশী শিথিলতা ;
নাহি ছাড়ে সর্দ্দি কাশী কষ্ট পায় অতি,
তাহাদের হয় ইহা উত্তম ঔষধি ;

ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র দুই চারি সহস্র বৎসরের নহে।

প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহাত্মাগণের যে-সময় নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কত বৎসর হইল আয়ুর্ব্বেদের প্রচার এবং পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা মীমাংসা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এতদ্বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সময় সময় যাহা বলিয়া থাকেন, তাহার কোনও যুক্তিযুক্ত প্রমাণ উপলব্ধি হয় না। সুতরাং আমরা তাহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের বাক্যই অধিক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করি। জ্যোতিষের মতে ৪৩,২০,০০০,০০০ বৎসরে এক শ্বেত বরাহ কল্পাব্দ। ইহারই মধ্যে চতুর্দ্দশ মনন্তরা বা চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার। এক্ষণে ছয় মন্বন্তরা অতীত হইয়া সপ্তম মন্বন্তরা অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর অধিকার আরম্ভ হইয়াছে। এক এক মন্বন্তরা আবার বহু চতুর্যুগে বিভক্ত। যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণ ৪৩,২০,০০০ বৎসর। তন্মধ্যে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০ ত্রেতার ১২,৯৬,০০০ দ্বাপরের ৮,৬৪,০০০ এবং কলিযুগের ৪৩২,০০০ বৎসর মধ্যে ৪৯৯৫ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সন্ধি ও অয়নাংশ প্রভৃতি আবার পৃথক গণণীয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বহুকাল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সময় সময় যাহা নিরূপণ করেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে সমস্ত গণনা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহাতে সেই শাস্ত্রের কোন কথাই অবিশ্বাস করিতে পারি না। যে সময় সূর্য্যবংশ-তিলক মহারাজা রঘু, অযোধ্যাধিপতি হইয়াছিলেন, সেই সময় মহামতি চরকাচার্য্য, রাজ সভায় গতিবিধি করিতেন। পুরাণাদি কোন কোন গ্রন্থে ইহার প্রমাণ লক্ষিত হয়। ইহাতেই জানা যায় যে, চরকাচার্য্য অবশ্যই ত্রেতা যুগের লোক। আবার রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও যে ত্রেতা যুগের, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কেননা দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র, তাঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেই বিশ্বামিত্র পুত্র সুশ্রুত, ধন্বন্তরী দিবোদাসের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তবেই জানা যাইতেছে যে, চরক, সুশ্রুত এবং দিবোদাস প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ত্রেতা যুগের লোক। কিন্তু ত্রেতা যুগের কত বৎসর অতীত হইলে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও নিশ্চয় প্রমাণ নাই। যাহা হউক মোটা মোটি যুগ সংখ্যা গণনা করিলে, তাঁহাদিগকে নয় লক্ষ বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া জানা যায়।

আবার অগ্নিবেশ, ভেড় এবং হারীত প্রভৃতি অষ্টাধিক শত সংখ্যক আয়ুর্ব্বেদ প্রচারকগণ উপরোক্ত মহাত্মাদিগেরও পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন না মহর্ষি অগ্নিবেশ, লোক হিতার্থে যে, অতি বিস্তৃত একখানি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাই চরক কর্ত্তৃক প্রতি সংস্কৃত হইয়া "চরক-সংহিতা" নামধারণ করিয়াছে। এই সকল মহাত্মা আবার অত্রিনন্দন, পুনর্ব্বসুর নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে তাহাও বর্ণিত আছে। আয়ুর্ব্বেদ গুরু অত্রিনন্দন যে, সত্য যুগের লোক তাহা হিন্দুদিগের প্রত্যেক গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং তিনি যে, ন্যূনাধিক ২৫ লক্ষ বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায়।

যে সময় কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে লোক সংহারক ভীষণ যুদ্ধের অনুষ্ঠান হয়, সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আহত দিগের জীবন রক্ষার্থে আয়ুর্ব্বেদ কুশল, মহামতি বাগ্‌ভটাচার্য্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন ত? * প্রয়োজনীয় ভেষজ দ্রব্যাদির ত কোনও অভাব নাই?" ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, মহর্ষি বাগ্‌ভট যুধিষ্ঠিরের সম সাময়িক লোক। এই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, দ্বাপর যুগের অবসানে সংঘটীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে কল্যাব্দের ৪৯৯৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। হিন্দু পঞ্জিকায় ইহা জানা যাইতে পারে। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটকে আমরা কখনও দুই সহস্র বৎসরের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি

* মূল মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

না। যে সময় হইতে ইউরোপ প্রভৃতি দেশের উন্নতি হইয়াছে, তাহার বহু বৎসর পূর্ব্বে নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লবে, ভারতের ক্রমশঃ অবনতি হইয়াছে। খৃষ্টাব্দ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, পৃথিবীতে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমাণ করিয়া তাহার সময় নিরূপণ করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই অনুমানের উপর আমরা কখনও নির্ভর করিতে পারি না। আমাদিগের মতে বহু লক্ষ বৎসর হইল, জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহার সময় নিরূপণাত্মক অব্দও অনেক অতীত হইয়া বিস্মৃতি সাগরে মগ্ন হইয়াছে। ইউরোপীয় মতে একমাত্র খৃষ্টাব্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহারও পরিমাণ উনবিংশ শত বৎসর মাত্র। এ স্থলে পাঠক দিগের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে ২।৩ সহস্র বৎসরের ইতিবৃত্তাদি যেমন, সহজেই স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে, লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা সেই প্রকার কথনও বলা যায় না।

কবিরাজ শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র মৈত্রেয়।

মধুক্রম।

পরম দয়ালু পরমেশ্বর জীবকুলের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধন করিবার জন্য কত স্থানে কত আশ্চর্য্য তরুলতার সৃষ্টি করিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? জগতে অত্যুচ্চ মহীরুহ হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত যে জগতের প্রভূত হিত সাধনের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, মূর্খ আমরা অল্পবুদ্ধি মানব, তাঁহার অনন্ত কৌশল বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আজ আমরা একটী সামান্য তরুর কথা বলিব, ইহা সাঁওতাল পরগণার শৈল প্রদেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহার নাম "মধুক্রম", চলিত ভাষায় ইহাকে "মৌয়া ফুলের গাছ" বলে। এরূপ অসাধারণ প্রকৃতির ও একাধারে বহু গুণসম্পন্ন বৃক্ষ অতি অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল, বল্কল, পত্র, পুষ্প, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট, এজন্য হিন্দিতে অনেকেইহাকে "গুণিয়া" নামে অভিহিত

করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের অসাধারণ গুণের আমরা ক্রমশঃ উল্লেখ করিতেছি।

মৌয়া গাছের আস্বাদ ও প্রচলন এদেশে বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছে, কিন্তু যে দিন হইতে ব্যবসানিপুণ ইংরাজ ইহার পুষ্প হইতে মদ প্রস্তুত হয় জানিতে পারিয়াছেন, সেই দিন হইতে ইহার নামটা কিছু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা এক্ষণে জমিদার এবং কৃষক দিগের একটী প্রধান আয়োপায়, সাঁওতাল দিগের এই বৃক্ষ একটী অতুল্য সম্পত্তি, ইহা তাহাদের আরাম, আয় ও জীবিকার একটী সর্ব্বশ্রেষ্ট উপকরণ। আবকারী ইনস্পেক্টারেরা এই বৃক্ষ এক্ষণে বিশেষ আগ্রহের সহিত পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এবং ইহা এক্ষণে বিভাগীয় কমিশনরদিগের রিপোর্টের মধ্যেও যথোপযোগী স্থানপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। সাঁওতালেরা বহুদিন হইতে এই তরুর আশ্চর্য্য গুণের বিষয় অবগত আছে এবং ইহাকে তাহারা পবিত্র ও পূজনীয় বলিয়া জ্ঞান করে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই গাছের উপর একবার টাক্স (Tax) বসাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত সাঁওতাল জাতি বিরক্ত ও ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে এবং প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের তাহা একটী অন্যতম কারণ। বর্ষে বর্ষে যখন মৌয়া গাছ জমা দেওয়া হয় এবং পাটার দ্বারা ইহার বিলী হয়, তখন দলে দলে সাঁওতাল আসিয়া ঐকত্রিত হয়।

মৌয়াফুল সজিনা বা সেফালি ফুলের ন্যায় ঝরিয়া পড়ে, প্রাতঃকালে বৃক্ষতল ঐ ফুলে আচ্ছাদিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। ইহার ফুলের গন্ধ অন্যান্য কুসুমের ন্যায় নাই, ইহার স্বাদ ঈষৎ তিক্ত এবং মধুর। পত্রের স্বাদ অম্লাক্ত ও কটু। মৌয়া ফলের উত্তম মদ্য প্রস্তুত হয়, ইহা সুস্বাদু এবং মত্ততাজনক কিন্তু অন্যান্য মদ্যের ন্যায় শরীরের পক্ষে তত হানীকর নহে—ইহা সুস্বাদু, স্নিগ্ধকারক ক্ষুধা এবং মত্ততাজনক, অথচ তীব্র কিম্বা বিস্বাদু নহে। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে এই মদ্যের বিশেষ গুণাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা "বীর্য্যও বলকারক এবং পিত্ত, পনীস, তৃষ্ণা, স্রাব, দাহ, ভ্রান্তি, শোষ নিবারক ও জরম্ন"।

মৌয়া পুষ্প হইতে যে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই একরূপ বলিয়াছি এক্ষণে ইহা হইতে যে, একপ্রকার মধু প্রস্তুত হয় তাহাই আমরা বলিতেছি। এই মধু পদ্মমধুর ন্যায় অত্যন্ত হিতকর, এবং চক্ষুরোগের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা রৌদ্রে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া বোতলের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া দিলে নষ্ট হয় না।

ইহার ফুল, অর্শ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী, পুষ্পকে ঘৃতে ভাজিয়া, প্রবল অর্শ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কিছুকাল খাইতে দিলে, অর্শ রোগ আরোগ্য হয় এই জন্যই বোধ হয় সাঁওতাল দিগের মধ্যে অর্শ রোগের বিশেষ অল্পতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৌয়া গাছের বল্কল, অনন্তমূল বা সালসার কার্য্য করিয়া থাকে, ইহা কেবল রক্ত পরিষ্কারক নহে, জর, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি নিবারণের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়, আবার ইহার পত্রে রং প্রস্তুত হয়।

মৌয়া পুষ্প শয্যার পার্শ্বে বা গৃহে রাখিয়া দিলে, সর্প ভয় দূর হয়, আজি পর্য্যন্ত কেহ মৌয়া গাছের শাখায় বা তলদেশে সর্প দেখিতে পান নাই। সাঁওতালেরা ইহার ফলের মোরব্বা ও চাট্‌নি প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা যেমন মুখরোচক তেমনি উপকারী। নিম্ন শ্রেণীস্থ হিন্দুস্থানীরা ইহার শুষ্ক পুষ্পের রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে, সময়ে সময়ে তাহারা গাভীকে ইহার ফুল, শুষ্ক তৃণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করায়, তাহাতে নাকি গাভী অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া থাকে।

মৌয়া বৃক্ষের মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং শুষ্ক করিয়া ইহাকে অগ্নিতে ভস্ম করিয়া শস্যক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে উত্তম সারের কার্য্য করে। ইহার কাষ্ঠ অত্যন্ত লঘু এতদ্ভিন্ন এই বৃক্ষ সৌন্দর্য্যের আধার এবং ইহার বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ।

এইরূপ কতশত উপকারী বৃক্ষ যে, অরণ্যে অরণ্যে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মনুষ্যের অজ্ঞাতে শুকাইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া এইরূপ কত শত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার গুণ এখনও সর্ব্বসাধারণে অপরিচিত। আমরা এইরূপ

কয়েকটী বৃক্ষ সাঁওতাল পরগণান্তর্গত সাহেবগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভুবনমোহন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, আমরা এই পত্রিকাতে ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করিব। এই সকল তরুলতা এবং উদ্ভিদশাস্ত্রের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই পরমেশ্বরের অসীম দয়া স্মরণ পূর্ব্বক মনুষ্যের হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে।

শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত।

উৎকট ব্যবস্থা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমাদের গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে যদিও নাগরিক কৃত্রিমতা গ্রামবাসীগণের দৈনিক জীবনে একটু আধটু প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তথাপি সেই চিরন্তন সরলতা ও শান্তিপ্রিয়তা সকলকে একতাসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। এখনও একজনের সুখে ও দুঃখে গ্রামস্থিত সকলের হৃদয়ে সহানুভূতির আবির্ভাব হইত। বস্তুতঃ আমরা সকলে যেন একই পরিবারের অন্তর্ভূত ছিলাম এইরূপ বোধ হইত। কেবল একটীমাত্র যুবকের জীবন তন্ত্রী মধ্যে মধ্যে বেতালা ও বেসুরো বাজিয়া উঠিত। কিন্তু কেন যে এরূপ ঘটিত কেহ তাহার উত্তরদানে সমর্থ নহে। জগৎপাতার সৃষ্টির ভিতরে অবিমিশ্র উৎকর্ষ যে কোথাও নয়ন গোচর হয় না, বোধ হয় এই নিয়মের সার্থকতা প্রদর্শনই এরূপ ঘটনার গূঢ়তম উদ্দেশ্য ছিল।

কৃষ্ণকিশোর দুইবার এণ্ট্রাস ফেল হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর জাত ক্রোধ হইয়া উঠিয়া ছিলেন। অবিবেচক পরীক্ষকগণ কেন যে, তাঁহার জ্ঞানসমুদ্রের অতলজলে ডুব দিতে পারে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কেন যে তৎসদৃশ বিজ্ঞজনের জ্ঞাননিরূপনে অসমর্থ হইয়া এরূপ

পরীক্ষক নির্ব্বাচন করেন, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় যে শীঘ্রই কালকবলিত হওয়া উচিত এই অভিলাষ ক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল, অভিলাষটী কার্য্যে পরিণত করিতে একবার তিনি মোটা কাগজ, ভাল লেপাপা, ডাকের টিকিট ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বড়লাটের নিকট আবেদন লিখিতে বসিলেন, কিন্তু যথোপযুক্ত ইংরাজীভাষা নখাগ্রে উদয় না হওয়াতে সেই চেষ্টা বিফল হইল। আর একবার বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে সেই কথা উত্থাপন করিবার জন্য পরামর্শ করিতে একজন দেশহিতৈষীর গৃহে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার স্কুলের হেডমাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে চেষ্টাও সফল হইল না। অবশেষে বাড়ী গিয়া ইহার উপায় করিতে হইবে এই স্থির করিয়া কলিকাতার বাসা ছাড়িয়া নিজগ্রামে উপস্থিত হইলেন।

গৃহে আসিয়া কৃষ্ণকিশোর পিতামাতা, বন্ধু বান্ধব সকলকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার ফেল হওয়া কেবল পরীক্ষক গণের মূর্খতা ও অবিবেচনার নিষ্ঠুর উদাহরণ মাত্র। তথাপি পরছিদ্রান্বেষী গ্রাম্যবৃদ্ধগণ কিছুতেই বুঝিলেন না এবং পুনরায় তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অকৃতকার্য্যতায় অপরের এই মস্তক বেদনা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বিশেষ ক্রোধোদয় হইল। ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণকিশোর বুঝিলেন যে, পাঁড়াগেয়ে লোক গুলা অতি অর্ব্বাচীন এবং ইহাদের নিকট হইতে দূরে, আপনার লীলা ক্ষেত্র বিস্তার করাই তাঁহার ন্যায় জ্ঞানবানের পক্ষে সুযুক্তি সম্ভূত। এই বিবেচনা করিয়া বিশেষ কাহারও সহিত বন্ধুত্ব করিলেন না ও ইংরাজী কাব্য ও উপন্যাস লইয়া, গৃহচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময়ে গ্রামের সরকারী ঠাকুদাদা মহাশয় একদিন সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণকিশোরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কৃষ্ণ দাদা, ভালত? আজ কাল কি করা হইতেছে?" কৃষ্ণদাদা দেখিলেন বড় মুস্কিল বাধিল। মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে নিম্ন স্বরে কহিলেন "কি আর করিব? যে সে কাজ তো আর করা যায় না।"

"হাঁ, তাত বটেই, তোমার মতন বৃহৎ মনুষ্যে যে সে কাজ করিতে পারিবে কেন? তাহার চেয়ে অকেজো থাকা ভাল। তবে কিজান দাদা, আর একবার পরীক্ষাটা দেখিলে ভাল হইত না?"

"মাপ করুন। আমাদের দেশে এরূপ অবিবেচক বিশ্ববিদ্যালয় থাকিতে আমি আর পরীক্ষাদিয়া আপনাকে অপমানিত করিতে পারিব না।"

"অবশ্য অবশ্য, তা ত বটেই। এত অপমান ধর্ম্মে সহিবেনা। নিশ্চয় জানিও বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে শীঘ্রই বজ্রাঘাত হইবে। তা যাহা হউক, দাদা, বিবাহটা এইবেলা করিলে ভাল হয় না? ও পাড়ার জগৎ বাবুর ছোট মেয়েটী, দেখিতে শুনিতে বেশ. মত কর, তো বল তোমার পিতাকে বলিয়া চেষ্টা দেখি!"

"ঐটা আপনাদের বুঝিবার ভুল। আমার ন্যায় বালকের বিবাহের কথা মনে করা পর্য্যন্ত অন্যায় জানিবেন।"

"অবশ্য দাদা, সে ত কথাই। তবে কি জান, বিবাহ হলেই যেন প্রাণটা ঠাণ্ডা থাকে।"

"আর কেন, মাপ করুণ। আমার প্রাণ বেশ ঠাণ্ডা আছে। আপনি আর গরম করিবেন না।"

বাস্তবিক কৃষ্ণকিশোর বাল্যবিবাহের উপর বিশেষ খড়্গহস্ত। কলিকাতায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া, সমাজ সংস্কারকদিগের কয়েকটী বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপনা হইয়াছিল। ক্রমে বাল্যবিবাহ হইতে, বিবাহের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা হইয়া উঠিল তিনি বুঝিলেন যে, বিবাহ মনুষ্যজীবনের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীজীবনের গলগ্রহ মাত্র! তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালী মহিলা কেবল ঘটীকাযন্ত্রবৎ কুটনা কোটে, বাটনা বাটে, গরুর জাব দেয় এবং সময়মত নিদ্রা যায়। যে কাব্যসুলভ প্রণয়প্রিয়তা সভ্যজাতিমধ্যে রমণীকে সুখদায়িনী, জীবন সঙ্গিনী করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার নিকটে বঙ্গ রমণীতে সে ভাবের সমূহ অভাব প্রতীয়মাণ হইতে লাগিল। এই সকল বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণকিশোর আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া জনম দুঃখিনী ভারত মাতার

অশ্রু বিমোচনে জীবনাতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়া রাখিলেন। কিন্তু হায়! পরবর্ত্তী দুই একটী ঘটনায় তাঁহার সমস্ত সংকল্প আকাশ-কুসুমবৎ বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনি ...

ফুল ও অলি।

ফুল। ধ্যান করি নিশি দিন,
সখাহে তোমারি রূপ;
কিসে বল এ দাসীরে
হ'য়েছ এত বিরূপ ?

আপনা পাসরি সখা
বিনা মূলে তব পায়;
সপ্রবৃত্তি দেহ-মন
সকলি সঁপেছি হায়।

গিয়াছে সুষমা মোর
সুরভি গিয়েছে দূরে,
বাসি ফুল ব'লে তাই
আদর কর না কিরে ?

কি থাকে জগতে সখা
চিরদিন সমভাবে,
ভাল মন্দ কাল-ক্রোড়ে
আগে পাছে সবি যাবে।

অই যে চন্দ্রমা হাসি
দেখিছ গগণ পরে,
অরুণ উদিত হ'লে
এখনি যাইবে দূরে।

অই যে কিরণ রাশি
জ্বলিছে জগত-তলে,
আঁধারে ডুবিয়া যাবে
মেঘের উদয় হ'লে।

এই যে বসন্তলতা
ফুল সাজে সাজিয়াছে,
মাতিয়া যৌবন-মদে
বায়ু-ভরে দুলিতেছে;

অতরূপ অত গর্ব্ব
সকলি যাইবে দূরে,
বসন্ত বিগতে সখা
বরষা আইলে পরে।

অনাদর কর, কর
তাতে কিছু ক্ষতি নাই।
দিনান্তে একটি বার
যেন তোমা দেখা পাই।

অলি। কেমনে জানাব সখি
এ গোপন ভালবাসা ?
বারেক হেরিতে তোমা
এ হৃদয়ে কি পিয়াসা ?

আদর জানি না ব'লে
সমাদর হয় নাই,
কিন্তু ও মুরতি বিনা
এ হৃদয়ে স্থান নাই।

ছুটাছুটি দিন রা'ত
আনাগোণা বত করি,
জাননা হৃদয়-নিধি
উপাসনা সে তোমারি ?

তুমি মম ধ্যান-জ্ঞান
তুমি রে নয়নতারা,
নিতুই নূতন তুমি
এ জীবন ধ্রুবতারা।

গঙ্গায় সতী।

পূর্ণিমার রাতি পূর্ণ শশধর
ঢালিছে বিমল কৌমুদীরাশ,
নীরবে প্রকৃতি হাসিতেছে যেন
পরিয়া অমল জ্যোছনা বাস।

কুলু কুলু রবে আপনার মনে
চলেছে তটিনী গাহিয়া গান ;
মলয় সমীর ধীরে ধীরে আসি
চুমিছে তাহারে ভরিয়া প্রাণ।

তীরে মাঝে মাঝে উচ্চ অট্টালিকা
নিঝুমে, নীরবে তুলিয়া মাথা
প্রকৃতি-সতীরে নীরব ভাষায়
কহিতেছে যেন কতই কথা।

গভীর নিশীথে শান্তিদেবী কোলে
নগর বাসীরা নিদ্রায় ভোর।
রাজপথে আর না চলিছে লোক ;
স্তবধ হয়েছে শবদ-ঘোর।

এ হেন গভীর নিশীথ সময়ে
ভাগিরথী বক্ষে এ'খানি তরী
চলেছে ভাসিয়া, ঝুপ ঝুপ দাঁড়
পড়িছে ; মাঝিরা গাহিয়া সারি।

তরণী মাঝারে একটী যুবক
কন্দর্প জিনিয়া মুরতী যার
ঘুমে অচেতন ; পাশে বসি এক
স্বরগের বালা রমণী সার।

সুশীল প্রকৃতি চারু বিম্বাধর
স্বভাব সলজ্জ নয়ন তার ;
হাসি হাসি মুখ হয়েছে মলিন
বহিতে না পারি ভাবনা ভার।

আরক্ত সুন্দর গণ্ড দুটী বেয়ে
দর দর অশ্রু ঝরিছে হায় !
মরতে সাক্ষাৎ প্রণয় প্রতিমা
মলিনা যেন রে বারি ধারায়।

ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পবনে
মানস অনল দ্বিগুণ জলে,
নিবাতে অনল বহে অশ্রুজল
কেন ধনী ভাসে নয়ন জলে ?

ক্ষণ পরে বালা মুছি আঁখি জল
কর যুড়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলে :—
"জগদীশ আজ হৃদয়েশে মোর
মুক্ত কর এই বিপদ জালে।"

নীরবিল বালা, নীরব মেদিনী,
চাহিয়া রহিল প্রাণেশ পানে।
পতিব্রতা সতী, বিপদে সম্পদে,
থাকে নিয়োজিত পতির ধ্যানে।

কেন অকস্মাৎ ভাগিরথী বক্ষঃ
ছাইল উচ্চ তরগে তরগে ;
সহসা ঘুমন্ত জগৎ কেনরে
জন কোলাহলে উঠিল জেগে।

মুহূর্ত্তে থামিল মাঝিদের গান
দাঁড়ের শবদ না হয় আর
ডুম ডুম ডুম বন্দুকের ধ্বনী
বিদারি' নভঃ উঠে বার বার।

গর্জ্জিয়া উঠিল নিদ্রিত যুবক
আক্রান্ত সুষুপ্ত সিংহের প্রায় ;
ক্ষত স্থান হ'তে শোণিত প্রবাহ
ছুটিল, তিতিয়া সুচারু কায়।

"যবনের করে রক্ষিতে তোমারে
না পারিনু আর হৃদয়রাণী !
বিদায় দাও গো জনমের মত
মিলিব—আর না সরিল বাণী।"

যুবতীর অঙ্কে, মুদি আঁখি পাতা
পড়িল যুবক হারায়ে জ্ঞান,
না বহিছে শ্বাস, কাঁপেনা ধমনী
অনন্তের কোলে পাইল স্থান।

"ফুরাইল সব তবে আর কেন—"
এত বলি বালা ধরিয়া অসি,
অচলের প্রায় অটল হৃদয়ে
দাঁড়াল ; রূপেতে ভাতিল দিশি।

ভাগিরথী বক্ষঃ আলোড়িত করি
নবাবের সেনা আইল ধেয়ে,
দেখিতে দেখিতে যবন তরণী
তটিনীর বক্ষ ফেলিল ছেয়ে।

"শুনলো কামিনি! ভুবনমোহিনী!"
সেনাপতি মৃদু হাসিয়া কয় :—
"তব রূপ হেরি মুগ্ধ বঙ্গেশ্বর
রাজ্যেশ্বরী হবে, নাহি সংশয়।

যৌবন তাঁহারে কর সমর্পণ
মণি ফেলি কাঁচে করো না আশ।
ভাগ্যবতী তুমি, চল মোর সাথে
নবাব তোমার হইবে দাস।

"আরে রে পামর যবন কিঙ্কর !"
কহে বালা বজ্রগম্ভীর স্বরে :—
কাঁপে দশ দিক্, কাঁপে গঙ্গাজল,
ঊর্দ্ধে নক্ষত্র কাঁপে থর থরে।

"শূন্য করি হায়! হৃদয় ভাণ্ডার
হয়েছিস্ মোর হৃদয়ধন।
তুচ্ছ করি দেখ পামর নবাবে
সে হৃদে অসিরে দিতেছি স্থান।

৩

সাগরের প্যানে ধায় স্রোতস্বতী
কার সাধ্য রোধে তাহার গতি,
'সবংশে মজিবি' ফলিবে এ শাপ
পতি পদে যদি থাকেরে মতি।

মাতঃ! সুরধনি! জীবনান্ত হ'লে
দিও স্থান মোরে পতির পাশে।
পতি পদ ছাড়ি নাহি সাধ মোর
কোটি কোটি যুগ স্বরগ বাসে।"

পতি পদ ধূলী মস্তকে ধরিয়া
বক্ষে হানিয়া সুতীক্ষ্ণ অসি,
পতিব্রতা সতী অনন্তের কোলে
পতি সহ গিয়া বসিল হাসি।

শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী

বিভা।

(১)

"ভগ্ন আশা।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শরতের পূর্ণচন্দ্র সুনীল আকাশে বসিয়া একদৃষ্টে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছেন। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সম্মুখে আসিয়া দৃষ্টির ব্যঘাত জন্মাইতেছিল বলিয়া, কৌমুদীকর লেখা দ্বারা তাঁহাকে মেঘখণ্ডসমুহ অপসারিত করিতে হইতে ছিল। প্রকৃতির এই কমনীয় চঞ্চল অবস্থায়, কলিকাতা মহানগরীর কোন দ্বিতল গৃহের প্রকোষ্ঠান্তরে একটি যুবক ও একটি বালিকা নীরবে বসিয়া আছেন। যুবকের বয়স অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ, বালিকার চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। গৃহে দীপ নাই; কিন্তু বাতায়ন পথে চন্দ্ররশ্মি আসিয়া গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে। চন্দ্রকর কিরণে যুবকের কুঞ্চিত ললাট, বিমর্ষ বদন, অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয়, এবং সঘন দীর্ঘশ্বাস দেখিয়া বেশ অনুমিত হয় যে, তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ও কর্ত্তব্য, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, আশা ও নৈরাশ্যের বিষম যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। বালিকাও বিষন্ন। বালিকা তাহার অযত্নসংরক্ষিত কেশরাশি

চুম্বিত কোমল কপোলদেশ বামহস্তে ন্যস্ত করিয়া আনত নেত্রে চাহিয়ে আছে। নয়নের কোনে অশ্রুকণা জমিয়া জমিয়া নীরবে ঝরিয়া পড়িতেছে। কে যেন তাহার সে নিটোল নধর মুখখানিতে কালিমা মাখাইয়া দিয়াছে। সে বিষাদময়ী প্রতিমাখানি দেখিলে, প্রাণে স্বতঃই বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে।

উভয়েই নীরব। উভয়েই যেন দুর্ভেদ্য অদৃষ্টের কি এক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য চিন্তার অতল সাগরে অবগাহন করিয়াছেন। গৃহ নিস্তব্ধ। দূরস্থিত রাজবর্ত্মের জনকোলাহল, অতিক্ষীণ-ক্ষীণতর হইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছিল,—আর গৃহস্থিত ব্যক্তিদ্বয়ের দীর্ঘশ্বাস তৎসহ মিশ্রিত হইয়া, এক অনতি গম্ভীর অস্পষ্ট শব্দের সঞ্চার করিতেছিল মাত্র। সহসা ভগ্ন প্রাণে রুদ্ধকণ্ঠে বিভা বলিল,—"তবে কেন? এ ছারজীবনের ভার বহিয়া আর কি লাভ! এতদিন যে আশায় হৃদয় বাঁধিতেছিলাম, আজ তাহা ঘুচিয়াগেল—আমার কল্পনার, জীবন্ত সমাধি হইল। হায়!—যুবক প্রিয় নাথ বলিল,—"আজ আমাকেও কর্ত্তব্যের অনরোধে প্রেম বিসর্জ্জন দিতে হইল। কিন্তু কি করিব বিভা? তাঁহকে অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু বুঝিলেন না। মায়ের হৃদয় গলিয়াছিল, মায়ের অনুনয়ে তিনিও সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু ছার সমাজশাশনের ভয়ে তাঁহার সম্মতি দেওয়া ঘটিয়া উঠিলনা। হৃদয়ের সহিত অনেক যুঝিয়াছি, হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। জানি, তোমাকে ছেড়ে, অপর কাহাকে নিয়ে, ইন্দ্রের নন্দন কাননে থাকিলেও আমার সুখ হইবেনা, আমি শান্তি পাইবনা। কিন্তু বিভা, যখনই স্নেহময়ী জননীর করুণ ক্রন্দন মনে পড়ে, তখনই আপনার সুখ দুঃখ ভুলিয়া যাই, পিতার আদেশ প্রতিপালনে কৃতসংকল্প হই। তাই আজ জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়াও জলন্ত অনলে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছি। বল, বিভা বল, তুমি বলিলে, আমি তাঁহাদের আদেশও অবহেলা করিতে পারি।

বিভা।—ছার আমি, আমার জন্য তুমি পতিত হইবে কেন? কে আমি? যাঁহাদিগের হইতে তুমি সংসার দেখিলে, তোমার জন্মাবধি আপনাদের সুখদুঃখ ভুলিয়া যাঁহারা তোমায় লালন পালন করিলেন,

যাঁহাদিগের নিকট তুমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, তাঁরা বড়, না আমি বড় ? আমি আজ দুইদিন তোমাকে ভাল বাসিয়াছি বইত নয়; কিন্তু শৈশবে যখন তুমি অসহায় ছিলে, তখন যে স্নেহময়ীর করুণার আশ্রয় না পাইলে, তুমি হয়ত আজ কোথায় থাকিতে, তিনি বড় না আমি বড় ? তাঁহার অপেক্ষা কি আমার অশ্রুর মূল্য বেশী ? না প্রিয়; ক্ষুদ্র আমি, আমার জন্য কেন তুমি সন্তানের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবে ? ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক! যাও, তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ কর। তাঁহারা দেখিয়া সুখি হউন। আমার জন্য পাপ কিনিওনা। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার যেন এ মতি ভ্রান্তি না ঘটে।

প্রিয়নাথ সস্নেহে বিভার ক্ষুদ্র হাত দু'খানি ধরিয়া বলিল,—"বিভা, তুমি দেবী। সংসারে এ স্বার্থত্যাগ, এ আত্ম বলিদান কেবল তোমাতেই সম্ভব। সন্তানের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিব, আত্ম-বিসর্জ্জন দিব। এখন বেশ বুঝিলাম, এজগতে আমাদের আর এক হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি পরলোক থাকে—.

বিভা—পরলোক নাই, সেকি কথা, প্রিয় ? এত প্রেম, এত ভালবাসা, এখানেই কি তাহার শেষ ? এ প্রণয়ের কি প্রতিদান পাইব না ?—না, পরলোক আছে। এখানে হইল না, কিন্তু প্রার্থনা কর, সেখানে যেন আমরা এক হইতে পারি। এ স্থানের মিলন চিরস্থায়ী নয়; এখানে বিরহ আছে, বিচ্ছেদ আছে, সন্দেহ আছে, প্রণয়ে ব্যথা আছে—কিন্তু সেখানে এ সব কিছু নাই। এ লোকে কাজ নাই, আমাদের মিলন যেন সেই পরলোকেই হয়। এখন হাসি মুখে, কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করাই আমাদের উচিত। তুমি যাও; প্রার্থনা করি এ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হও। কবে বাড়ী যাবে ?

প্রিয়। আজই।

"আজই" বলিয়া বিভা নীরব হইল। একটী দীর্ঘ শ্বাসের সহিত দু'ফোঁটা অশ্রুকণা নয়ন প্রান্ত হইতে ঝরিয়া পড়িল। প্রিয়নাথও বিষন্ন মনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(২)

"পূর্ব্বের কথা।"

বিভার পিতা যজ্ঞেশ্বর রায় একজন প্রধান ব্রাহ্ম। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার পৈতৃক গৃহ ছিল; কিন্তু বিষয় কার্য্যের অনুরোধে যজ্ঞেশ্বর বাবুকে কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইত। বিভা পিতার প্রথম সন্তান; বিভার দুটি ছোট ভাই ছিল।

প্রিয়নাথ পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। প্রিয়নাথের পিতার নাম হরকুমার ঘোষ। ঘোষজা মহাশয় ফরিদপুর জেলার নিকটবর্ত্তী হরিপুরের জমীদার। ঘোষ মহাশয় হিন্দু। জমীদারী বেশী না হইলেও, তিনি হিন্দুর ক্রিয়া কলাপাদি প্রায় সমস্তই করিতেন। স্বগ্রাম এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ঘোষ মহাশয়ের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। কোন সূত্রে ঘোষজা মহাশয়ের সহিত যজ্ঞেশ্বর বাবুর পরিচয় হয়। এই পরিচয় পরিশেষে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। উভয়েই অমায়িক, সচ্চরিত্র এবং ধর্ম্মভীরু; সুতরাং তাঁহাদের বন্ধুত্ব কিছু আশ্চর্য্য নহে। বিশেষতঃ ঘোষজা মহাশয় কিছু উদার প্রকৃতির লোক। জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, হরকুমার বাবু প্রিয়নাথকে কলিকাতায় যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাটিতে রাখিয়া, অধ্যয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। যজ্ঞেশ্বর বাবু প্রিয়নাথকে, পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও যত্ন করিতেন। প্রিয়নাথও চরিত্রগুণে এবং সদ্ব্যবহারে যজ্ঞেশ্বর বাবুর পরিবারস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল।

প্রিয়নাথ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া, যথা সময়ে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ পড়িতে থাকেন। এই সময় তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় সুতরাং তাহাকে বাড়ী যাইতে হয়। যাইবার সময় যাহা ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)।

৺প্রাণগোপাল দত্ত।

শাঁখের আংটী।

(১)

আমি বাল্যকাল হইতে ইছাপুর বসুদের বাড়ীতে থাকিয়া, তথাকার স্কুলে অধ্যয়ন করিতাম। ইছাপুরের নীলমাধব বসু আমাদের যে, বিশেষ আত্মীয় ছিলেন, তাহা নহেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন, এই মাত্র।

নীলমাধব বাবুর আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। জমিদারী ও মহাজনীতে তাঁহার বার্ষিক আয় পঞ্চাশত সহস্র মুদ্রারও অধিক। খাই দাই পড়া শুনা করি, এমনি করিয়া কয়েক বৎসর অতীত করিলাম।

নীলমাধব বাবুর একটি কন্যা ছিল, নাম নলিনী। নলিনী বালিকা, গ্রাম্য পাঠশালায় এতদিন অধ্যয়ন করিত, এখন বয়স তের চৌদ্দ হইয়াছে, দেখিয়া বাটীর সকলে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, বাটীতে রাখিয়া পড়া শুনা করাণই স্থির হইল—আমিই তাহার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলাম; আমি নিজে পড়া শুনা করিতাম, এবং অবসর মতে নলিনীকে পড়াইতাম। নলিনী সুন্দরী কি কুৎসিতা তাহা আমি বলিতে পারি না। নলিনীকে অন্যান্য সকলে সুন্দরী কি কুৎসিতা দেখিত জানি না, আমি কিন্তু তাহাকে অসামান্যা সুন্দরী দেখিতাম। তাহার একটি কথায় যত কবিত্ব-মাধুরী অনুভব করিতাম, এখন রঘুবংশ, শকুন্তলা, হ্যামলেট, ওথেলো পড়িয়াও বুঝি আর তেমন রসাস্বাদন করিতে পাই না। তাহার কণ্ঠ-স্বর আমার নিকট যেমন মিষ্ট লাগিত, এখনকার সারেঙ্গ, এসরাজ, হার্ম্মোনিয়মের স্বরেও বুঝি তেমন মিষ্টতা নাই। এখন বসন্ত সায়াহ্নের মৃদু অনিল-সংস্পর্শে সপুষ্প বাসন্তী বল্লরীর সৌকুমার্য্য অঙ্গচালনা দেখিয়া বুঝিয়াছি, নলিনীর চলনের কাছে, ইহার সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। পৌর্ণমাসি যামিনীতে নদী সৈকতে বসিয়া নীল-নির্ম্মল জলের উপর চন্দ্রের সুবিমল ছবি

দেখিয়াছি—মধুর শারদ-মধ্যাহ্ন-পঙ্কজের সহাসপ্রতিম ভাব দেখিয়াছি কিন্তু নলিনীর মুখের তুলনা কোথায়? মধুমাসে আধফোটা চাঁপার মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছি। কিন্তু ঠিক সে কি নলিনীর আঙ্গুলের মত সুন্দর? অতসী পুষ্পের বর্ণ দেখিয়াছি, সদ্যবিকসিত গোলাপের বর্ণ দেখিয়াছি—আমরে চোখে তবু নলিনীর রংয়ের যেন তুলনা হয় নাই।

একদিন দুপুর বেলা, নলিনীকে পড়াইতেছিলাম, প্রাতস্ফুটিত গোলাপদল-বিলম্বী নীহার বিন্দুর ন্যায় দুই এক বিন্দু স্বেদনীর তাহার নাসিকাগ্রভাগে দেখা যাইতেছিল, আর নিদাঘ-সমীরণ সঞ্চালিত আগুল্‌ফ বিলম্বিত মস্তকের চূর্ণ কুন্তল রাশি হইতে দুই গুচ্ছ গণ্ডস্থলে পড়িয়া দুলিতেছিল,—বোধ হইতেছিল, যেন একপাল বায়ু সন্তাড়িত ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর দুই দলে আবদ্ধ হইয়া পথের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

স্পষ্ট কথা বলিতে কি; নলিনীর সেই তরঙ্গ-তপ্ত কাঞ্চনবৎ সৌন্দর্য্যে আমি দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছিলাম। কে না সৌন্দর্য্য বহ্নিতে সাধ করিয়া পুড়িয়া মরে?

সুন্দরে হৃদয় কাহার মাতে না?
কোন্ পোড়া প্রাণ সুন্দর চাহে না?

কথা ঠিক্। কিন্তু সুন্দর জিনিষটা কি? তাহা বুঝান যায় না; বুঝা যায়। তুমি যদি সৌন্দর্য্য না বুঝ, তবে অত ছুটা ছুটি কাহার জন্য? যাহা দেখিয়া হৃদয় আনন্দে ভাসিয়া যায়, যাহা দেখিয়া আপন ভুলিতে হয়, তাহাই সৌন্দর্য্য। যাহা সকলের নিকট সুন্দর নয়, তাহাও অবস্থা বিশেষে কোন কোন লোকের নিকট সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বঙ্কিম বাবু রমণীর সৌন্দর্য্যকে নারিকেল ছোবার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, দুই-ই অসার। নারিকেলের ছোবায় রজ্জু হয়, তদ্দ্বারা রথ টানা যায়, রূপও ভারি ভারি মনোরথ টানিয়া থাকে। যখন টানিয়া থাকে, তখন আমার মনোরথই বা নিষ্কৃতি পান কিসে? নলিনীর রূপ-রজ্জু এই গরীব বেচারীর মনোরথকে সটান-সজোরে টানিতে লাগিল। শুধু কি রজ্জুতে আমার মনোরথকে এত দ্রুত টানিতেছিল, তা নয়—চক্রও ছিল।

অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বাড়ীতে আছি, ঐই স্থানে লালিত পালিত হইতেছি—যখন আমি বালক, নলিনী বালিকা, তখন হইতেই উভয়ে একত্রে থাকি; একসঙ্গে ভোজন একসঙ্গে শয়ন—একজনের ব্যারাম হইলে, অন্যের আহার নিদ্রা ত্যাগ। বাল্য কৈশোরে পরিণত হইল, ক্রমে উভয়েই যৌবন সীমার দিকে অগ্রসর হইলাম। নলিনী ধীর স্বভাব বালিকা অন্যের নিকট সে অধিক কথা কহিত না, কিন্তু আমার নিকটে তাহার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ছিল। যেখানে নলিনী ধীর-স্থির হইয়া থাকিত, সেখানে আমি গেলে, তাহার কথা ফুটিত, হাসি দেখা দিত। উদ্যান-নিভৃতে, সরোবর-সোপান পংক্তিতে, পুষ্পিতা লতিকাপার্শ্বে, পুষ্করিণীর ইষ্টকমণ্ডিত তীরে আমার পার্শ্বে বসিয়া নলিনী এক—দুই—তিন করিয়া সান্ধ্যতারা গুণিত; একটি—দুইটি করিয়া উল্লম্ফনশীল ভাসমান মৎস্য গুণিয়া আমাকে দেখাইত। রঙ্গিণ শাড়ির আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া পুকুরের সোপানে আসিয়া, আমার পাশে বসিয়া মালা গাঁথিত, কখন বা একটি—দুইটি করিয়া ফুল জলে ভাসাইয়া দিত। নিভৃত নির্জ্জন পদ্ম পুকুরের তীরে বসিয়া কত দিন নলিনী আমাকে পূর্ব্ব পঠিত "ভারত উপন্যাসের" গল্প শুনাইত। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

"কৃষিক্ষেত্র" ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে বাহির হইয়াছে। বাবু প্রবোধ চন্দ্র দে, বিলাতস্থ রাজকীয় উদ্যান সমিতির ভারতীয় প্রথম সভ্য ও মুরসিদাবাদস্থ মহামান্য নবাব বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব সুপারি-ণ্টেণ্ডট ইত্যাদি কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রবোধ বাবু শিক্ষিত ভদ্র সন্তান ও বর্দ্ধিষ্ণু বংশোদ্ভব হইয়াও চাষা ও মালীর শ্রেণীতে নাম ভুক্ত করিয়াছেন, ইহা বঙ্গবাসীর অনুকরণীয়। প্রবোধ বাবু বুই পড়া চাষা নহেন, তিনি নিজেও স্বহস্তে চাষ-বাস করিয়া যেরূপ ফল লাভ করিয়াছেন এ পুস্তকে তাহা ছাড়া অন্য কিছু লেখেন নাই। এ পুস্তক আমাদের বড় আদরের জিনিষ। কৃষিক্ষেত্র দ্বারা গ্রন্থকার বঙ্গবাসীর আদরণীয় হইয়াছেন। প্রথম হইতেই তিনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া গিয়াছেন সুতরাং তাঁহার পুস্তকে অনেক শিখিবার আছে। যাঁহারা নূতন চাষা হইতে চাহেন, অথবা যাঁহারা চাষ-বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উভয় পক্ষেই এ পুস্তক কাজে লাগিবে। পুস্তকের উদ্দেশ্য মত ভাষা আরো চাষাড়ে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভদ্র সন্তানের নিকট হইতে আর কত চাষাড়ে ভাষার আশা করিতে পারা যায়?

যাহা হউক পুস্তকের মূল্য ১৲ টাকা। ইহা বড় বেশী বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। নাটক নভেল হইলে দাম অধিক হইয়াছে একথা আমরা বলিতে পারিতাম কিন্তু এ যখন তাহা নহে তখন কেমন করিয়া বলিব যে, তিনি রৌদ্র বৃষ্টি খাইয়াছেন আপনার-লাভের জন্য? আমরা আশা করি প্রবোধ বাবু নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা বাঙ্গালা কৃষি সাহিত্যের শরীর পুষ্ট করিবেন।

২। চিকিৎসা ভাণ্ডার শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব চন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ২ নং হরিমোহন বসুর লেন হইতে প্রকাশিত। অনেক গুলি রোগের চিকিৎসা, ঔষধ ও পথ্যাদির বিষয় এই পুস্তক খানিতে লিখিত হইয়াছে।

ভক্ত জীবন ১ম ভাগ। ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত ও ২০ নং সজ্জীপাড়া ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিদ্যাভূষণ মহাশয় হরি নামের মাহাত্ম্য, ধর্ম্ম মহিমা ও হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, ভক্তি ও মুক্তির বিষয় বহুল শ্লোক ও ব্যাখ্যা সহ তাঁহার ভক্ত জীবনে দেখাইয়াছেন। এরূপ ধর্ম্ম গ্রন্থ যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল। ভক্তজীবন আদ্যান্ত পাঠ করিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

আগামী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই মাসের পত্র একবারে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং গ্রাহকগণ পত্রিকা কিঞ্চিৎ বিলম্বে পাইবেন। আগামী বারে গ্রাহকবর্গকে ওলাউঠা চিকিৎসা ও বসন্তরোগ চিকিৎসা নামক পুস্তক উপহার প্রদত্ত হইবে। যিনি উক্ত পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অর্দ্ধ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প পাঠাইবেন। গ্রাহক ব্যতীত অন্যকে মূল্য ও মাশুল স্বরূপ /১০ দেড় আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হইবে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন বারান্তরে চিকিৎসক ও সমালোচকের কলেবর বৃদ্ধি সুতরাং আর কাহাকেও নমুনা প্রদত্ত হইবে না। বারান্তর হইতে বিবিধ বিলাতি ও দেশীয় পেটেণ্ট ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী ও গুণাগুণ লিখিত হইবে।

চিকিৎসক ও সমালোচক।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড } সন ১৩০২ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা

কবিরাজি মতে ওলাউঠা চিকিৎসা।

কাল নিতান্ত দুরতিক্রান্ত। বিশ্বপতি বিষ্ণু হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত সকলকেই কালের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। কাল প্রভাবেই জগতের অবস্থান্তর, জীবদিগের মতিচ্ছন্ন এবং জরাব্যাধি প্রভৃতি যমদূত গণেরও সম্পূর্ণ ভাবান্তর লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে যাহার কিছুরই অভাব ছিল না এক্ষণে সেই, নিতান্ত কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে। ধৈর্য্য, বীর্য্য, শৌর্য্য প্রভৃতি মহদ্গুণরাশি যাহার অঙ্গভূষণ ছিল এক্ষণে সেই নিতান্ত ভীরু কাপুরুষ এবং বাচাল হইয়া পড়িয়াছে। যাহার জ্ঞান বিজ্ঞানে এক সময় জগৎ প্রভাসিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই, ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জন্মভূমি ভারতবর্ষই ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। পাশ্চাত্য শিক্ষার কৃত্রিম আলোকে ভারতবাসীদিগের নিতান্তই বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। হতভাগ্য ভারতবাসীগণ দেশহিতৈষিতা [illegible] জাতি বিনাশের সাহায্য

লাভ ও প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত হইয়া প্রতিনিয়ত যে সমস্ত সাধুজন বিগর্হিত কদর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত পক্ষে দেশের মহান্ অপকার সাধিত হইতেছে। আর যে কখনও কেহ দেশের উন্নতি করিতে পারিবে না, পুরুষানুক্রমে সকলকেই যে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতে হইবে, কেবল ইহাই যেন স্থিরতর হইতেছে। এস্থলে অন্য বিষয়ের কথা উল্লেখ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। চিকিৎসা সম্বন্ধেই দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে দুই প্রকার চিকিৎসাপ্রথা প্রচলিত আছে, যথা—আয়ুর্ব্বেদীয় ও ডাক্তারী। তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আমাদিগের এবং ডাক্তারি চিকিৎসা পরের। সেই পরের চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি জন্য পরেও অহঃরহ যত্ন করিয়া থাকে। আমরাও প্রাণপণে সাহায্য করিয়া থাকি। পরের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিবার জন্য আমরা নিজ ভাণ্ডার শূন্য করিতেছি। ইহাপেক্ষা দেশহিতৈষীর বিষয় আর কি হইতে পারে? বৈদেশীক চিকিৎসার উন্নতিকল্পে স্থানে স্থানে স্কুল, কলেজ, ঔষধালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি কোন প্রকার আয়োজনেরই অভাব লক্ষিত হয় না। তৎসমুদায়ের ব্যয়ভার আমাদিগকেই সর্ব্বদা বহন করিতে হয়। এলোপ্যাথী প্রণালীর জন্য প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টও কতক করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি জন্য অথবা স্বদেশের হিত সাধন বা পরোপকারের জন্য যদি কোন মহাত্মা এককালীন কিছু দান করেন, তাহাও পরহস্তে অর্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্দ্বারা বৈদেশীক চিকিৎসারই উৎকর্ষ সাধিত হয়। হতভাগ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের জন্য কেহই কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। তবে দুই চারিজন সহায় সম্পত্তি বিহীন আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী, ফাঁকা চীৎকার করিয়া আর কতদূর কি করিবেন? ইহাতেই বলিতেছি কালপ্রভাবে ভারতবাসীর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রশংসা শুনিলে অথবা আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের প্রভাব দর্শন করিলে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় উপহাসে তাহা উড়াইয়া দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ডাক্তার দিগের অন্তঃকরণে

তাহাতে দারুণ ব্যথা লাগিয়া থাকে। এস্থলে এই ঘটনায় একটি প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

অধুনা শিক্ষিত ব্যক্তি ও ডাক্তারগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন আর নাই করুন কিন্তু সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ওলাউঠা রোগের কোনও লক্ষণ বর্ণিত নাই সুতরাং কবিরাজি মতে ঐ রোগের চিকিৎসাও হইতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ওলাউঠা শব্দের প্রয়োগ কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহা আমাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগে যে সকল লক্ষণ সর্ব্বদা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তত্তৎ লক্ষণাক্রান্ত পীড়া এবং তাহার প্রতিকারের বিষয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যথেষ্ট বর্ণিত আছে। তৎসমুদায় বিস্তাররূপে বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমি স্বয়ং বহুকাল হইতে কবিরাজি মতে ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি। তাহাতে স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে, ডাক্তারী এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী মতে শতকরা যতগুলি রোগী, রোগ মুক্ত হয়, কবিরাজি মতে তাহার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ পরিমিত রোগী ওলাউঠার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। প্রায় এক বৎসর হইল "চিকিৎসা সম্মিলনী" নামক মাসিক পত্রিকায় এই বিষয়ের একটী প্রবন্ধ এবং সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহা পাঠ করিয়া দেশীয় কৃতবিদ্য ডাক্তারগণ আমার উপর একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া রহিয়াছেন। "কবিরাজি ঔষধে ওলাউঠার শান্তি" কথাটী তাঁহাদিগের কর্ণে বড়ই অসহ্য হইয়াছে। গত অগ্রহায়ন মাসে কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে একজন হোমিওপ্যাথী ডাক্তারও ছিলেন। আমরা উভয়ে কোন খ্যাতনামা বিলাত ফেরত এম, ডি, উপাধিধারী হোমিওপ্যাথী ডাক্তারের বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, শিক্ষিত লোকের সহিত আলাপ করিয়া অবশ্যই আপ্যায়িত হইব, কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। আমার সঙ্গে যে ডাক্তার বাবু ছিলেন তাঁহার সহিত উক্ত এম, ডি, উপাধিধারী ডাক্তারের পরিচয় ছিল।

তিনি অন্যান্য কথার পর আমার সঙ্গীয় ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের দেশে অমুক নামক একজন কবিরাজ নাকি হোমিওপ্যাথী ডাক্তারের হস্ত হইতে ওলাউঠার রোগী লইয়া আরাম করেন?" তখন আমার সঙ্গীয় ডাক্তার বাবু, আমাকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিলেন, "ইনিই সেই কবিরাজ, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।" উক্ত বিলাত ফেরত ডাক্তার বাবু এবং তাঁহার সম্পর্কিত অপর একজন ভদ্রলোক আমাকে যৎপরোনাস্তি বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন। আমি তখন আর কোনও উপায় না দেখিয়া কেবল এই মাত্র বলিলাম, "মহাশয়! কবিরাজি মতে ওলাউঠার শান্তি হইলে, অথবা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের হস্ত হইতে কবিরাজেরা ওলাউঠার রোগী লইয়া আরাম করিলে আপনাদিগের ন্যায় শিক্ষিত লোকের কি অপমান বোধ হইয়া থাকে? তাহাতে কি বিলাতী শাস্ত্রের গৌরব হ্রাস হয়? আমি মনে করিয়াছিলাম, কবিরাজি মতে ওলাউঠার শান্তি শ্রবণ করিলে হয়ত ভারতবাসীর অন্তঃকরণে আহ্লাদের সঞ্চার হইতে পারে। তজ্জন্যই সংবাদপত্রে উহা ঘোষণা করা হইয়াছিল। যাহা হউক আমাকে ক্ষমা করিবেন, ইত্যাদি।" এই কথায় এম, ডি, উপাধিধারী ডাক্তার বাবু তখন দুই চারিটী মিষ্ট কথায় আমাকে শান্তনা করিতে লাগিলেন কিন্তু আমি আর তথায় বিলম্ব না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম। তবে কালদোষে অথবা বিলাতী শিক্ষার প্রভাবে যে, ভারতবাসীর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে তাহা না বলিব কেন?

এই সমস্ত কথা বলিয়া আপাততঃ কোনও ফল নাই। কালচক্রের ঘোর আবর্ত্তনে মুহুর্মুহুঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া ভারতের অদৃষ্ট, দগ্ধপ্রায় করিয়াছে। সুতরাং যিনি যাহাই বলিবেন, তাহাই কাণ পাতিয়া শুনিতে হইবে। এক্ষণে যাহা বলিতে বসিয়াছি তাহাই যথাসাধ্য বর্ণনা করা যাইতেছে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ ওলাউঠা সম্বন্ধে সময় সময় অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ

শাস্ত্রানুসারে পর্য্যালোচনা করিলে তৎসমুদায় কখনও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে দূষিত জল বায়ু হইতেই ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হয়। কেহ বা ওলাউঠা-কীটানু নামক একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন। আবার কেহ বা ওলাউঠা-বিষ বলিয়া এক প্রকার তীব্র পদার্থ উপলব্ধি করেন। এই কীটানু বা বিষ কোনও প্রকারে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেই ভয়াবহ ওলাউঠারোগে আক্রান্ত হইতে হয়। কোন কোন মহাত্মা ইহাকে স্পর্শাক্রমক রোগ বলিয়া মীমাংসা করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা তাহাতে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ-সমুদ্র মন্থন করিলে এতদ্বিষয় কোনও মীমাংসা হইতে পারে কিনা তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

জল, বায়ু, দেশ এবং কাল এই উপকরণ চতুষ্টয় প্রাণী-জীবনের একমাত্র অবলম্বন। প্রাণীগণ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত এইগুলি লইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন একটী দূষিত হইলে, জরা ব্যাধিরূপ নানাপ্রকার উপদ্রব আসিয়া সহসা জীবদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অমঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু পল্লীবাসী বা ব্যক্তি বিশেষের কদর্য্য ব্যবহারে প্রথমতঃ স্থানীয় জলই দূষিত হইয়া পড়ে। সেই দূষিত জলের সংস্পর্শে তন্নিকটবর্ত্তী বায়ুও দোষ-প্রাপ্ত হয় এবং বায়ুর স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলতা বশতঃ দোষ সমূহের ব্যাপকতা-শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে প্রথমতঃ জল বায়ু দূষিত হইলে অবশেষে দেশ এবং কালও বিকৃতভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই সকল বিকৃত জল বায়ু দ্বারা যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয়, সদাচার এবং সুচিকিৎসা দ্বারা তৎসমুদায় অবশ্যই প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে। তাদৃশ বিকৃত ভাবাপন্ন জল বায়ু হইতেই কি ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হয়? কুপজল বা অন্য কোন বদ্ধ জল অপেক্ষা স্রোতঃশালিনী নদী সমূহের জলই যে অধিকতর বিশুদ্ধ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই সমস্ত নদীতীরবর্ত্তী

স্থলেই আবার ওলাউঠার অত্যধিক আক্রমণ লক্ষিত হয়। তবে দূষিত জলই যে, ওলাউঠার কারণ তাহা কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি? এতদ্ভিন্ন আরও এক কারণে উপরোক্ত উপকরণ চতুষ্টয় দূষিত হইতে পারে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির বিপরীত ভাবে পার্থিব বায়ু অত্যন্ত দূষিত হইয়া যদি অন্যান্য উপকরণ গুলিকেও সহসা দূষিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কোন এক প্রকার সাংঘাতিক ব্যাধি সমুদ্ভূত হইয়া জনপদ সকল ধ্বংশ করিতে আরম্ভ করে। * এই প্রকার অবস্থায় প্রাণীদিগের জীবন স্বরূপ জল বায়ু প্রভৃতি নিতান্ত দূষিত হইলে জনপদবাসী কাহারও নিস্তারের সম্ভাবনা থাকে না। সকলকেই একজাতীয় পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। তবে দোষের অল্পতা ও শরীরের বলাধিক্য বশতঃ কদাচিৎ দুই এক জনের জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে। ইহা নিতান্ত সাংঘাতিক এবং অপরিহার্য্য হইলেও বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগের কারণ বলিয়া কখনও স্থির সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। নৈসর্গিক কারণে জনপদ সমূহের জল বায়ু সহসা দূষিত হইলে তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং দেশব্যাপী আবালবৃদ্ধ সকলকেই সেই সমস্ত দূষিত জল, বায়ু প্রতিনিয়ত ব্যবহার করিতে হয়। যদি ইহাই ওলাউঠা রোগের একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে দেশবাসী সকলকেই একযোগে ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হইত। কিন্তু সমগ্র দেশের কথা দূরে থাকুক, সামান্য গ্রামের মধ্যেও পীড়া উপস্থিত হইলে কতকগুলি লোক এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হয়, আবার কতকগুলি লোককে সেই সময় সম্পূর্ণ নিরাপদে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে এবম্ভূত দূষিত জল বায়ুকেও কখন ওলাউঠা রোগের প্রকৃত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। তবে

* বৈগুণ্যমুপপন্নানাং দেশকালানিলাম্ভশাং। গরীয়স্থং বিশেষণে হেতুমৎ সংপ্রবক্ষ্যতে॥ বাতাৎ জলংজলাৎ দেশং দেশাৎ কালং স্বভাবতঃ। বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্য্যত্বাদ্ গরীয়স্তরমর্থবিৎ॥ ইত্যাদি

(চরক, বিমানস্থান, ৩য় অধ্যায়।)

কি ওলাউঠা বিষ বা কীটাণু নামক কোনও অভিনব পদার্থ আবির্ভূত হইয়া এই ভয়াবহ অত্যাহিত সংঘটিত করিতেছে? এস্থলে ওলাউঠা কীটাণু সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। কেন না, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই এবং আমরাও কখন তাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই অথবা প্রত্যক্ষ করিবার কোন উপায়ও নাই। কিন্তু ওলাউঠা বিষ বলিয়া যে এক প্রকার পদার্থের বিষয় কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। যে সকল আচরণ স্বাস্থ্য সম্পাদক, তাহাকে সদাচার এবং যাহা শরীর ক্ষয় কারক তাহাকে কদাচার কহে। তদ্রূপ যে সকল বস্তু শরীর-পোষক তাহাকে পথ্য এবং যাহা শরীর নাশক তাহাকে বিষ শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু প্রত্যেক দ্রব্যেই বিষত্ব এবং অমৃতত্ব গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা এক সময় দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃতের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাই আবার অন্য সময় বিষরূপে পরিণত হইয়া থাকে। বিষও আবার সময়ান্তরে দেহ রক্ষার হেতুভূত হয়। প্রাণীগণ সদা সর্ব্বদা যে প্রকার আচরণ করিয়া থাকে এবং প্রতিদিন যে সকল দ্রব্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, তৎসমুদায়ের সংমিশ্রণে সময়ান্তরে শরীর মধ্যে আপনা হইতেই মৃদু, মধ্যম এবং তীব্রগুণ বিশিষ্ট এক এক প্রকার বিষের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ঋষিগণ কহিয়াছেন——

"স্বয়মুৎপদ্যতে দেহে বিষং ব্যাধি প্রভাবতঃ"

এই বাক্যে জানা যাইতেছে যে অযুক্ত আহার বিহার জন্য প্রথমতঃ অগ্নিমান্দ্য রোগের উৎপত্তি হয়। সেই ব্যাধিপ্রভাবে দেহমধ্যে আপনা হইতেই প্রাণনাশক বিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বাহ্য বিষ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই যে এই রোগের উৎপাদন করে তাহার কোনও যুক্তি যুক্ত প্রমান নাই। আহার বিহারকেই যদি এই রোগের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে আরও একটী সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। জনপদ মধ্যে যখন ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন অধিকাংশ লোকেই এতদ্দ্বারা

আক্রান্ত হইয়া থাকে। তবে কি সকলেই সর্ব্বদা অন্যায় রূপে আহার বিহার করিয়া থাকে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, অশন-লোলুপ, অজিতাত্মা মূঢ় গণ এই রোগে যত আক্রান্ত হয় এবং তাহা-দিগের মধ্যে যত অধিক মৃত্যু সংখ্যা লক্ষিত হয় পরিণামদর্শী, পরি-মিতাহারী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দিগের মধ্যে কখনও তত দৃষ্টি গোচর হয় না।* বিশেষতঃ কদাচারী নিম্ন শ্রেণী লোকদিগের মধ্যেই এই রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহা সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। তাহার পর দেশ মধ্যে ব্যাধি বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে অবিরত মহান কোলাহল উত্থিত হইয়া থাকে, যখন বিমানস্থিত বিহঙ্গম কুল ভয়ব্যাকুল চিত্তে, থাকিয়া থাকিয়া, এক একবার কলরব করিয়া উঠে, শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি প্রাণীবর্গ যখন বিকট স্বরে দিবা নিশি আর্ত্তনাদ করিতে থাকে এবং শোকবিহ্বল মনিষ্য দিগের ক্রন্দন ধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, যখন মনকে আরও আকুলিত করিয়া তুলে তখন ভদ্রাভদ্র, সদাচারী-কদাচারী, সকলেরই অন্তঃকরণে দারুণ ভীতির সঞ্চার হইতে থাকে। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে সকলেই তখন নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শন করিতে থাকে। সর্ব্বদাই যেন বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠে। ভুক্তবস্তু সম্পূর্ণ পরিপাক হইলেও যেন উদর মধ্যে গুড়্ গুড়্ শব্দ হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ ভয় ও শোকাদি দ্বারা শারীরিক যন্ত্রগুলিই বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। শরীরস্থ যন্ত্র গুলি বিকৃত হইয়া যদি ওলাউঠার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে কিছুতেই রোগীকে রক্ষা করিতে পারা যায় না। জনপদ মণ্ডলের এইরূপ অবস্থা সমুপস্থিত হইলে কেবল মাত্র চিকিৎসার সাহায্যে কখনও শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। সেই সময় চিকিৎ-সার সঙ্গে সঙ্গে যাগ-যজ্ঞাদি শান্তি স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

---

* তাং পরিমিতাহারী লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তাম জিতাত্মানো লভন্তেঽশন লোলুপাঃ॥
(মাধব নিদান।)

সেই সময় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া, যদি বিভূগুণ গানে প্রমত্ত হওয়া যায়, তবে শীঘ্রই মঙ্গল বিধান হইতে পারে।* এস্থলে আরও একটি কথা উল্লেখ করা যাইতেছে যে, বিদ্যালয়ে বসিয়া গ্রন্থাদি পরিদর্শন ও অযথা চিন্তা, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত চিকিৎসালয়ে রোগী দর্শন দ্বারা কখনও ওলাউঠারোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় হইতে পারে না। ভদ্রাভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই ক্রমে ক্রমে এত দূর সভ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রাণান্তেও কেহ সত্য কথা বলিতে প্রস্তুত নহে। কোন ওলাউঠার রোগীকে যদি আহার বিহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করাযায়, তবে অমনি সে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়া উঠে —"দশ-বার দিনের মধ্যে আমি কোনও অহিত ভোজন করি নাই" কিন্তু পরক্ষণেই ভেদ বমির সঙ্গে সঙ্গে, রাশি রাশি কদলীবীজে অথবা তৎসদৃশ অন্য কোন দুষ্পাচ্য পদার্থ নির্গত হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দেয়। রোগীর আত্মীয় স্বজনের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে কখনও প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। নিয়ত পল্লী মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিলে আহারাদি সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যিনি তদ্রূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন তিনি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেও বোধ হয় কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না যে, অন্যায় আহার বিহার জন্যই ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার ওলাউঠা রোগ যে স্পর্শাক্রমক নহে তাহাও অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলে আত্মীয় স্বজন সকলকেই তাহার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে হয় এবং তাহার মল মূত্রাদিও স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু সেই সকল পরিচারকবর্গ অনেক স্থলে এতদ্দ্বারা আক্রান্ত হয় না। যাহারা সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয়—ভ্রমেও কখন

---

* হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানী সেবনম্। সেবনং ব্রহ্মচর্য্যাস্য তথৈব ব্রহ্ম চারিণাং॥ সঙ্কথা ধর্ম্মশাস্ত্রানাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাং। ধার্ম্মিকৈঃ সাত্বিকৈর্ণিত্যং সহাস্তা বৃদ্ধ সম্মতৈঃ॥

(চরক, বিমান স্থান, ৩য় অধ্যায়)

রোগীর ঘরে পদার্পণ করেনা, তাহারাও রোগাভিভূত হইয়া কাল গ্রাসে পতিত হয়। অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিজের কথাই আমি বলিতেছি। আমি স্বয়ং অনেক ওলাউঠা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পরিচর্য্যা করিয়াছি, নিয়ত তাহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, রোগীর গৃহস্থিত আহারীয় দ্রব্য লওয়ায়, অনেক সময় আমাকেও ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হইত। সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে, ইহা এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না তখন ইহাকে স্পর্শাক্রমক রোগ বলিয়া কি প্রকারে নির্ণয় করিব ? এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে দেখা যাইতেছে যে কদাচার, কুৎসিত ভোজন, ভয় এবং শোক, এই চতুর্ব্বিধ কারণ হইতেই ওলাউঠা রোগের উৎপত্তি সম্ভাবনা।

অধুনা শিক্ষিত মণ্ডলী বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব ছিলনা। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদিয় শাস্ত্রে ইহার কোনও লক্ষণ এবং চিকিৎসা প্রণালী বর্ণীত নাই। প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে তৎসমুদায় আছে কি না এক্ষণে তাহাই পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। প্রথমে দেখা উচিত যে, বর্ত্তমান ওলাউঠা রোগে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ডাক্তারী গ্রন্থে যাহা আছে তাহা আমরা অবগত নহি। রোগীদিগের শরীরে যে, সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তৎসমুদায় আপামর সাধারণ সকলেই সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ভেদ, বমি, হিক্কা, পিপাসা, ঘর্ম্ম, হস্তপদ ও অঙ্গ বিশেষে খাইলধরা মূত্ররোধ, উদরের বেদনা ও শব্দ, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, সংজ্ঞানাশ, বক্ষঃবেদনা এবং শরীরের বিবর্ণতা এই সকল লক্ষণ ওলাউঠা রোগে সচারচর দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কাহারও কাহারও জৃম্ভণ, কম্প এবং শিরঃশূলাদিও প্রকাশ পায়। এ দিকেআয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেও ঋষিগণ বলিয়াছেন—

"মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা-শূল-ভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভদাহঃ।
বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ।।

তবেই দেখা যাইতেছে, যে উদ্ধৃত বচনে যে, কএকটী লক্ষনের কথা

লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, বর্ত্তমান ওলাউঠারোগে তাহার অতিরিক্ত কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অবস্থা বিশেষে কোন কোন লক্ষণ অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। উল্লিখিত বচনে আরও জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে এই দেশে ওলাউঠা রোগের আক্রমণ না থাকিলে প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে ইহার লক্ষণাদিও কিছু লিপিবদ্ধ থাকিত না। দোষত্রয়ের-ন্যূনাধিক্য বশতঃ যে সকল অবস্থায় উপরোক্ত লক্ষণাদির আবির্ভাব হয়, দেশ, কাল, পাত্র, সাধ্য, অসাধ্য, ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া তৎসমুদায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে, একখানি বৃহৎ পুস্তকের অবতারণা করিতে হয়। সুতরাং যুক্তি প্রমান উল্লেখ করিয়া এক একটী লক্ষণের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। এক্ষণে গোটা মোটি ভাবে কেবল লক্ষণ গুলির কথাই বলা যাইতেছে।—

ওলাউঠারোগে সদা সর্ব্বদা যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, উদ্বেষ্ট (অর্থাৎ হস্তপদে খাইলধরা) এবং বক্ষো-বেদনা এই কয়েকটী লক্ষণকে সাতিশয় যন্ত্রণাপদ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে অনিদ্রা, চিত্তের অনির্ব্বচনীয় অসুস্থতা, কম্প, মূত্ররোধ এবং চেতনালোপ, এই পাঁচটী উপদ্রবকেই অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।* আবার যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে মৃত্যু অনিবার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় তাহাও বলা যাইতেছে। যাহার দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ সমূহ অত্যন্ত শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানের অভাব বা অল্পতা সংঘটিত হইয়া থাকে, অত্যন্ত বমি বা কাষ্ঠ উকি, নেত্রদ্বয় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট, স্বর অতি ক্ষীণ এবং সন্ধি সমূহ বিমুক্ত প্রায় লক্ষিত হয়, তাহাকে কখনও পুণর্জ্জীবিত হইতে দেখা যায় না। † সমস্ত গুলি লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইলেই এইরূপ অসাধ্য বলিয়া নিরূপণ করা

* নিদ্রানাশো হরতিঃ কম্পো মূত্রাঘাতো বিসংজ্ঞতা।
অমী উপদ্রবা ঘোরা দৃশ্যন্তে পঞ্চ দারুণাঃ॥

† যঃ শ্যাব দন্তৌষ্ঠনখোঽল্পসংজ্ঞোবম্যর্দ্দিতোঽভ্যন্তরযাত নেত্রে।
ক্ষাম স্বরঃ সর্ব্বাবমুক্ত সন্ধির্যায়ান্নরঃ স্নোঽপুনরাগমায়॥
(মধুমতী)

কর্ত্তব্য। যদি কোন কোন লক্ষণ প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে কখনও হতাশ হওয়া উচিৎ নহে।

ওলাউঠা রোগ বড়ই ভীতিপ্রদ। সংন্যাস এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত সন্নিপাত জরাদিতেও শীঘ্র শীঘ্র জীবনী শক্তি ধ্বংস করে বটে কিন্তু তাহাতে রোগীর অন্তঃকরণে এত ভ্রমের সঞ্চার হয় না। ওলাউঠা-রোগে আক্রমণ করিলেই রোগী অমনি জীবনের আশয়ে হতাশ হইয়া পড়ে। গ্রামের মধ্যে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে, আমি অনেক স্থলে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, প্রথমেই যাহার বমি আরম্ভ হয় তাহার পীড়া অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া থাকে। দুই একবার দাস্ত হইতে না হইতে ঊর্দ্ধসংখ্যা এক প্রহর বা দেড় প্রহরের মধ্যে তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারা যায় না কিন্তু প্রথমে দাস্ত হইয়া পরিশেষে যাহার বমন আরম্ভ হয়, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহার জীবন ধ্বংস হয় না। গ্রামের মধ্যে এই রোগ উপস্থিত হইলে আরও দেখিয়াছি, যাহার মুখ মণ্ডল বিবর্ণ ও শুষ্ক, তাহার নাড়ীও অত্যন্ত দ্রুত গামিণী! নাড়ীর গতি এত দ্রুত বেগে স্পন্দিত হইতে থাকে যে, কিছুতেই স্পন্দনের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। অথচ তখন পর্য্যন্ত তাহার শরীরে ব্যাধরামের কোনও বাহ্য লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। অথবা সেও কিছুমাত্র জানিতে পারে না যে, মুহূর্ত্ত পরেই তাহাকে কি প্রকার দুর্দ্দৈব শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হইবে।

চিকিৎসা প্রকরণ।

ওলাউঠা রোগে আক্রমণ করিলে প্রথমতঃ তরল মল নিঃসারিত হইতে থাকে। ইহাকে অতীসারাবস্থা কহে*। এই অবস্থায় রামবান রস, মুস্তাদ্যবটী এবং কর্পূরাসব প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত সহপানে

* সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধো বর্চ্চোমিশ্রো বায়ুনাধঃ প্রণুন্নং। সরত্যতীবাহতি সারং তথাহুর্ব্যাধিং ঘোরং ষড়বিধন্তং বদন্তি॥

সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অতীসার উপস্থিত হইলে, হৃদয়, নাভী, পার্শ্ব, উদর এবং তলপেটের বেদনা আরম্ভ হয়। বায়ু সন্নিরোধ, মল সঞ্চয়, উদরাধ্মান এবং শরীর অত্যন্ত অবসাদ যুক্ত হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উদর মধ্যে মল সঞ্চিত থাকে ততক্ষণ কেবল মল সংযুক্ত তরল ভেদ হইতেই দেখা যায়। তাহার পর মল নিঃশেষ হইয়া গেলে শরীরস্থ রস রক্ত, মেদ, বসা, লসিকা প্রভৃতি মল রূপে পরিণত হইয়া, নিঃসৃতহইতে থাকে। এই জন্যই মাংসধোওয়া, চাউল ধোওয়া এবং কুমড়া পচা জলের ন্যায় মলের বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় হইতে রোগীর অবস্থা নিতান্ত শোচণীয় হইয়া পড়ে। রস-রক্ত প্রভৃতি যাবতীয় জলীয়াংশ মলরূপে নির্গত হয় বলিয়া ঘোরতর পিপাসা, উদ্বেষ্টন (খালিধরা), ঘর্ম্ম, এবং ক্ষণে ক্ষণে মোহ আসিয়া রোগীকে একান্ত অভিভূত করিয়া তুলে। এই সময় যদি কোন রূপ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উদরস্ফীত হইয়া শীঘ্রই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে রস-রক্তাদি সপ্ত ধাতু এবং নাড়ীস্পন্দন অব্যাহত থাকে তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত। দাস্ত বন্ধ না হইলেও ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মলের বর্ণ স্বাভাবিক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। পিত্তকোষ ও যকৃতের ক্রিয়ারম্ভ হইয়া পাচক পিত্তের উদ্দীপনা না করিলে কখনও মলের বর্ণ স্বাভাবিক হয় না। পাচক পিত্ত উদ্দীপক হইলে পরিশেষে রঞ্জক পিত্তও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই পাচক পিত্তের উত্তেজনা করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নকুমার মৈত্রেয়।

অপাং ধাতুঃ অত্র সমাসাকবণাদ্বহুত্বেন চ সর্ব্যজল মূত্র স্বেদমেদঃ-কফপিত্ত রক্তাদয়ো দ্রব ধাতবো গৃহ্যন্তে। অতি সরতি নদীবৎ অতিসারং তমাহুর্ব্ব্যাধিং ঘোর মিতি। যো রসাদি দ্রব ধাতুঃ অতীব সরতীতি প্রকৃতিমতিক্রম্য গুদাংধ্বনা সরতি তং ব্যাধিমতী সার মাহুঃ।

(অন্যচ্চ) হৃন্নাভি পার্শ্বোদর কুক্ষি তোদ গাত্রাবসাদানি নসন্নিরোধাঃ বিট্ সঙ্গাধ্মানমথাবিপাক র্ভবতি॥

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

প্রসবান্ত বিকার.................................স্ত্রী, বয়স প্রায় ৩৩ বৎসর। এই সময়ে তাঁহার প্রথম গর্ভ হয়। নিয়মিত প্রসব মাস উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার পর প্রকৃত প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তথাপি স্বাভাবিক উপায়ে প্রসব না হওয়ায়, প্রসবকালে প্রসবকরণে প্রসিদ্ধ জনৈক এলোপেথিক ডাক্তার মহাশয় আহুত হন। স্বাভাবিক ভাবে প্রসবের উপায় নাই দেখিয়া তিনি গর্ভশায়িত শিশুটীর কতকাংশ কাটিয়া বাহির করেন। পরদিন আসিয়া দেখেন প্রসূতির ভয়ানক জ্বর হইয়াছে এবং গর্ভস্থ অবশিষ্ট মাংসপিণ্ড বাহির হয় নাই। ডিলিরিয়ম অর্থাৎ প্রলাপ বকায় অস্থির হইয়াছে ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া তিনি তাঁহার মৃত্যুই সিদ্ধান্ত করিয়া যান। তাহার পরদিন প্রাতে (১৮৯৫।-৪ঠা ফেব্রুয়ারি) আমি আহুত হইয়া নিম্নস্থ লক্ষণ নিচয় দেখিলাম। নাড়ী স্থূল ও মৃদুগামিণী, শরীর, সন্তাপে ১০৪ ডিগ্রী; ভয়ানক মাথা-ধরা, সম্মুখ কপাল এত ভারিবোধ যে, ভাল করিয়া চাহিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করে; মধ্যে মধ্যে চিড়িক মারিয়া উঠে। চক্ষু রক্তবর্ণ; মুখশ্রী বিবর্ণ, নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় রোগিণী যেন নিজ জীবন লাভে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছে। গলার মধ্যে যেন কি বাঁধিয়া রহিয়াছে; পিপাসা নাই, মধ্যে মধ্যে পাকস্থলী জ্বালা করে। দুই পার্শ্ব ভয়ানক বেদনাযুক্ত, নিশ্বাস ফেলিতে ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ভীষণ যন্ত্রণা বোধ হয়। নিম্নোদরে এত বেদনা যে, হস্ত স্পর্শ করিতে দিতে ভয় করে। জরায়ু, প্রদাহ বিশিষ্ট—বিলক্ষণ স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও উষ্ণ। কয়েকবার রক্তপ্রস্রাব হইয়া গিয়াছে। কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় নাই। সমস্ত শরীর উষ্ণ কিন্তু হস্তপদ শীতল। জ্বরের প্রবলাবস্থায় প্রলাপাদি হয়; আপনাপনি বকে, ঐ কে আসিতেছে—আমি যাইব। ভয়; মধ্যে মধ্যে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিবার চেষ্টা। আবার কখন বা চুপ করিয়া থাকে। রাত্রিকালে এই সকল লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কখন কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে।

আমি প্রথমে বেলাডনা ৩য়, তিনঘণ্টান্তর সেবনের ব্যবস্থাকরিলাম। এবং তাহার অমিশ্র আরকের ৪ ফোঁটা, চারি আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া, দিবসে ৩। ৪ বার প্রসব দ্বার দিয়া পিচকারী দিবার আদেশ দিলাম। জরায়ুকে স্ব স্থানে রাখিবার জন্য এবং প্রদাহাদির নিবারণের জন্য ফ্ল্যানেল্ দিয়া উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিবার প্রণালী প্রদর্শন করাইয়া আসিলাম। পথ্য, সাগুর সহিত অল্প অল্প দুগ্ধ।

৫ই ফেব্রুয়ারি—মাথার ভার সামান্য কমিয়াছে। শরীরের বেদনাও একটু কম। একবার বেশ দাস্ত পরিষ্কার হইয়াছে—তাহাতে মল ও রক্ত ছিল। প্রস্রাবের সঙ্গে মাংসের ন্যায় চাপ চাপ কতক গুলি মাংস খণ্ড বাহির হইয়াছে। সমস্ত শরীর, বিশেষতঃ মিয়োদরে, ভয়ানক বেদনা, এমন কি ভয়ানক কষ্টে, নিশ্বাস ফেলিতে হয়। নাড়ীর স্থূলতা ভার আর নাই। শরীরের তাপ ১০০ ডিগ্রী। আর্ণিকা ৩০শ, সেবন করিতে এবং তাহার অমিশ্র আরকের লোশন, পিচকারী দিতে বলিলাম এই ব্যবস্থায় আরো একদিন রাখিলাম।

৭ই সকালে জ্বর নাই। রোগিণী অনেক সুস্থ বোধ করিয়াছে, বেদনা অনেক হ্রাস। কিন্তু ঐ দিন বৈকালে ৪টার সময় আবার জ্বর আসিয়াছিল ও রাত্রে পূর্ব্ববত প্রলাপ বকে।

পরদিবস পুনরায় আবার ৪টার সময় জ্বর আইসে ও পিপাসা কিছুমাত্র ছিলনা বলিয়া পলসেটিলা ৩০শ শক্তি, চারি ঘণ্টান্তর ৪মাত্রা দিলাম। এইরূপে উক্ত ঔষধ ২।৩ দিন সেবনের পর প্রসূতি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তাহার পর, তাহার এপর্য্যন্ত কোন অসুখ করে নাই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হোমিওপেথিক চিকিৎসার এরূপ আশ্চর্য্য আরোগ্যকারিণী শক্তি দেখিয়াও অদ্যাপি তাহার সর্ব্ববাদী সমাদর হইতেছে না কেন তাহার কারণ নির্ণয় নিতান্ত বিসম্বাদী। যাহাহউক সাধারণের প্রত্যক্ষ ফল—পক্ষপাতী হওয়া কর্ত্তব্য।

ডাক্তার—শ্রীঅভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎকট ব্যবস্থা

৭৩ পৃষ্ঠার পর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে যে সরকারী ঠাকুদ্দাদার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বেহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বয়স পঞ্চাশের অধিক নহে ও সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। এরূপ ঠাকুদ্দাদা এখনও বঙ্গের অনেক গ্রামে এক একটী করিয়া দৃষ্ট হয়। বিপদকালে সৎযুক্তি প্রদান করা, আকস্মিক গৃহ বিবাদ, আপোষে মিটাইয়া দেওয়া, গ্রাম্য যুবকদিগের সান্ধ্য সমিতিতে সদুপদেশ দান ও নির্দ্দোষ আমোদ বিতরণ করা এবং অলক্ষিতভাবে পাপ বৃদ্ধি নিবারণ ও দুষ্টের দমন করা, এই সমস্ত কার্য্য গ্রাম্য ঠাকুদ্দাদা গণের সুখজনক কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের বেহারি ঠাকুদ্দাদার এতদ্ব্যতীত আরও গুটি কত গুণ (বা দোষ) ছিল। গীতবাদ্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং রঙ্গ করিবার ইচ্ছাটা তাঁহার হৃদয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় জাগ্রত থাকিত। এমন কি, তাঁহার রঙ্গরসের ভিতরে জড়িত হইয়া কোন কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তির যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতিও হইত। শুনা যায় ঠাকুদ্দাদা বাল্যকালে একটী অপগণ্ড বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বিবাহের পরে ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার শিশু ভার্য্যাকে ক্রোড়ে লইয়া গ্রামের সর্ব্বত্র ভ্রাতাভগিনীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার স্ত্রীও অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এরূপ রহস্যময় জীবনের অধিকারী যে, রহস্য নিপুণ হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বেহারী ঠাকুদ্দাদার রঙ্গাশক্তির একটী নমুনা দান করিলে বোধ হয় পাঠকবর্গ অসন্তুষ্ট হইবেন না।

পৌষমাসে একদিন প্রাতঃকালে বড় কুজ্ঝটিকা আসিয়াছে। অতি প্রত্যুষে ঠাকুদ্দাদা কম্বলাবৃত হইয়া কানাই বাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে কানাই বাবুর নূতন চাকর জগু, সম্মার্জ্জনী হস্তে গৃহ পরিষ্কার করিতেছিল। সে ঠাকুদ্দাদাকে চিনিত না, তাহাকে দেখিয়া ঠাকুদ্দাদা বলিলেন "দেখ্ জগু, তোর বাবুকে বলিস্ যে, আফিষ যাবার পূর্ব্বে আজকার আহারটী, তিনি যেন বনমালী বাবুর ওখানে করেন। বাবুর নিমন্ত্রণ রহিল, দেখিস্ যেন ভুলিস্ নে।" বলিয়াই ঠাকুদ্দাদা অন্তর্হিত হইলেন। অনতিবিলম্বে গৃহস্বামীর নিকটে নিমন্ত্রণবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইল। বাবুর আর আফিষের তাড়া নাই শুনিয়া, গৃহকর্ত্রী মহাশয়া পুনর্ব্বার লেপ টানিয়া আর এক পসলা নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ঠাকুদ্দাদা মহাশয় বনমালী বাবুর দ্বারদেশে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমাণ অংশুমালী, বৈঠকখানায় বসিয়া মনোনিবেশ সহকারে ভূগোল অভ্যাস করিতেছে। চক্ষুদ্বয় ব্যতীত মস্তকের সর্ব্বাংশ কম্বলে আচ্ছাদিত করিয়া বিকৃতস্বরে ঠাকুদ্দাদা দূর হইতে তাহাকে বলিলেন "দেখ অংশুমালী, আজ কানাই বাবু গুটিকত ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তোমার দাদাও যেন আফি-ষের পূর্ব্বে ওখানে আহারাদি করেন। তুমিও অবশ্য সঙ্গে যাইও। একাগ্রচিত্তে ভূগোলের মানচিত্র দর্শন করিতেছিল বলিয়া ক্ষুদ্র বালক কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া সেই অবগুণ্ঠিত বিকৃতস্বর মনুষ্যটীকে চিনিতে পারিল না। যাহা হউক, ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা ঠাকুরাণী নিমন্ত্রণ বার্ত্তা শুনিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন না।

আমাদের গ্রাম হইতে কলিকাতার আফিষে পৌঁছিতে নৌকা যোগে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। সুতরাং বেলা ৮টা হইতে না হইতে স্নানাদি সমাপন করিয়া, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব নিমন্ত্রণ রাখিবার ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ভ্রাতৃসহ বনমালী বাবুর সহিত কানাই বাবুর সাক্ষাৎ হইল। কানাই বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন "একি বনমালী, চলেছ কোথায়? আমার ভাই, আফিষের

বড় তাড়া জান ত? শীঘ্র করিয়া আমার কাজটা শেষ করে দিতে হবে। বনমালী বাবু শুনিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না; কহিলেন "বাঃ তুমি যে বেশ রহস্য শিখিয়াছ দেখিতেছি। তা বেশ চল চল, আমারও আফিষের সাহেবকে জান ত। আবার ছোট ভাইটী স্কুলে যাবে। আমাদের দুই জনকে কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ছেড়ে দিতে হবে।"

"বেশ রহস্য কাহার হইল? তোমার না আমার? চল ভাই অংশুমালী, বাড়ী চল। তোমার দাদার সহিত রহস্যে পারা যায় না।" এই সকল কথা শুনিয়া অংশুমালী কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কহিল "আমি বাড়ী গিয়া কি করিব?"

বনমালী বলিলেন "ভাই এমন সময় তামাসা করিবার অবকাশ নাই, চল আফিষের বেলা হইতেছে।"

"বাস্তবিক এখন তামাসার সময় নাই। আমি সত্য বলিতেছি, কে এক ব্যক্তি প্রাতঃকালে আমার চাকরের নিকট আমার নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে। আমার বোধ হয়, কেহ আমাদিগকে লইয়া রং করিয়াছে।" "তাহাই হইবে। চল, আর দেরি করিবার সময় নাই।" এই বলিয়া উভয়ে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোন প্রকার আহার দ্রব্য প্রস্তুত না থাকাতে দুগ্ধ, চিড়া, মুড়কী ইত্যাদি দ্বারা কোনরূপে জঠর জ্বালা নিবারণ করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। আপিশে উভয়েই অনেক ভ্রম করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য অনেক গঞ্জনাও সহিতে হইয়াছিল।

অপরাহ্নে মলিন বদনে বনমালী ও কানাই বাবু নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন, ঠাকুদ্দাদা মহাশয় ভাগীরথী তটে পাদচারণ করিতেছেন। ঠাকুদ্দাদার লক্ষ্য অন্যদিকে ছিল, হঠাৎ তাঁহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন "এই যে ভায়ারা, ভাল আছ ত? আজ তোমাদের মুখ শুষ্ক দেখিতেছি কেন? তোমাদের কোন অসুখ হইয়াছে নাকি?" "আজ্ঞে না" এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া উভয়ে ত্বরিত পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ঠাকুদ্দাদা পশ্চাৎ হইতে বলিতে

লাগিলেন ওঃ বুঝিতে পারিয়াছি। তোমরা নিশ্চয়ই আজ পরস্পর বিবাদ করিয়াছ কিন্তু, আর কি তোমাদের বালকের ন্যায় বিবাদ করা ভাল দেখায় ইত্যাদি। এইরূপ রঙ্গ রহস্য বেশ্যরি ঠাকুরদাদার প্রায়ই হইত। কিন্তু তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া কেহই তাঁহার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইতেন না, বরং তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু বাটী আসিয়া দেখেন কানাই বাবুর বাটীস্থ পরিবারবর্গ, তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গমন করিয়াছেন এবং তাঁহাকেও তথায় যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। কানাই বাবু সারাদিনের পরিশ্রম ও অনাহারে ক্লান্ত ছিলেন, সুতরাং আর তথায় না যাইয়া রাগান্বিত কলেবরে ঠাকুরদাদার বাটীতে তাস খেলিতে যাইয়া তথায় আহার ক্রিয়া সমাধান করিলেন। সকলেই বনমালী বাবুর রাগটা কিছু বেশী রকমের জানিত বলিয়া বাটিতে আহারের আয়োজনটাও ভাল রকমের হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

বসন্তের স্মৃতি।

আবার বসন্ত আসিয়াছে। হরিদ্বর্ণ নবীন কিশলয়ের দুকুলে অঙ্গ ঢাকিয়া, নব বিকশিত নানাবিধ ফুলের অলঙ্কারে শরীর সুশোভিত করিয়া, সুন্দর সহকার মঞ্জরীর মুকুট, শিরে ধারণ করিয়া, আবার বসন্তরাজ অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর সেই হাসিভরা লাবণ্য, চারিদিকে হাসি ছড়াইয়া ও আনন্দ বিলাইয়া আনন্দের লহরীতে ধরণীকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে, ফুলে ফুলে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে প্রমত্ত ভ্রমরাকুল, চারু পুষ্পরাজি চুম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে—মন্দানিল হিল্লোলে হরিদ্বর্ণ নব পল্লব সকল, মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে—হরিদ্বর্ণ পত্রক্রোড়ে বিবিধ বর্ণের কুসুমরাজি থরে থরে ফুটিয়াছে—যেন "উজ্জলে মধুরে মিশিয়াছে"। তরুগণের উপর পুষ্পরাজির মৃদুল নৃত্য, মলয়-মারুতে বিভোর তরু লতার আত্মহারা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। ফুলকুলের সহিত অলিকুলের এই হৃদয় ভরা প্রেম গুঞ্জন্। আর সর্ব্বোপরি এই সুমধুর রসের উচ্ছ্বাস এবং প্রকৃতির অনন্ত মাধুর্য্যপূর্ণ সোহাগভরা হাসি

বসন্ত আসিল। সন্ধ্যা কালের ধীর মৃদু সমীরণের মতন, ঘুমন্ত সুন্দরীর মোহমন্ত্র মাখা সুকোমল অস্ফুট হাসির মতন, কত দিনের হারান সুখের স্মৃতির মৃত স্বপ্নপদ সঞ্চারণে বসন্ত এক এক বার আসিয়া আবার কি ভাবিয়া কোথা চলিয়া যায়? জগৎ মহাগৃহের—চারি দিকে—আজ কি মত্ততার তরঙ্গ! কি গীত উচ্ছ্বাস!! আজ যেন প্রকৃতির নবীন বেশ! চারি দিক হইতে কেমন এক নূতন কল্পনা—নূতন দীপ্তি, নূতন জীবনের মধুর আনন্দময় কনক কিরণ ফুটিয়া উঠিতেছে। জগৎ ব্যাপিয়া আজ কি সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি! আজ জ্যোৎস্না-ময়ী রজনীর কি সৌন্দর্য্য! রজনী আজ সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী!! নিশীথের বিমল জ্যোৎস্নায় আজ জগৎ প্লাবিত—তরু লতাদি পুলকে শিহরিত! অনন্ত সিন্ধু মৃদু উদ্বেলিত! সৌন্দর্য্যের এত ছড়াছড়ি আর কখনও দেখি নাই—মরি মরি প্রকৃতির কি নীরব প্রাণস্পর্শী ললিত গান!! হায়! বসন্ত আবার আসিয়াছে—কিন্তু জীবনের বসন্ত কোথায়? সে যে অনেকদিন ফুরাইয়াছে। সে ফুল অনেকদিন ঝরিয়া গিয়াছে,—সুখের বাঁশী অনেকদিন নীরব হইয়া গিয়াছে! এই বসন্তই আমার সুখের গৃহ ভাঙ্গিয়াছে। হায়! এ জগতের সবই কি মুহূর্ত্তে স্বপ্ন! জ্যোৎস্না! তুমিও কি ঘুমন্ত প্রকৃতির মোহময় স্বপ্ন! মনে পড়ে, কবে একদিন ঠিক এইরূপ জ্যোৎস্না প্লাবিত নিশিথে, কোথা একটী মধুর আবেশময়ী হাঁসি দেখিয়াছিলাম, সেই হাঁসির ভিতরেই যেন আমার হৃদয়ের কাহিনী লেখা ছিল! কেমন করিয়া বলিব সে কাহিনী কি? আজ এই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ছাদের উপর একাকী বসিয়া, জ্যোৎস্না-প্লাবিত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া আছি। এই নিশীথ জ্যোৎস্না, হৃদয়ে কত শত স্মৃতির ফুল ফুটাইতেছে। জ্যোৎস্না! আর কেন তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া দাড়াও? আর কেন হৃদয়ের অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দাও?

হায়! সেই বসন্ত, আর এই বসন্ত! সেবারও তুমি এমনি ভাবে মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিলে, দেখিতে দেখিতে কত ফুল ফুটাইয়া আবার কত ফুল চিরদিনের মত ঝরাইয়া, কত বসন্ত মুকুলের

অশ্রুবারি চিরদিনের মত সৃজন করিয়া, কত গৃহে আনন্দ-বাঁশীর তান তুলিয়া জগতের চক্ষের উপর দিয়া, অতিক্ষীণ পদ বিক্ষেপে বিরহিনীর স্বপ্নজাত উদাস ছায়াময় মৃদু চকিত হাসির ন্যায়, অসীম অতীতগর্ভে মিশাইয়া গেলে—দেখিতে দেখিতে আজ আর এক বৎসর, সেই হইতে হৃদয়াকাশ মেঘাচ্ছন্ন—শূন্য। আশার আলোক নির্ব্বাপিত, হায়! কে বলে জীবন সুখের? এক বৎসর পূর্ব্বে যে,জীবনাকাশ উজ্জ্বল করতঃ শত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া হাসিত, আজ সে কোথায় গেল? হায়! সেই বসন্তের গোলাপ, আমার এই শূন্য প্রাণে, কত নূতন স্বপ্ন, কত নূতন সৌন্দর্য্য,কত নূতন গান,কত নূতন কবিতা সৃজন করিত,আমার এই যত্ন শূন্য,ফলপুষ্পহীন হৃদয় কাননে সে সৌরভময় কুসুম কেন ঝরিয়া গেল?

হায়! আমার সেই সাধের বিলাস ভবন, কৌমুদীকরে হাসিতেছে! এ হাসি, যেন শূন্যহৃদয়ের—মৃতের অবসাদময় ম্লান হাঁসি—এ হাঁসিতে সে যৌবনের সৌন্দর্য্য, সে হৃদয়োন্মত্তকারী ভাব কোথা? সন্ধ্যার এই শান্তিপ্রদ স্তব্ধতার শিথিল কোলে বসিয়া এই গৃহ আজ কি ভাবিতেছে? এই গৃহই কি সেই শত হাঁসি জ্যোৎস্নারূপ মধুর শোভার কেন্দ্রভূমি? হায়! এই গৃহে সেই প্রাণোন্মাদকারী হাঁসির হিল্লোল কোথায়? সেই লাজমাখা মধুর অস্ফুট স্বর আর শুনিতে পাইনা কেন? অস্ফুট গোলাপের মত, অবগুণ্ঠনাবৃতা সে লাজময়ী ভুবন মোহিনীমূর্ত্তি কোথা? গভীর অনন্ত সাগর-সদৃশ সে অতলস্পর্শ প্রণয় কোথায়? দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায়, সে আবেশময়ী হৃদয়ের উচ্ছাস—অনন্ত তৃষ্ণা মিটান মধুর স্বপ্নময় নিশি—সেই জীবন্ময় বসন্ত কোথায় গেল? ওঃ! এখন তাহার সমাধি!!

যে একদিন এই অন্ধকারময় গৃহ আলো করিয়াছিল, যে এক দিন এই গৃহ নাট্যমন্দিরে কত সুখ—দুঃখ, ক্ষুদ্র জীবন নাটকের কত বিরহ—মিলনের অভিনয় দেখাইয়া আমাকে চিরদিনের মত মুগ্ধ করিত —যে সন্ধ্যা তারার মত এই কোলাহল শূন্য গভীর শান্তিপূর্ণ গৃহাকাশে প্রতিদিন জ্বলিত, যে কত গভীর চিরস্বপ্ন ছবিময়-মনোহর-জ্যোৎস্না-নিশিথে দূরাগত বাঁশীর তানের মতন প্রাণে প্রাণে মিশিয়া

আমার হৃদয়ান্তঃপুরে কত প্রেম গীতি ঢালিত—হায়! যে অনন্ত অন্ধকারের বিমলরশ্মি; অসীম শূন্যতার চিরপূর্ণতা ও চিরবিরহের মিলন ছবি ছিল সে আমার কোথায় গেল? যে বসন্তের ফুলটী কতদিনের আশা কিরণে, কত যত্নের স্নেহ সলিলে, কত সৌন্দর্য্যের সমাবেশে গঠিত হইয়াছিল, যাহা আমার নয়ন মন মুগ্ধ করতঃ ত্রিভুবন আলো করিয়া ফুটিয়াছিল, সে ফুল আজ কোথায় গেল—কোথায় সে? তাহাকে কত স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছি; কই তাহাকেত পাই নাই। শারদীয় পৌর্ণমাসীর বিমলরজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে খুঁজিয়াছি, কল্লোলিনীর বিষাদ-তরঙ্গায়িত-শোকগীতির মধ্যে খুঁজিয়াছি, কৌমুদী-সমুদ্রমগ্ন, অনন্ত-নিশীথাকাশের মধুর সরলতার মধ্যে তাহাকে কত খুঁজিয়াছি, কই তাহাকেত পাইনাই। জগতের সৌন্দর্য্য পরমাণুর—সার বিনিময়ে সেই শারদ-জ্যোৎস্না-স্নাত-ফুলের হাঁসির মতন যে দেব নিন্দিত তনু সৃজিত হইয়াছিল, হায় সে কোথায় গেল?

হায়! তাহাকে আর পাইলাম না। সেই বসন্তের বাতাস, সেই প্রাণোন্মত্তকারী সঙ্গীত—আর ইহজন্মে শুনিলাম না। আমার গৃহ-সরোবরে যাহার নয়ন-কিরণ পতিত হইয়া, প্রতিদিন হৃদয়ে শত শত আশার রামধনু ফুটাইত, সে কোথায় গেল? সে কি তবে একেবারেই চলিয়া গিয়াছে? এই অনন্ত বিশ্বের কোন স্থানেও কি তাহার একটীও পরমাণু নাই! হায়! সে কি তবে বিশ্বের কিছুই নয়—কেবল মাত্র একটা স্বপ্ন!

হায় সে কেন গেল? এখানে তাহার কিসের অভাব হইয়াছিল। জগৎ পারাবারে কি তাহার মত নলিনীর স্থান ছিল না? কঠিন জগতের মাটী কি তাহার প্রতি পদক্ষেপে পায়ে বাজিত! প্রখর সংসারের উত্তাপ কি সে সহ্য করিতে পারিল না, তাই সে শুকাইয়া গেল! হায়! কত দিন ধরিয়া, কত চেষ্টা করিয়া একটী ফুল ফোটে। সে ফুল প্রকৃতির কত আদরের সামগ্রী! সেই মানুষফুল কি বৃথা ফোটে! তাহার ফোটার কি কোন উদ্দেশ্য, কোন অর্থ নাই? তাই সে নীরবে ঝরিয়া যায়! বিশ্বের এ অনন্ত নিয়ম কে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে?

আর যদি সে যায় ত তাহার স্মৃতি যায় না কেন, হৃদয় দগ্ধ করিতে সে স্মৃতি থাকে কেন ?

সে গেছে ত স্মৃতি থাকে কেন ? যবনিকা পড়িল ত একবারেই পড়িল না কেন ? এ চির-বিরহের মাঝেও সে স্মৃতির মিলন ঘুচে না, বিরহ যন্ত্রণার মধ্যেও যেন মিলনের অভিশাপ ! সে যখন ম্লানমুখে ছলছল নেত্রে নদীতীরে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া থাকিত—ঐ সুনীল অনন্তক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জের ম্লান হাস্যময় শোভা দেখিতে দেখিতে আপনাকে কোথায় হারাইয়া ফেলিত, তখন কেন এ দীর্ঘনিশ্বাস ছিল না ! জন্মের মধ্যে একবারও সে গভীর বদনে-উচ্ছ্বাস অনুভব করিতে পারিল না,তাহা হইলে আজ ঐখানে—ঐ পুণ্য লোকে বসিয়া সেই স্মৃতির আকুলি-ব্যাকুলি অনুভব করিতে পারিত।

সে আর নাই। যে যায় সে আর কি থাকে ! লতাকুঞ্জে বসিয়া প্রতিদিন সে আনমনে মালা গাঁথিত, কিন্তু তাহার মালাগাঁথা কখনও শেষ হইল না, উষা আসিয়া সেখানে এখনও চঞ্চলনেত্রে চাহিয়া থাকে, শ্যামল নবীন কিশলয় গুলির মধ্যে কোন নিশ্বাসরুদ্ধ ভাষা শুনিতে গিয়া যেন চমকিত হইয়া উঠে !

বকুল ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া লতাকুঞ্জের সম্মুখে স্তুপাকার হইয়াছে, উষা সেই ঝরা ফুলের উপর দিয়া নীরবে পা টিপিয়া চলিয়া যায়। উষার মস্তকে কেশ গুচ্ছে, বাহুপরি আরও বকুল ঝরিয়া পড়ে। যেখানে সে বসিত, হায় ! সেখানে সে আর বসে না ! সন্ধ্যা একবার আকুল হৃদয়ে লতাকুঞ্জে আসিয়া বসে, ঝরা ফুলগুলি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে, কিন্তু সন্ধ্যা আর থাকিতে পারে না,তাহার পরাণ বুঝি কেমন করিয়া উঠে—সে ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। সারা নিশি উন্মত্ত পবনই শুধু সেখানে হাহাকার করিয়া বেড়ায়,লতাকুঞ্জ শিহরিয়া উঠে ও বকুল ঝরিতে থাকে,সেখানে আর জনপ্রাণীর সমাগম নাই। একদিন গিয়াছে, তখন ঐ লতাকুঞ্জের বিরলে বসিয়া মধ্যাহ্নের পাখী হৃদয় ঢালিয়া দিত। সে উদাস সুরে কি গান গাহিত জানি না, কিন্তু যাহা গাহিত তাহা বুঝি মধ্যাহ্নের হৃদয় হইতে। তখন ঐ লতাকুঞ্জে কে একজন আসিয়া বসিত, সেখানে উষাও

আসিত সন্ধ্যাও আসিত.কুঞ্জ যেন পূর্ণ ছিল। হায় ! সে বুঝি আর নাই তাই বুঝি এ শ্মশান নিস্তব্ধতা। হায় ! সে দিনও ত আমরা দুইজনে যেন স্বর্গীয় দুইটী প্রাণ ! প্রেমের বিমল রসে উচ্ছলিত, তখন হৃদয়ে কতই না আনন্দ। সুখ আর ধরে না, দেখিলাম আমার আশা সুবর্ণবৃক্ষে প্রমোদের ফুলরাশি ফুটিয়াছে। তোমার জগতের আকাশে একচাঁদ,আর আমার হৃদয়াকাশ শত শত চাঁদে আলোকিত ! আ মরি মরি, সেকি পুষ্পময়, চাঁদময়,নির্ম্মল বিভোর সুখ ! তখন আমার,সে জীবন,সে নিদ্রা, সে স্বপ্ন সকলই যেন চাঁদময়। সেই স্বপ্ন মাখা ঘুম ঘোরময় গীতিপূর্ণ,শত চাঁদময়—জীবন ইহ জন্মে কি আর ভুলিতে পারিব, সে কি ভোলা যায় ! তখন মনে হইত ? কে যেন স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া আমায় সুললিত গীতে আহ্বান করিতেছে। তখন যেন কি এক রাগিণীময় স্বর্গীয় কাব্যের অস্পষ্ট স্মৃতি সমীরণ আনিত। যেন আমার জীবন বসন্তের সাধের উপত্যকার সৌরভময় সৈকত দিয়া কি একটী স্বপ্নপ্রবাহিনী, অতি ধীরে ধীরে দুরাগত সঙ্গীতের মত বহিয়া যাইত। হায় ! তখন আমি নিশীথ জ্যোৎস্নায়, কোকিলের কুজনে, কুসুম রাশির মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইতাম। দেখিয়া আর সাধ মিটিত না। সেই গোলাব বিনিন্দিত মুখ, আর সেই অনাবৃত চির বসন্ত, গান ও স্বপ্নময় হৃদয় মুকুলের উপরকার দুইখানি সুগোল জ্যোৎস্নাময় হাত, আজও আমার নয়নে ভাসিতেছে।

তখন জ্যোৎস্নালোকে ছাদের উপর বসিয়া বসিয়া, কে জানে, যেন কাহার মুখ মনে পড়িত, তখন নিশীথ অন্ধকারে নদী সৈকতে দাঁড়াইয়া কল্লোলিনীর মৃদুতরঙ্গলীলার মধ্যে কি যেন গান শুনিতাম! সে গান যেন কাহার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি ! তখন কুসুম হাসির দর্পনের মধ্যে স্বর্গের ছায়া দেখিতাম। তখন চন্দ্রালোক শোভিত নীল শৈল-মালার শিখর দেশে স্বপন শিশুর খেলা দেখিতাম—পর্ব্বতের পাদস্থিত শুভ্র হ্রদয়ের প্রসন্ন সলিলে হাস্যময়ী ছায়া দেখিতাম। তার পর এক দিন অকস্মাৎ কোথাকার কোন এক ঘটনাফলে, অদৃষ্ট আকাশ হইতে কি এক ঝড় আসিয়া ; এ জীবন কাননের কত সাধের বৃক্ষের আশা

কুসুমগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃক্ষগুলি উন্মূলিত করিয়া কালের পৃষ্ঠে একটী চিহ্ন রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেল—হৃদপিণ্ড উৎপাটন করিয়া চিতার ইন্ধন সাজাইলাম। সেই অবধি হাঁসির ফুলহার আর আমার নয়ন নদীতে ভাসে না,আমার ঐই ক্ষুদ্র হৃদয় দ্বীপের চারিদিকে আর সে আনন্দের লহরী লীলা দেখিতে পাই না। যে অসংখ্য সোহাগ ফুল আমার আশা গৃহের আশে পাশে প্রতিদিন ফুটিত এখন কেন আর তেমনি ফোটে না? জগতের পথে সকলেই চলিতেছে আমি স্বধু দাঁড়াইয়া কেন? এত যত্ন,এত সাধ,এত চিন্তা,এত ভালবাসা কি সকলই মিথ্যা? যাহা একবার—একবার অন্ধকারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা কি আর এ জীবনে সমস্ত আলো দিয়া সারিতে পারিব না? এ জগতে চারিদিকেত পড়িতেছে—ভাসিতেছে আবার ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে— ফুল ঝরিয়া যায় আবার ফোটে, সূর্য্য অস্ত যায়, আবার উঠে, বসন্ত যায়, আবার আসে এইরূপে জগতের সকল পদার্থই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু আমার এ মুহূর্ত্তের,জীবন একসূত্রবাহী কেন! যে নিয়মে ফুল ফুটে পাখী গায়, আমি কি সে নিয়মের বাহিরে? নহিলে কবিত্বের আলয়, সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ মানব জীবনে,প্রীতির চিরস্বাস্থ্যময় কনক কিরণ ফুটিয়া উঠে না কেন? জীবনাকাশে স্নেহের পূর্ণচন্দ্র উঠে না কেন?

হায়! সে দিন যখন আমরা লতাকুঞ্জতলে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম,তখন দুই ফোঁটা মরমের অশ্রুজল পরস্পরের সমস্ত সুখ—দুঃখ, আশা—নিরাশা—হর্ষ—বিষাদ ও শোকের বন্ধন দৃঢ় করিয়া বাঁধিতেছিল,সে দিনকার কত প্রেম সম্ভাষণ,কত অব্যক্ত আধ বিকসিত অধর মিলন,কত লুকান কথা—কত মরম বেদনা—ধীরে ধীরে সেই চির বিকসিত পল্লব রাশির শ্যামল যৌবনে ছায়া রাখিয়া দুজনার হৃদয় কুটিরে সুখের সংসার পাতিয়া বসিয়াছিল, সে মৃদু—শীতল সমীরণ স্পর্শে সেই শ্যামল যৌবনাচ্ছন্ন হৃদয় মিলনে,সে দিন পরস্পরের মধ্যে যে আশাবন্ধন সংঘটিত হইয়াছিল তাহা সেই সেদিনকার তিমিরবসনা রজনীর শ্মশান ক্ষেত্রে, সেই জ্বালাময় মুহূর্ত্তে সম্মুখস্থ ভবিষ্যত অন্ধকারের মহানৈরাশ্যে নির্ব্বাপিত চিতানলের মত; অবশিষ্ট ভস্মস্তূপমাত্র পড়িয়া আছে।

সেই ভয়ঙ্করদিনের সেই যামিনী সুগভীর নীরবতায় মুগ্ধ হইয়া জগৎ ঘুমাইতেছে। অসীম আকাশে অসীম অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া দু একটি ক্ষীণ দীপালোকের ঔজ্জ্বল্য মাত্র প্রকাশ করিতেছে। নীলিমার কনক-উপকূলে মহাসাগরের উচ্ছ্বসিত জলরাশি সেই তিমির বসনা যামিনীর অন্ধকার কেশগুচ্ছের মধ্যে, মহোল্লাসে তরঙ্গোৎসব করিতেছে জলরাশি উঠিতেছে পড়িতেছে—ভীত বেলাভূমি সঙ্কোচিতভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সেই দিন, সেই রজনীতে দুইজনের সমাধি রচিত হইল।

আর না—আর ভাবিতে পারি না! স্মৃতির আগুন কতকাল আর হৃদয়ে জ্বালিয়া রাখিব। সেই অতীত সুখস্মৃতি আমার হৃদয়ের পরতে পরতে দগ্ধ করিতেছে। হায়! কতদিনে আমার এ দুখের স্মৃতি যাইবে?

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত।

প্রটোপ্ল্যাস্‌ম্।

উদ্ভিদ শরীর মধ্যে প্রটোপ্ল্যাস্‌ম্ নামে একটি আদর্শ পদার্থ আছে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত জার্ম্মাণ উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ ভন হিউগো মোল (von hugo mole) কর্ত্তৃক এই শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং জীবিত বৃক্ষাদির শরীর মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম ছিদ্র (cell) মধ্যে যে স্বচ্ছ, কোমল ও ঘন তরল পদার্থ আছে তাহার নির্দ্দেশার্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার যথার্থ আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন। ইহাঁর পর্য্যালোচনার ফল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সকলের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, এই ছিদ্র বেষ্টিত প্রাচীর—যে প্রাচীর ছিদ্রাভ্যন্তরস্থিত পদার্থ শুষ্ক হইয়া গেলেও বর্ত্তমান থাকে, তাহাই সেই ছিদ্রের সার পদার্থ এবং এই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানকেই সূক্ষ্ম ছিদ্র বা সেল্ (cell) নামে অভিধান করা হইত। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদর্শী রবার্ট্ হুক্ (Robert Hooke) ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই ছিদ্র বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ এবং সেই বায়ু, ভিন্ন ভিন্ন

ছিদ্র মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ। মোল সাহেব উক্ত মত খণ্ডণ করতঃ বলেন যে, এই ছিদ্রাভ্যন্তরস্থিত প্রটোপ্ল্যাসম্ আবশ্যকীয় পদার্থ এবং ইহারই সাহায্যে অপরাপর ছিদ্রের প্রটোপ্লাসম জন্মিয়া থাকে, এবং ইহারই সাহায্যে ছিদ্রের প্রাচীর উদ্ভূত হয়। অধুনা অনেক অনুসন্ধানের ফলে, মোল সাহেবের মতই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে এবং বস্তুতঃ দেখা যায় যে ফার্ণ, মস (Fern, moss.) বা শৈবাল প্রভৃতি অন্যান্য তজ্জাতীয় পুষ্পহীন গুল্ম বা উদ্ভিদে উক্ত অত্যাবশ্যকীয় ছিদ্র মধ্যে কিছু দিন বিনা প্রাচীরে কেবল মাত্র প্রটোপ্লাসম্ অবস্থান করে।

যে কোন গাছেরই নূতন ও বর্দ্ধনোম্মুখ শিকড়ের শেষাংশ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে,উক্ত প্রাচীর বেষ্টিত স্থানমাত্রেই প্রথমাবস্থায় প্রটোপ্ল্যাসম্ নামক পদার্থে পূর্ণ থাকে। এই প্রটোপ্ল্যাসম্ নামিক পদার্থ কোন স্থানে ঘন এবং গোল বা ডিম্বাকারে থাকিয়া ক্রমশঃ স্থানাধিকার করিতে থাকে। আকার বিশিষ্ট সকল পদার্থেরই সীমা আছে, সুতরাং অপর প্রটোপ্ল্যাসম্‌ও এইরূপে বিস্তৃতান্তর পরস্পর সংলগ্ন হইয়া একত্রে মিশিয়া না গিয়া, সীমায় সীমায় আপনা হইতে প্রাচীর উৎপন্ন হয়। উপরে যে আকার বিশিষ্ট প্রটোপ্ল্যাসমের কথা বলা গেল, উহাকে neecless কহে। এই সকল প্রটোপ্ল্যাসম্ একত্র সংলগ্ন হইয়া প্রাচীর উৎপন্ন হয় এবং তাহার মধ্যে মধ্যে যে শূন্য স্থান থাকে, তাহা অপর প্রাচীরের পার্শ্বস্থিত শূন্য স্থানে সম্মিলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র জন্মে, ক্রমে তাহাও প্রটোপ্ল্যাসম্ বা রসে পূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে প্রটোপ্ল্যাসম্ কর্ত্তৃক রস গৃহের প্রাচীর উৎপন্ন হয়। কোন একটী গাছ কাটিলে তাহাতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায় তাহাই রসগৃহ বা সেল্। জীবিত অর্থাৎ রসপূর্ণ একটী রস-গৃহকে বিশুদ্ধ গ্লিসারিন (glycerine) বা এলকোহল্ (alcohole) মধ্যে নিক্ষেপ করিলে রসগৃহ মধ্য হইতে সমুদায় রস বাহির হইয়া আইসে এবং প্রাচীরও প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এইরূপে গাছের রস বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহার উপরিভাগের আবরণ, অভ্যন্তরস্থিত পদার্থ অপেক্ষা স্বচ্ছ ও দানা-যুক্ত এবং ভিতরের পদার্থের ইহা একটি স্বতন্ত্র আবরণ বলিয়া

মনে হয়। এই বাহ্য-পদার্থকে (Ectoplasm) কহে। বাহ্যাবরণের মধ্যস্থিত পদার্থকে (Endoplasm) কহে এবং ইহা বাহ্য পদার্থ হইতে অপেক্ষাকৃত দানা বিশিষ্ট এবং উদ্ভিদের শিরা পোষণোপযোগী নানা পদার্থে পূর্ণ।

সজীব প্রটোপ্ল্যাস্‌ম্ নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এবং সর্ব্বদা নূতন আহারীয় ও অবয়ব বা ফল প্রসবকারী নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিতে এক দিকে যেমন যত্নশীল অন্যদিকে, যে সকল পদার্থের কার্য্য শেষ হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিতেও তদ্রূপ যত্নশীল। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, যে সূক্ষ্ম পদার্থে প্রটোপ্ল্যাস্‌ম্ পদার্থের উৎপত্তি, তৎসমুদায়ই নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ইহাদিগের কার্য্য বা গতি, অতি মন্দ এবং সেই সকল পদার্থ এতই সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও তাহা অনুধাবন করা সুকঠিন; কিন্তু অধিকাংশ ছিদ্রে প্রটোপ্ল্যাস্‌ম্ সর্ব্বদা রসগৃহ (সেল্) মধ্যে পরিভ্রমণ করে।

প্রটোপ্লাসমের রাসায়নিক সংগঠন অতি জটিল। যে সকল পদার্থে ইহার উৎপত্তি বা যে সমুদায় পদার্থ ইহাতে অবস্থিত তাহা ডিম্ব মধ্যস্থিত শ্বেত পদার্থের (এলবুমেন্) অন্তর্গত। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের মধ্যে এই পদার্থের বিশেষ সামঞ্জস্য দেখা যায়। আইয়োডিন সলিউশনে প্রোটোপ্ল্যাসম্ নিক্ষেপ করিলে, ইহার বর্ণ হরিদ্রাভ হইয়া যায়। মেজেণ্টা প্রভৃতি রং মৃত প্রটোপ্ল্যাস্‌মে সংযুক্ত করিলে ইহা সহজে সেই বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু জীবিত প্রটোপ্ল্যাস্‌ম্ সহজে সেরূপ হয় না। রসগৃহসকলের গঠন প্রণালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিতে হইলে প্রটোপ্লাসমের সহিত ক্ষীণ সলিউসন্ অব্ কষ্টীক্ পটাস্ মিশ্রিত করিতে হয়। এরূপ করিলে শীঘ্রই প্রটোপ্লাসমের জড়তা ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহা তরল হইয়া পড়ে এবং তখন পরীক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

মনুষ্য ও মনুষ্যত্ব।

লীলাময় ভগবান্ অনাদিকারণের লীলায় কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য। চিন্ময় পরম পুরুষ স্বয়ং নির্গুণ অনাদি অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও লীলা প্রস্ফুটনমানসে ইচ্ছাময় জগন্নিবাস—শ্রীনিবাস. স্বকীয় সচ্চিদানন্দ ঘন পদার্থকে ত্রিগুনাত্মক করিয়া ত্রৈগুণ্য জগৎ প্রকাশ করিলেন;— সত্বাদি গুণত্রয়ের সংমিশ্রনেই চিদানন্দন ঘন আত্ম-বিশ্লেষণ করিলেন; বিশ্বনাথের রঙ্গভূমি বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইল। প্রকাণ্ড মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কীটাণু,নদ,নদী,ভূধর,কন্দর,তরু, গুল্ম, যখন যাহা নয়ন গোচর হয় সমস্তই লীলারসাভিজ্ঞ ভগবান ভূতবানের লীলো-পকরণ। বাঙ্মনোতীত নিত্য-শুদ্ধ জগন্নাথ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়-জগতের বহিরাভ্যন্তরে স্বরূপসত্বাবিকাশ করিয়া, লীলা রসাস্বাদনে নিয়ত নিরত। আহা! সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বীয় সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া অলোকসামান্যা মুনিমনমোহিনী সর্ব্বাঙ্গভূষিতা প্রকৃতি সুন্দরীকে, কি লোক লোচনানন্দ-দায়িনী করিয়া সাজাইয়াছেন? স্বকীয় রূপময়ূখমালায় সুহাসিনী প্রকৃতি কুমারীর অম্বুজাননদ্যুতি উন্মেষ করিতে গিয়াই, পরম-রূপবাণ, পরম-ব্রহ্ম স্বীয় রূপ হারাইয়া ফেলিলেন; তাই অরূপ সাজিয়া অপরূপ রূপময়ী প্রকৃতির অঞ্চলান্তরালে আত্মসম্বরণ করিয়া লীলা রসামোদে প্রকৃতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ রঙ্গ ভঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। এমন মূঢ় কে আছে যে প্রকৃতির মনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াও পরম পিতার পরমানন্দদায়ী মূর্ত্তির অস্তিত্বে সন্দেহ করে? হায়; যে করুণাময় জগজ্জীবন লীলা দায়ে, জগতের দায়ে আত্মরূপ হারাইয়া, রূপময়ীর পশ্চাতে লুকাইয় আছেন,যে সন্ময় পুরুষের সত্বাবলম্বনে পাদপ রাজি ফলভরে নমিত হইয় লোচনান্দবিধান করিতেছে; নবকিশলয় পরিশোভিত-সঞ্চারিণী লতিক কুসুমদাম বিভূষিতা হইয়া বায়ুভরে নিতম্বিনীর ন্যায়, ধীর মন্দ সঞ্চালি হইতেছে; স্ফীতাবয়বা-কল্লোলিনী-স্রোতস্বিনী যে পরমাত্মসৎ ক লাভ করিয়া সাগরোদ্দেশে বহিয়া যাইতেছে; যে সত্বাসংশ্রয়ে গিরিব ব্যোমপথ ভেদ করিয়া উচ্চ চূড়া উচ্চে তুলিয়া বীরপুরুষের ন্যা

দণ্ডায়মান; যে সত্বাবলে সোমসূর্য্যাদি গ্রহোপ গ্রহ নিকর, অত্যুজ্জ্বল হীরক সদৃশ গগনপথে সুসজ্জিত; যিনি স্বীয় সত্বা রূপ বিস্তার করিয়া সলিল ও অনিলরূপে বিশ্ব হিতসাধনে তৎপর, তাঁহার আবার রূপের অভাব? তবে তুমি আমি অন্ধ, সুতরাং বিশ্বনাথের বিশ্ব-বিমোহনরূপ নিরীক্ষণ করিতে পারি না।

ইহ জগতে তরুলতা, গিরিনদী, প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর ও কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি জঙ্গম—এই পদার্থদ্বয় প্রকৃতির দুই অঙ্গ ইহারা উভয়েই স্ব স্ব রূপলাবণ্যে অতুলনীয়, কোন্ অঙ্গই কোন অঙ্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নহে। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মার কি অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি কৌশল! কি অপূর্ব্ব চাতুর্য্য বিস্তার করিয়া তিনি চরাচরসৃষ্টি করিয়াছেন! প্রকৃতির এই অনন্তকোটী স্থাবর জঙ্গমময় লাবণ্যোপাদানের প্রত্যেক অণুকণাটী পর্য্যন্ত পরম সুন্দর। সুন্দরীকে সুন্দরবেশে সাজাইতে হইলে যে সুন্দর আভরণের আবশ্যক, তাহা যিনি স্বয়ং সুন্দর তিনিই বুঝিতে পারেন। অপরূপ সুন্দর—স্বয়ং সুন্দর বলিয়া প্রকৃতি এত সুন্দরী ও প্রকৃতির আভরণের ও এত কারু কার্য্য; পাখীর পাখায়, শাখীর শাখায়, ভূস্তরে-প্রস্তরে কাননে-কান্তারে, ভূধরে, কন্দরে যখন যাহা নয়ন পথে পতিত হয় তাহাতেই জগন্নির্ম্মাতার অলৌকিক কারুকার্য্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে থাকে;—কি নিদাঘের রবি-কিরণ, কি মন্দ-সলিল-পঙ্কিল হ্রদ তড়াগ নিচয়, কি আতপ-তাপ-সন্তপ্ত পাদপরাজি, কি প্রাবৃটের সুনীল-নীল-সলিল-সম্ভূত-জলধর-পটল, কি লাবণ্যময়ী বিজুলতা, কি প্রবল প্রভঞ্জন, কি মূষলধারবর্ষণ, কি বসন্তের নবকিশলয় সুশোভিত তরু গুল্ম-লতা-নিকর, যখন যাহা দেখি—তখন তাহাই পরম সুন্দর, তাহাই সেই অনন্ত লাবণ্য ভাণ্ডারের প্রোজ্জ্বল মণিকাঞ্চন। সেই মনোমোহনাঙ্গ বিভাত্যুত এই নৈসর্গিক চিত্র অবলোকন করিয়া, স্থির-নেত্রে-ধীরচিত্তে মনঃ প্রাণ একত্র সংযত করিয়া অনাদি ব্রহ্মবস্তুর বিমল-বিভা-বিশ্বোদ্ভাসিত দিব্যচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ হৃদয়বানের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার না হয়? (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বি, এ।

পেটেণ্ট ঔষধ।

ওয়ার্বর্গস্ ফিবার টিংচর। ল্যান্সেট্ নামক পত্রিকায় (ii/75, 716) ওয়ার্বর্গ সাহেবের কৃত জ্বরারিষ্ট,, নামক ঔষধের নিম্ন লিখিত রূপ গুণা-গুণ ও প্রস্তুত প্রণালী লিখিত হইয়াছে। এই অরিষ্ট, প্রুফ (পরিষ্কৃত সুরা) স্পিরিট্ দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং ইহার ৫০ ভাগে ১ ভাগ সলফেট্ অব্ কুইনাইন, সকট্রাইন্ এলোজ (সকট্রা-মুসব্বর) ৪০ ভাগে ১ ভাগ, অহিফেন ৪০০০ ভাগে ১ ভাগ. রূবার্ব্ অর্থাৎ রেউচিনি ১২৫ ভাগে ১ ভাগ এবং কর্পূর ৫০০ ভাগে ১ ভাগ মাত্র আছে। ওয়ার্বর্গ্ ফিবার টিঞ্চারের মধ্যে অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং আবশ্যকানুযায়ী মুসব্বর বাদ দিতেও পারা যায়। মাত্রা ১ হইতে ৪ ড্র্যাম পর্য্যন্ত। আবশ্যক হইলে ইহার অধিক মাত্রায়ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় কম্প ও ম্যালেরিয়া জ্বরের ইহা মহৌষধ বিশেষ। ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ২।১ বার ব্যব-হারেই উত্তম দাস্ত পরিষ্কার হইবে। দাস্তের পর ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে কোন প্রকার গুরুপথ্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। ইউরোপে এই ঔষ-ধের বিশেষ সমাদর দৃষ্ট হয় এবং তদ্দেশ বাসীগণ দাস্তের ৪।৫ ঘণ্টা পরে কিঞ্চিৎ বিফ টি ও ব্রাণ্ডি সেবন ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

রহস্য।

বেশ আছে।

উলোয় জ্বরে মহামারীর সময় স্থানীয় কোন পসারহীন চিকিৎসক শুনিলেন যে, তাঁহাকে অমুকের বাটী যাইতে হইবে। রোগীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, রোগী লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। আহুত চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন এরূপ লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিবার কারণ কি? পীড়িতের আত্মীয় বলিলেন ওর বড় শীত করিয়া কাল রাত হইতে জ্বর আসিয়াছে। সারা রাত্র নিদ্রা হয় নাই, তাহার উপর

আবার জ্বর আসিয়াছে। রোগীর কষ্ট হইবে বলিয়া, চিকিৎসক প্রবর লেপের মধ্যে হাত দিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, রোগীর সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গিয়াছে, ধাত নাই। তখন চিকিৎসক মহাশয় ভাবিলেন—রোগীটি মরিয়া গিয়াছে একথা বলিলে আত্মীয়গণ ক্রন্দনে প্রবৃত্ত হইবেন, মধ্যে হইতে আমা বেচারির এত খানি পথ হাঁটাই সার হইবে (কারণ রোগী মরিয়া গেলে দর্শনী চাহিবার সুবিধা হয় না)। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "রোগী বেশ আছে" কোন ভয় নাই—এখন একটু ঘুমুচ্চে, ওকে ডেকনা, একটু ঘুমুলে ভাল বই মন্দ নয়, আর, তোমরা এখানে গোলমাল করিওনা। এখন আমার ভিজিট আর ঔষধের কিছু মূল্য দাও ১ শিশি ঔষধ দিব, খেলেই সব সেরে যাবে। রোগীর আত্মীয় পক্ষ চিকিৎসকের দর্শনী এবং ঔষধ আনিবার জন্য এক জন লোক দিলেন। চিকিৎসক বাটী আসিয়া এক শিশি "মৃত্যুসঞ্জিবনী" ঔষধ দিয়া ঔষধবাহককে বলিয়া দিলেন দেখ "যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী ঘুমাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঔষধ খাওয়াইবে না আর রোগীর ঘরে গোলমাল বা রোগীকে ডাকিবে না। বাহক বাটীতে আসিয়া চিকিৎসকের উপদেশ তামিল করিল। পরে সকলে আহারান্তে, রোগীকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইবার সময় দেখে যে, রোগী জন্মের মত সকল ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া "বেশ হইয়া আছে।" সুতরাং আর কোন ঔষধ সেবন করাইবার প্রয়োজন হইল না। এখন তাহাদের বাটীতে কোন অসুক করিলে তাঁহারা সেই চিকিৎসককে আগে ডাকেন।

——

চুলের কলপ (হেয়ার ডাই)।

চুলের কলপ মাথায় মাখা অনিষ্টকর। বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার রসেল্ চুলের কলপের সম্পূর্ণ অপক্ষপাতি। তিনি বলেন—যাঁহারা কলপ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের শিরঃপীড়ার প্রধান কারণ কলপ ব্যবহার। যাঁহারা চুলের কলপ প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা "সরল ভৈষজ্য তত্ত্বের" ৮৫ এবং ১০৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

উপহার।

শ্রীমতী মঃ—প্রাণাধিকাসু।

ঐ দেখ ভাই ভোর হয়েছে
ফুটছে কত ফুল
পাতায় পাতায় দুল্‌ছে শিশির
গাছের কাণে দুল।
কা-কা রবে ঘরের চালে
ডাকৃছে কত কাক
পূজো বাড়ীতে যোড় কাটিতে
বাজ্‌ছে যেন ঢাক।
গৃহস্থের বউ তাড়াতাড়ি
শয্যে ছেড়ে উঠে
কলসী কাঁকে জল আনিতে
যাচ্চে কেহ ঘাটে।
কেউ বা উঠে উঠানেতে
দিতেছে গোবর ছড়া
কাপড় হাতে পলায় কেহ
পেয়ে ভাসুরে'র সাড়া।
বাড়ীর গিন্নী পা ছড়িয়ে
ঘরের ভিতর বসে
তামাক পোড়ার গুঁড় দাঁতে
মনের সুখে ঘসে।
বাব্‌ বা মাম্‌ মা ডাকৃছে খুকি
উঠে আধ বোলে
ঘুমন্ত মার নাই কো সাড়া
কাঁদ্‌চে কত ছেলে।

ঘুমের ঘোরে শুয়ে শুয়ে
মা, গায় ঘুমের গান
শোয় না খকি কাঁদে সুধু
হায়! কি জ্বালাতন।
বড় দুষ্ট মেয়ে মা তুই
বলেন মাতা রেগে,
তোরই তরে রাত্তির বেলা
বসে থাকি জেগে;
ভোরের বেলা তাইতে আমার
চোক্‌ চাওয়া হয় ভার,
সোনা মেয়ে ঘুমোও দেখি
লক্ষ্মী "মা আমার"।
উঠ না ভাই ভোর হয়েছে
দেখ্‌বে কত মজা
সুয্যি মামার ঝ্যাঙা চোক্‌
খেয়ে যেন গাঁজা।
সকাল সকাল রোজ যে ওঠ
আজ কেন ভাই শুয়ে
কওনা দুটো মধুর কথা
আমার পানে চেয়ে।
তোমার কথা শোনবার তরে
রোজ যে আমি আসি।
তো' হতে ভাই কথাকে তোর
বড় ভাল বাসি।

ছুটো কথা এও কিরে ভাই
হয়ে উঠে না বলা
আমার সাথে মিছে মিছি
করবে সুধুই ছলা।
"জানি না" এক কথা তোমার
সদাই আছে মুখে
সর্ব্বনেশে ঐ কথাটা
কে সেখালে তোকে।
বুকের ভেতর যা ভাই ছিল
দিছি সবই তোরে

বড়লোকেরা ঘরে রেখেছে
সোণারূপা হীরে।
আজ সকালে ফের এনেছি
এ-এক উপহার
হাসি মুখে নেবে কি ভাই
এ লাইন দু, চার।
গরীব আমি কোথায় পাব
কবির বাড়ীর ধন
সামান্য এ উপহারে
উঠবে কি তোর মন ?

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

নববর্ষ।

নব বরষ প্রাতে আজু কি আনন্দ রাজে।
জগৎ বিভোর প্রাণ, গাওত নবীন গান,
কোকিল কাকলী মরি, পঞ্চম সুর বাজে ॥
শ্যাম কিসলয়ে শোভিত তরুবর।
শ্যাম তৃণদলে শোভিত প্রান্তর ॥
তরুপর বিকশিত, শতফুল শোভিত,
গুঞ্জত অলি, নাচত শিখি, শ্যাম কানন মাঝে

হৃদয়ে বিজলি জনু আনন্দ কোলাহল,
অধীর হৃদয় প্রাণি, গাওত নবীন গান,
বিশ্ব সঙ্গীত সনে জন হৃদি মাতল ॥
আকুল অলিকুল চুমরে ফুলদল,
মলয় বায় সদা বিলায় পরিমল।
সরিৎ লহরী তুলি, যাওত ধীরে চলি,
গাওত বৃহৎগান হৃদয় বিভোল ॥

জগৎ হৃদয়ে আজু আনন্দ উছাস।
চরাচর ছুলই তান, তাহে-সজীব হৃদয় প্রাণ,
সমীরণ ঢালত চ্যুত-মুকুল- সুবাস॥
উজল সরোবরে শোভত নলিনী
শ্যাম কিসলয়ে বিচরত হরিণী।
ফুলে মধুপিয়ত, প্রজাপতি ধাওত,
প্রকৃতি আজ মুখে হাঁসত মৃদু হাস।

আজু প্রকৃতি সদা গাওত মৃদু গান।
আকাশে নবীন রবি, প্রান্তরে নবীন ছবি,
নবীন নবীন সবি. নবীন ভুবন প্রাণ॥
শোভত চাঁদিমা সুনীল গগণে,
প্রভাহিত দশদিশ রজত তুফানে
প্রকৃতি মরম মাঝে, সুষমা বাঁশরি বাজে,
তাহে জগৎ আজু মিশাইছে তান।
আজু নববরষ দিনে আনন্দ প্রাণ॥

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

শেফালিকা।

প্রভাত না ফুটিতে ফুটিতে
ঝরিয়া পড়েছি তরুতলে
আর কোন আশা সাধ নাই—
বুকে সব ফেলিয়াছি দলে।
বিন্দু বিন্দু নিশির শিশির
মাথায় পড়েছে সারারাত

হৃদয়ের সুখের বাসনা—
ধুইয়া ফেলিছে তার সাথ,
না ফুটিতে কোকিল-কাকলী
প্রাচী—দ্বারে উষা না আসিতে,
প্রভাতের সমীর পরশে
ফুল গুলি নাহিক জাগিতে—
আমার গো ফুরায়েছে সব
ঝরিয়া পড়েছি তরুতলে
আর কোন আশা সাধ নাই
বুকে সব ফেলিয়াছি দলে
শুধু—একটি বাসনা কষ্ট করে
কিছুতেই নারিনু বারিতে
"একবার হেরিয়া সে মুখ
চির তরে নয়ন মুদিতে॥

শ্রীসুকুমারী দেবী।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চিকিৎসক ও সমালোচকের বিনিময়ে আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আশা করি অন্যান্য সহযোগীগণ, স্বীয় পত্রিকা প্রেরণে বাধিত করিবেন। আর যাঁহারা আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার সহিত বিনিময় করিতে লজ্জা বোধ করিবেন, তাঁহারা আমাদিগের পত্রিকা যাইবামাত্র (রিফিউজ) ফেরত দিলে বাধিত হইব।

১। বাসনা। ২। এডুকেশন গেজেট। ৩। ঢাকাপ্রকাশ। ৪। রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ। ৫। বাঁকুড়া দর্পণ। ৬। Queen। ৭। পদ্য আয়ুর্ব্বেদ। ৮। আভা। ৯। মেডিকেল্ ইন্টেলিজেন্সার। ১০। তৃপ্তি। ১১। দারোগার দপ্তর। ১২। সংবাদ প্রভাকর। ১৩। হোমিওপ্যাথিক রিভিউ। ১৪। চিকিৎসা সম্মিলনী। ১৫। বর্দ্ধ-

মান সঞ্জিবনী। ১৬। ত্রিপুরা প্রকাশ। ১৭। বিক্রমপুর। ১৮। সৎসঙ্গ। ১৯। লক্ষ্মী ও সরস্বতী। ২০ জ্যোতিঃ।

বাসনা। মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী। আমরা "জ্যৈষ্ঠের" সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা চুঁচুড়া "বাসনা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য একটাকা মাত্র। মফঃস্বলে একটাকা ছয় আনা। "বাসনা" প্রথম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্য সংসারে অনেক সুপরিচিত লেখক ইহাতে রীতিমত প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। এবারে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে:—"বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ"—লেখক, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে আক্ষেপ করিয়াছেন। প্রবন্ধটী সুললিত বটে, তবে ইহাতে নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই। "সৃষ্টিতত্ত্ব" একটী সুন্দর চিন্তাশীল প্রবন্ধ, এইবারে শেষ হইয়াছে। "কেন হইল মিলন" একটী চলন সই কবিতা। "ব্রাহ্মোপাখ্যান"—ইহাতে ব্রহ্মের প্রাচীন ইতি হাস কিয়ং পরিমাণে বর্ণীত হইয়াছে। "মসূরিকা বা বসন্ত"—প্রবন্ধটী সুলিখিত, ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আয়ুর্ব্বেদে বসন্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

"কট্বম্ল লবণক্ষার বিরুদ্ধাধ্যাশনাশনৈঃ,
দুষ্ট নিষ্পাব-শাকাদৈঃ প্রদুষ্ট পবনোদকৈঃ
ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষ সমুদ্ভবাঃ
জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সঙ্গতাঃ,
মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ পীড়কা সা মসূরিকা"

"(১) কটু অম্ল লবণ ও (২) ক্ষারদ্রব্য সেবন, (৩) বিরুদ্ধ ভোজন, ও (৪) অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বের ভুক্ত বস্তু পরিপাক না হইতেই আহার করিলে, (৫) দূষিত শিম্বি বা শাক্যাদি ভোজন এবং (৬) ক্রূর গ্রহের অশুভ দৃষ্টিদ্বারা (৭) দেহে বায়ু পিত্ত বা কফের কোপ হয়, সেই দোষ শারীরিক রক্তকে বিকৃত করিয়া, মসূরের আকৃতির ন্যায় পীড়কা করে, তাহাকেই মসূরিকা বা বসন্ত বলে।" অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও "সুরবালা" র দুইটী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ. শেষ না হইলে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক। এতদ্ভিন্ন ইহাতে উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ বিশেষ কিছুই নাই।

"বাসনার" বর্ত্তমান সংখ্যা আশাপ্রদ। আমরা সহযোগীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ—সাপ্তাহিক পত্র। অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়া দিক্‌প্রকাশ আজ ৩৫ বৎসর সাধারণে প্রকাশিত হইতেছে। দিক্‌প্রকাশে রঙ্গপুর ও উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক সংবাদই থাকে, সম্পাদক মহাশয় দেশের জন্য অনেক কথাই লিখিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত তিনি আমাদের নিকট ধন্যবাদার্হ। এ ভিন্ন অন্যান্য দেশের কথাও দেখিতে পাই। মধ্যে মধ্যে দুই একটি সুপাঠ্য কবিতাও থাকে। দিক প্রকাশ আপন কার্য্য সুনিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিতেছেন। কেবল আমরা কেন, ইহাতে সকলেই সুখী।

সংবাদ প্রভাকর। প্রাত্যহিক পত্র। সংবাদ প্রভাকর আজ ৬৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ৬৫ বৎসরে পড়িয়াছে। স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। সেই সংবাদ প্রভাকর আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের আর সে প্রভা নাই তবে এখনও যাহা আছে তাহা অনেকের প্রার্থনীয় বটে।

চিকিৎসক বা পদ্য আয়ুর্ব্বেদ—তালন্দ হইতে কবিরাজ শ্রীবিনোদ-বিহারি রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত—আমরা চিকিৎসকের কয়েকখণ্ড পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অতি সরল পদ্যে লিখিত হইতেছে। সহযোগী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আর্য্যশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করুন ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

মেডিক্যাল ইন্টেলিজেন্সার। চিকিৎসা বিষয়ক বাঙ্গালা মাসিক পত্র। আমরা ইহার এক সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এক সংখ্যা দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করা অযৌক্তিক। আমরা সহযোগীর উন্নতি দেখিলে সুখি হইব।

চিকিৎসক ও সমালোচক

মাসিক পত্র

১ম খণ্ড } সন ১৩০১ সাল। { ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

"ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" রোগটা কি তাহা অনেকের জানা না থাকিলেও, উক্ত ব্যাধি কি রকমের তাহা সম্প্রতি অনেকেই স্ব শরীরে অনুভব করিয়াছেন। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এ রোগ আমাদের দেশে ছিল না। দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার নাম পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেহ জানিত কি না সন্দেহ! কিন্তু সম্প্রতি ইহার ঘন ঘন আক্রমণে উক্ত ব্যাধির সহিত আমরা এক্ষণে বিশেষ পরিচিত। কিন্তু রোগের কারণ নির্ণয় না হইলে, তাহার চিকিৎসা নির্ণয় দুঃসাধ্য, সেই নিমিত্ত আজ পর্য্যন্ত "ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা" রোগের কোন প্রকার প্রতিকারোপায় নির্ণীত হয় নাই। তবে আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহার কারণ অনেকটা নির্ণয় করিয়াছেন, আজ আমরা ক্রমশঃ তাহারই উল্লেখ করিব।

জীবাণু ও তাহার বিনাশোপায়।

আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক একপ্রকার স্থিরিকৃত হইয়াছে যে, দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুর প্রাদুর্ভাবই রোগের কারণ। প্রথমতঃ এই

মতটী যথার্থ কি না তাহা তাঁহারা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতিতে প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ না হইলে আপনা হইতে বাড়িতে পারে না, অথচ রোগ বিষয়ে দ্রুত বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্ত রোগীর গাত্র হইতে অত্যল্প বিষ লইয়া সুস্থব্যক্তির গাত্রে প্রয়োগ করিলে, তাহার গাত্রে শত শত ক্ষুদ্র স্ফোটক হইতে দেখা যায়; আবার সেই শত শত স্ফোটক হইতে বিষ লইয়া প্রয়োগ করিলে লক্ষ লক্ষ লোকের বসন্ত হইবার সম্ভাবনা। এত বিষ আসিল কিরূপে? এতদ্ভিন্ন শরীরের উপর জড়ীয় বিষের প্রভাব দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা হইতে "সজীব-রোগ বিষের" বিষের প্রভেদ। অহিফেণ কিম্বা অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হইবার নিয়মিত সময় পরেই, ইহার সমস্ত অপকারিতা প্রকাশ হইয়া পড়ে কিন্তু টীকা প্রদান করিলে, যেন বসন্তের বিষ দিনকতক নির্জ্জীব অবস্থায় থাকে, তার পর ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়া আবার কমিয়া যায়। ইহাতে জড়তার কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার পর যখন গুটিকতক রোগের জীবাণু অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, তখন ভিন্ন জাতীয় জীবাণু যে, ভিন্ন ভিন্ন রোগের কারণ, তাহা সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রথম এই জীবানু শরীরে প্রবেশ করিলে, বিশেষ কোন অপকারিতা দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগ বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক এই জীবানু বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে ইহাকে বিনাশ করিলে কতটা ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রোগ সম্বন্ধে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রোগের, মানব শরীরে স্থান বিশেষের উপর প্রভাব অধিক। তাহার কারণ বিভিন্ন জাতীয় জীবাণু বীজ, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, তাঁহাদের পরিণতির আবশ্যকীয় উপাদান প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সকল স্থানে তাহা পায় না। এই বিশেষ স্থান গুলিকে ইংরাজীতে বীজের "নাইড্‌স্" বলে। এই "নাইড্‌সে" এমন কোন পদার্থ আছে, যাহার সংযোগ ব্যতীত জীবাণু বীজ পরিণত হইতে পারে না এবং সেই পদার্থ, নিশ্চয়ই শরীরে অধিক পরিমাণে থাকে না, সুতরাং জীবাণু-বীজের দ্রুত পরিণতি হইবার পর, সেই

জীবন সঞ্চারক বীজ নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই পদার্থ নিঃশেষ হইবার পর যে সকল বীজ শরীরে উৎপন্ন হয়, তাহারা পরিণতির উপাদান অভাবে নিরীহ অবস্থায় থাকে। সুতরাং যে জীবাণুগুলি পরিণত হইয়াছে, তাহাদের জীবন শেষ হইলে রোগও কমিবার সম্ভাবনা। আর এই নীড়স্থ পদার্থ, একবার ফুরাইলে, প্রায় দ্বিতীয়বার হইতে দেখা যায় না। কিন্তু পালা জ্বর সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ, পালা জ্বরের বীজের "নাইড্‌স্" রক্তে এবং রক্ত ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং আজিকার রক্তের উপর যে কার্য্য করা হইয়াছে, কালিকার রক্তে তাহার ফল ফলিবার কোন কারণই দেখা যায় না।

জীবাণুগুলি স্বীয় শরীরের পোষণ জন্য মনুষ্য দেহ হইতে আবশ্যকীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে। "নাইট্রোজেন" এবং জল ব্যতীত কোন প্রণীই জীবন ধারণ করিতে পারে না; জীবাণুগুলি রক্ত হইতে নাইট্রোজেন এবং জল টানিয়া লয়, সঙ্গে সঙ্গে দেহতন্তুগুলিও শুকাইয়া যায়। অবশেষে জীবাণুগুলি মস্তিষ্ক হইতে উপাদান গ্রহণ করিতে থাকে তখন তাহারও বিকৃতি ঘটিতে থাকে। ক্রমে মাংস পেশী, স্নায়ু, এবং মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু হয়।

এক্ষণে চিকিৎসকগণ, যদি জীবাণুর, জীবন সঞ্চারি পদার্থ নিঃশেষিত হওয়া পর্য্যন্ত, কোন প্রকার ঔষধ ও আহারের দ্বারা রোগীর বল রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে রোগী বাঁচিয়া যাইতে পারে। কিম্বা যদি মানব শরীরে এমন কোন পদার্থ প্রবেশ করান যায়, যাহাতে ঐ জীবন সঞ্চারি পদার্থ নষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে রোগের পরিণতি বন্ধ হইতে পারে। বসন্ত রোগের টিকা দেওয়াও এই প্রকারের চিকিৎসা— কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নিরীহ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করাইয়া, সামান্য পীড়া উপস্থিত করিয়া, ঐ পদার্থ নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। বিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ্ পাষ্টার, এইরূপে "হাইড্রোফোবিয়ার" নিরীহ জীবাণু আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে আশা করা যাইতে পারে যে, কালে সকল রোগের এইরূপ নিরীহ জীবাণু আবিষ্কৃত হইবে।

রোগীর কোন অনিষ্ট না করিয়া জীবাণুদের যদি মারিয়া ফেলা যায় তবে সেও একটা উপায়, যেমন কুইনাইনের দ্বারা পালাজ্বর নিবারিত হয়। ডাক্তার ম্যাক্লোসন্ বলেন, যেমন পালাজ্বরের পক্ষে "কুইনাইন", "ইনফ্লুয়েঞ্জার" পক্ষেও সেইরূপ "স্যালিসিন।" ইহা কুইনাইন্ অপেক্ষাও নির্দ্দোষী, অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, "ইনফ্লুয়েঞ্জা" রোগ প্রবেশের পূর্ব্বে ৫ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় স্যালিসিন, প্রত্যহ সেবন করিলে, ইনফ্লুয়েঞ্জা বীজ প্রবেশ মাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

কারণ।

পূর্ব্বেই এক প্রকার দেখা গিয়াছে, যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবানুই ভিন্ন ভিন্ন রোগের কারণ। এবং সেই জীবানু মানবদেহে প্রবেশ লাভের পর, যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, রোগও তদনুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাও সেই নিয়মের বহির্ভূত নহে। কেহ কেহ বলেন "ব্যাক্‌টিরিয়া" নামক এক প্রকার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে এই রোগ জন্মে। কেহ কেহ এই রোগকে "স্পর্শাক্রমক" বলেন, আবার কেহ কেহ বলেন ম্যালেরিয়া হইতেই এই রোগের উৎপত্তি। ইহার মধ্যে কোন মতটী অকাট্য তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, পূর্ব্বোক্ত মতই সবিশেষ বিশ্বাসযোগ্য। এই রোগ, সকল সময়েই জন্মিতে পারে এবং একবারে, বহুসংখ্যক লোকের হইয়া থাকে, ঠাণ্ডা লাগান, দুর্ব্বলতা, ফুস ফুস এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়া থাকিলে এই রোগ হইবার সমধিক সম্ভাবনা। যেস্থান আর্দ্র ও শীতল এবং যেস্থানে অধিক লোকের বাস, সেই স্থানে, এই রোগ অধিক পরিমাণে হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।

প্রথমে অত্যন্ত জ্বর হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা, শিরঃপীড়া, শীত, দুর্ব্বলতা, হাতে পায়ে বেদনা, এবং বমনোদ্রেক হইতে থাকে। ক্রমশঃ রোগের অন্যান্য কষ্টকর লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। অত্যন্ত জ্বর, নাড়ী

দ্রুত এবং কঠিন হয়, শরীরের চর্ম্মও গরম এবং শুষ্ক হয়। নাসিকা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব হইতে থাকে। সর্দ্দি, নাসিকা গরম এবং শুষ্ক বোধ হয়; হাঁচি, ঘ্রাণশক্তি কম, এবং মুখের মধ্যে ক্ষত হয়। স্বরভঙ্গ, শ্বাস কষ্ট এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা হইয়া থাকে, কপালে বেদনা ও কর্ণে নানা প্রকার শব্দ শুনা যায়। জিহ্বা অপরিষ্কার ও লাল, ওষ্ঠে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বাহির হয়। পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, পেটে অতিশয় বেদনা, সর্ব্ব শরীরে অতিশয় কন্‌কনানীযুক্ত বেদনা, উদরাময়, কার্য্যে অনিচ্ছা, মাথাঘোরা, মূত্র লালবর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হয়। জ্বর ছাড়িয়া আবার জ্বর হয়—প্রায় বৈকালে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। এই রোগ দুই তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভোগ হইতে পারে, কাহারও বা রোগ অতি সামান্য হইয়া আরোগ্য হইয়া যায়। সচরাচর এই রোগের স্থিতি ১০।১২ দিন। রোগ [illegible] কঠিন হইয়া "ব্রঙ্কাইটিস্" অথবা "নিউমোনিয়ায়" পরিণত হয়। জিহ্বা কটা ও শুষ্ক হয়, প্রবল দুর্ব্বলতা ও আক্ষেপ হইতে থাকে। এই সময়ে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর শিশু, স্ত্রীলোক এবং অধিক বয়স্ক পুরুষদিগের ইহা হইয়া থাকে। যাহাদিগের হৃৎপিণ্ডের পীড়া, ও ফুস্ফুসের পীড়া আছে, তাহাদিগের এই রোগ অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া থাকে।

প্রতিশেধক।

সেলিনিন, ২।৪ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে অথবা অয়েল্ ইউকেলিপ্টস্ গ্লোবিউল্‌স ১ বিন্দু, ৪ গ্রেণ পরিষ্কার দুগ্ধ শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যহ ২।১ পুরিয়া সেবন করিলে, অয়েল্ ইউকেলিপ্টস্ ও কর্পূর আঘ্রাণ করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। কেহ কেহ ক্রিয়েজোট ও কার্ব্বলিক্ এসিড্ ১ বিন্দু মাত্রায় উক্তরূপে ব্যবহার করিতে বলেন। সর্দ্দি, কাশির সহিত ইনফ্লুয়েঞ্জা হইলে উক্ত অয়েল্ ইউকেলিপ্টস্ ঘটিত পুরিয়া ব্যবস্থেয়। কথিত আছে "তাম্রকূট", ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিশেধক। (ক্রমশঃ।)

শ্রীগৌরিপ্রমোহন গুপ্ত।

ডাক্তার নুরের আবিষ্কৃত এণ্টিপাইরিন্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রক্তের উপর এণ্টিপাইরিনের যে কোনরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। তাহা বিয়ার সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। উক্ত মহোদয়ের মতে এণ্টিপাইরিন্ বলকারকের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ডাক্তার পার্কও বিয়ার সাহেবের মতানুসমর্থক। তিনি পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারিত করেন যে, ইহাতে শীরাসমূহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং হৃদয়ের কার্য্য উত্তমরূপে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এক্ষনে বলা আব শ্যক, পীড়িতাবস্থায় এণ্টিপাইরিনের ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন।

ডাক্তার ম্যাক্ এলিষ্টার্ বলেন যে, এণ্টিপাইরিন্ সাধারণতঃ হৃৎ পিণ্ডের কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। এণ্টিপাইরিনের ক্রিয়ার সহিত কেইরিন্ (Kairin) এবং কুইনাইনের তুলনাস্থলে, পেলিকেনি সাহেব বলেন যে, উহাদিগের ক্রিয়া প্রায় সমান কিন্তু অধিক পরিমানে এণ্টিপাইরিন্ প্রয়োগ করিলে, রক্তের স্থল সমূহের বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়। ডাঃ মেনো ১০-১৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত এণ্টিপাইরিন্, কুকুরের শীরাতে প্রয়োগ (injection) করায়, উহার স্বরের বৈলক্ষণ্য হয় এবং তৎপরে অন্যান্য লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। স্পাইনেল্ কর্ডের (Spinal cord) উপর এণ্টিপাইরিনের যে, ক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহাতে ডাক্তার স্থুপি (Chouppe) বলেন যে, ষ্ট্রিক্নাইন সেবনে যে, মৃত্যু আনয়ন করে তাহা এককালীন এণ্টিপাইরিন্ প্রয়োগ করিলে ষ্ট্রিক্নাইনের বিষময় ফলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ষ্ট্রিক্নাইনের দ্বারা বিষাক্ত হইলে, এণ্টিপাইরিন্ প্রতিষেধকের কার্য্য করে।

উইজ্কোসকি (Wicskowski) বলেন, ইহাতে দেহের উত্তাপ নাড়ীর প্রখরতা এবং রক্তের চাঞ্চল্য মন্দীভূত হয় কিন্তু হৃৎপিণ্ডের

কার্য্য কোনরূপ ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না। আর প্রস্রাবের সহিত যে নাইট্রোজেন্ থাকে তাহার পরিমাণ হ্রাস করে এবং সলফিউরিক্ এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এণ্টিপাইরিন প্রয়োগে সঞ্চিত এলবুমেনেরও কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। প্রস্রাবের উপর এণ্টিপাইরিনের যে ক্রিয়া, তাহা প্রয়োগের দুই ঘণ্টা পরে অবগত হওয়া যায় এবং উহার অস্তিত্ব দুই দিবস প্রয়োগ না করিলেও জ্ঞাত হওয়া যায়।

আমব্যাক্ বলেন যে, মনুষ্য জাতীর প্রস্রাবে সালফিউরিক্ এসিডের আধিক্য, এণ্টিপাইরিনের দ্বারায় সংঘটিত হয় পরন্তু উহা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে কুক্কুর জাতির প্রস্রাবে দেখা যায়। উক্ত মহোদয় স্বয়ং পরীক্ষার্থীরূপে দুই ড্রাম্ মাত্র দুই দিবসের মধ্যে সেবন করাতে প্রথম অবস্থায় উৎক্ষিপ্ততা ও অস্বচ্ছন্দতা তৎপরে স্বাভাবিক উত্তাপের হ্রাস পর্য্যায়ক্রমে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। উত্তাপ ক্রমে ৯৯.৬ হইতে ৯৭.৪ ৯৬.২ অবধি হ্রাস হইয়া আসিল। সর্ব্বশুদ্ধ নাইট্রোজিন প্রায় ৩০ গ্রেণ কমিয়া গেল। ঐ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ অন্যান্য আধুনিক গণ্যমান্য মহোদয়গণ কর্ত্তৃক অতিশয় যত্নসহকারে অনুমোদিত হইয়াছে।

ডাঃ মার্টিন্ এণ্টিপাইরিনের উষ্ণতা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বহু পরীক্ষা করিয়া অবশেষে স্থির করেন যে, ইহার ক্রিয়া দুই প্রকার। প্রথমতঃ উহা উত্তাপের উৎপত্তি হ্রাস করে এবং দ্বিতীয়তঃ উহার বৃদ্ধিকারক। এই কারণে এণ্টিপাইরিনকে তিনি উচ্চ শ্রেণীতে স্থাপিত করিয়াছেন। খরগস প্রভৃতি প্রাণীর উপরও অনেকানেক পরীক্ষা করা হইয়াছে।

ডাক্তার ম্যাক্এলিষ্টারও উল্লিখিত মতের পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, ইহার প্রয়োগে বাহ্যিকদেহের উত্তাপ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়; আর বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীক উত্তাপের বিভিন্নতার হ্রাস করে। পীড়াতে এণ্টিপাইরিন, গুরুতর ক্রিয়া সম্পাদন করে। ডাক্তার জিরার্ড (H Girard) এণ্টিপাইরিন প্রয়োগে উত্তাপের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে অনেক বলিয়াছেন। এক্ষণে ইয়ানফ (W Iwanoff) সাহেব এণ্টিপাইরিনের দৈহিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যে, একটী ঘটনা উল্লেখ করেন তাহা তিনি স্বয়ং পরীক্ষার পর প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উক্ত ঔষধের

কার্য্য ভেকের যকৃতের উপর প্রথমে পরীক্ষা করেন : ১/৪, ১/২, ১/৬ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ১/২ ঘণ্টা, ২ ঘণ্টা, ৬ ঘণ্টা এবং ২৪ ঘণ্টা পরে উক্ত যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

১/২ ঘণ্টা পরে :—যকৃতের ছিদ্রসমূহের আয়তন স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এমন কি ছিদ্রসমূহও সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অন্য কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না। কেবল মাত্র ছিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

২ ঘণ্টা পরে :—লিভারের ছিদ্রগুলি স্বাভাবিক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয় ; উহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি বিকৃতিভাবাপন্ন অথচ স্বচ্ছ থাকে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, ছিদ্রগুলির অনিষ্ট সংঘটিত হয়।

৬ ঘণ্টা পরে :—ছিদ্রগুলি প্রায় মধ্যম আকার ধারণ করে এবং গাঢ় লোহিতবর্ণ হয়।

২৪ ঘণ্টা পরে :—ছিদ্রগুলি পূর্ব্বের আকার ধারণ করে। বিকৃতিভাবাপন্ন ছিদ্রগুলি ক্রমে অদৃশ্য হইয়া আইসে। অল্পব্যাপী রক্তস্খলনমূহ ক্রমে বিস্তীর্ণ হইয়া যায়।

ইয়ানক্ আরও বলেন, উক্ত ঔষধ সেবনে হিপ্যাটিক্ সেলসমূহের অনিষ্ঠ ঘটে। এণ্টিপাইরিনের ক্রিয়া যে, লিভারের উপর কার্য্য করিয়া থাকে তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।

এ বিষয়ে ডাক্তার আরডুইন্ (L. Arduin) একজন ভিন্ন শ্রেণীর লোক্। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোন প্রাণীকে এণ্টিপাইরিন্ সেবন করাইলে এবং উক্ত প্রাণীর যে কোন এক স্থান কর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ যে, রক্ত বহির্গত হয় তাহা অল্প পরিমাণে এবং মন্দ মন্দ গতিতে নির্গত হয়। এই সমস্ত পরীক্ষার পর উক্ত মহোদয় রক্তস্রাব বন্ধ করিবার নিমিত্ত উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতেন। ইহাতে আরগটিন্ (Ergotin) বা পারক্লোরাইড্ অব্ আয়রন্ (Perchloride of Iron) অপেক্ষা উত্তমরূপ ফল এবং আশু রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

যাহা হউক এণ্টিপাইরিনের দৈহিক ক্রিয়ার সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে। তত্রাচ ডাঃ কপোলা যাহা বলেন তাহাও আমাদের বিবেচ্য। এণ্টিপাইরিন্ যেস্থলে ইনজেক্ট (পিচকারী) করা হয় সেই স্থলে কেবল মাত্র একবার অনুভব শক্তির হ্রাস হয়। ম্যাক্এলিষ্টার বলেন, এণ্টি-পাইরিনের বেদনা হ্রাস করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও ইহা স্থানে স্থানে শীরাসমূহকেও উত্তেজিত করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

বসন্ত।

এ বৎসর কলিকাতা ও সহরতলীর স্থানে স্থানে বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অনেকদিন হইতে শীতলাদেবীর প্রকোপ প্রখরই রহিয়াছে। তজ্জন্য বিশেষ কৃতকর্ম্মা কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক ভিষক্ (Health-Officer) মহোদয় টীকা দেওয়া (Vaccination) ও পুনঃ টীকা (Re-Vaccination) ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিগত এপিডেমিকে অনেক স্থলে শিশুকুলের মধ্যে উপকারা-পেক্ষা কুফল দেখা গিয়াছে। কোথাও টিকা দেওয়ার পর ওলাউঠা, গ্রন্থিস্ফীততা, মন্দ প্রকৃতির দুর্দ্দম্য চর্ম্মরোগ দেখিতে পাইয়াছি। "ইণ্ডি-য়ান রিভিউ" নামক পত্রিকার প্রসিদ্ধ মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ও টিকা দেওয়ার পর উক্ত প্রকার কুফল উৎপন্নের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সম্প্রতি একটী সাংঘাতিক ধরণের ওলাউঠা রোগী পাইয়াছিলাম তাহার বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশ করা গেল। টিকা দেওয়ার এইরূপ কুফল হইতেছে দেখিয়া দুই এক স্থানে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক স্বরূপ এণ্টিমোনিয়ম্ টার্ট ৩০ শক্তি দুই দিন অন্তর, প্রাতে এক মাত্রা করিয়া দিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে বসন্তরোগ প্রকাশ পায় নাই। আমি বোধ করি এই ঔষধটি ভবিষ্যতে বসন্ত রোগের প্রকৃত প্রতিষেধক ঔষধ হইতে পারিবে। আশা করি সকলেই এণ্টিমোনিয়ম্ টার্টারের এইরূপ গুণ পরীক্ষা করিবেন। আমি এবারে কয়েকটী বসন্ত রোগী দেখিয়াছি, তাহাতে আমার নিজ শরীর রক্ষার্থ "এণ্টিমনিয়ম্ টার্ট পূর্ব্বোক্ত নিয়মে

সেবন করিয়াছিলাম। আর যখন বসন্তকণ্ডু বাহির হয় তখন এই ঔষধের ৬ষ্ঠ শক্তি দ্বারা বিশেষ উপকার পাইয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ, প্রসিদ্ধ ভিষক-পি, সি, মজুমদার এম, ডি, মহোদয় বসন্তরোগ নিবারণ হওয়ার জন্য "ভ্যাক্‌সিনিনম্" ৬ষ্ঠ শক্তি ২।১ বার সেবন করাইয়া উপকার হইতে দেখিয়াছেন। এই ঔষধের যথেষ্ঠ পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক এবং আরও তিনি বলেন যে, বসন্ত হইলে "ভ্যারিওলিনম্" নামক ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও উপকার পাইতেছি। হঠাৎ টিকা না দিয়া উল্লিখিতরূপে ঔষধের এক একবার পরীক্ষা করা ভাল নয় কি? চিকিৎসকগণ নিজ শরীর [illegible] ঔষধ ব্যবহার পূর্ব্বক, যেন বসন্তরোগ চিকিৎসায় নিযুক্ত হন। হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসায় নিশ্চয় সুফল পাওয়া যাইবে।

বসন্তের চিকিৎসা।

জ্বর কালে একোনাইট ৩ য় ও বেল্লাডনা ৬ষ্ঠ ব্যবহার্য্য। বসন্তকণ্ডু বাহির হইলে "এন্টি-টার্ট্" ৬ষ্ঠ; "থুজা" ১২শ ও "সলফর" ৩০শ, এবং পুঁজ হইলে "মার্ক-সল্" ৬ষ্ঠ, "এন্টি-টার্ট" ও "হিপার-" ৬ষ্ঠ, কণ্ডু বসিয়া গেলে, "ব্রাইওনিয়া ও সলফর" ৩০ শক্তি লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিতে পারিলে অধিকাংশ স্থলে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে।

ভ্যাকসিনেসনের পর কলেরা ইনফ্যান্টম্ বা শিশু বিসূচিকা—টালিগঞ্জ নিবাসী বিখ্যাত মাইসোর নবাব বংশের কোন পরিবার মধ্যে একটী ৫।৬ মাসের শিশুর টিকা দেওয়ার ৮।১০ দিন পরে, ভয়ানকরূপে ভেদ ও বমন হয়। তখনও শিশুটির হস্তে টিকার স্থানে বিশেষ ক্ষত বর্ত্তমান রহিয়াছে। ওলাউঠার ন্যায় ভেদ-বমন হওয়ায় শিশুটীর চোক মুখ বসিয়া গিয়াছে, স্বরভঙ্গ, বিজাতীয় পিপাসা, জলপান করিবার পরক্ষণেই বমন, নাড়ী সুতার ন্যায় সূক্ষ্ম, জিহ্বা, শ্বাসপ্রশ্বাস ও সর্ব্বাঙ্গ বিশেষ শীতল, শরীর সন্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা এক ডিগ্রী নামিয়া পড়িয়াছে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার জীবনের প্রতি বিশেষ সন্দেহ করা গেল।

ঔষধ—"আর্সেনিক্" ৩০ ও "টার্টার এমিটিক্" ৬ষ্ঠ ২ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায় ক্রমে দেওয়া গেল। পথ্য—ঈষদুষ্ণ জল। চারি মাত্রা

ঔষধ সেবনের পর সংবাদ দিতে কহিয়া আসিলাম। যথা সময়ে জানা গেল, পিপাসা ও বমন আর নাই কেবল মধ্যে মধ্যে সামান্য ভেদ হইতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রস্রাব হয় নাই। উক্ত দুই ঔষধ আর দুই মাত্রা করিয়া দেওয়া গেল, পর দিন প্রাতে গিয়া শিশুর মুখশ্রী দেখিয়াই মহাত্মা হানিম্যান্‌কে ধন্যবাদ দিলাম। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহার জীবন প্রায়ঃ কাল কবলগত ছিল, এক্ষণে সে সম্পূর্ণরূপ জীবন লাভ করিয়াছে। একবার প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব এবং রাত্রে সামান্য নিদ্রাও হইয়াছিল, এক্ষণে ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর বলিয়া বোধ হইল। আমি অগ্রেই তরল এরারুট প্রস্তুত করাইয়া খাওয়াইতে বলিলাম, ঔষধ কেবল "চায়না" ৩০শ এক মাত্রা দিয়াছিলাম এইরূপ দুই এক দিন পথ্য বিবেচনা করিয়া দেওয়াতে, শিশুটী আরোগ্য লাভ করিল। এই জন্যই বলিতেছিলাম যখন বর্ত্তমান বসন্ত এপিডেমিক্ পুরা দমেই চলিতেছে অধিকন্তু টিকা দেওয়ায় নানা প্রকার সাংঘাতিক পীড়া উৎপন্ন এবং দিন দিন মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে তখন হোমিওপ্যাথিক্ মতে চিকিৎসা ও প্রতিশেধক ব্যবস্থা করিয়া দেখিলে কি ভাল হয় না ?

ডাক্তার শ্রীঅভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন্তব্য—আমরা লেখকের মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী না হইলেও, কথিত ঔষধগুলির প্রতি বিশ্বাস করি। সম্পাদক।

রামাভিধান।

ভূমিকা।

আমার শ্রদ্ধাষ্পদ পরমারাধ্যতম পিতামহ সাতক্ষীরা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ৺ দেবনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় স্বকীয় কার্য্য-

কুশলতা, যোগ্যতা, সহৃদয়তা, স্বদেশহিতৈষিতা, অধ্যবসায়িতা, প্রভৃতি গুণনিচয়ে এই বঙ্গভূমিতে যে একজন বিশেষ মনুষ্যপদবাচ্য ছিলেন তদ্বিষয়ে আমার অধিক লিপি বাহুল্য।

তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের মধ্যে নিরাশ্রয় দুঃস্থ রোগী দিগকে ঔষধী ও পথ্যদান করা কর্ত্তব্য সকলের মধ্যে একতম কার্য্য ছিল। প্রাতে বেলা আটটার পর দুইঘণ্টা কাল এই মহদনুষ্ঠানে তিনি কালক্ষেপ করিতেন, চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, চক্রদত্ত এবং স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সংগৃহীত শব্দকল্পদ্রুমাভিধানের দ্রব্যগুণাবলম্বন করিয়া তিনি স্বকপোলকল্পিত পাচন, বটিকা, প্রলেপ ও পথ্যাদি নির্ণয় করিয়া বহুতর দুশ্চিকিৎস্য রোগ নিরাময় করিয়াছেন।

এই সমস্ত রোগের লক্ষণ নির্ব্বাচন মতে ও তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ ভবদীয় পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণ করিব।

একদিবস আমার পিতামহ মহাশয় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, দেখ রামনিরঞ্জন! রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের অভিধানের দ্রব্য গুণাংশ হইতে তুমি অকারাদি বর্ণমালানুক্রমে রোগের নাম স্থির করিয়া যে যে দ্রব্য সমান গুণশালী তাহা স্থির করিয়া যদি একটী নির্ঘণ্ট করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমার চিকিৎসা কার্য্যে বস্তু নির্ণয় সম্বন্ধে সমধিক সাহায্য হয় ও তাহাতে তোমারও বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় হইতে পারে। আমি তাঁহার এই উৎসাহ বাক্যে সাহস করিয়া প্রায় তিন বৎসর কাল গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কার্য্য সমাধান্তে তাঁহার নিকট নির্ঘণ্ট পাঠ করিলে তিনি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়া আমার ভাবী শুভোদ্দেশে নানা প্রকার আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন ও আমার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ ২০০ দুইশত টাকা আমাকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া এই নির্ঘণ্টের নাম আমার প্রতি প্রীতিমূলক "রামাভিধান" অবধারণ করিলেন, এই নির্ঘণ্ট দ্বারা যুক্তিযুক্ত, ধীর-বিজ্ঞ চিকিৎসক গণের কথঞ্চিত উপকার হইলেই আমি এইক্ষণে স্বীয়শ্রম সফল বোধ করিব।

এই নির্ঘণ্ট দ্বারা যুক্তিজ্ঞ চিকিৎসকগণের কথঞ্চিৎ উপকার হইলেই শ্রমশ্রম সফল বোধ করিব।

অরুচিনাশক।

আদিত্য পত্র। বাল আম্র। আম্র মূল। আম্র কুল। চুষিতাম্র। আদা। উষ্ট্রকাণ্ডি। উষ্ট্রমাংস। এর্ব্বারু কাঁকুড়। কত্‌বেল। পক্ককত্‌বেল। কটফল। কটা। কাঁঠাল। কাঁঠালের বীজ। করমর্দ্দক। কাঁকরোল। পক্ক কামরাঙ্গা। কাল লবণ। কাঁজি। করেলা। উচ্ছে। কালশাক। কাঁচকলা। কাশালু। কুর্জ্জিস। কুমড়া। কুমড়ার ডাঁটা। কুসুম শাক। কৃষ্ণজিরা। কৃষ্ণসার মাংশ। কৃষ্ণানদীর জল। কালতুলসী। কঁউমূল। কোকিলাক্ষ। কিশ্‌মিশ্‌। কাগচিলেবু। পিণ্ডখর্জ্জুর। তৈল পক্ক কচুরি। কোল। করকচি—(নারিকেল)। করকচ লবণ। খদির। গোটা-কাসুন্দি। গঙ্গাজল। গড়ৈ মৎস্য বিশেষ। গর্দ্দভ-দধি। পুরাতন গুড়। গুড়ত্বক। গম। গোরোচনা। গোদুগ্ধ। গো-দধি। গোদুগ্ধের নবনীত। গিমেশাক। দধিজ ঘৃত। ঘলিশাক বিশেষ। নির্জ্জল ঘোল। চকোর পক্ষির মাংস। ছোলা। ভৃষ্ট্যছোলা। কাঁচা ছোলা। ছোলা শাক। হিঙ্গুজিরা। সৈন্ধব যুক্ত ঘোল। চসকাম্লক। চেঙ্গ মৎস্য। চবিকা। চাকমূল। (মূলক ভেদ)। শুষ্কচির্ভিটা। (কর্কটিভেদ)। চল্লি। (পাত্র শাক ভেদ)। চাঁপানটিয়া। পক্কচালিতা। চঞ্চু (পত্রশাকভেদ)। চুকাশাক। ছাগ মাংস। লক্ষ্মীরস। জিলেবী। জতুকা। জম্মানামক গন্ধদ্রব্য। জাম। জহড়ী (তৃণ বিশেষ)। জায়ফল। জিহ্বা আঁচড়ান। জৌয়াব (ধান্য বিশেষ)। জল পিপ্পলী। জীরা। ঝিনুক। টক। টাবা লেবু। ডিম্ব। ডঙ্গরী (ফল বিশেষ)। তোরী। পক্কতুম্বুরী। তালীশ পত্র। তিত্তিরী মাংস। পক্ক তেঁতুল। (জল দ্বারা মর্দ্দিত পক্ক তেঁতুলের রস। তাহাতে চিনি, মরিচচূর্ণ, লবঙ্গ, কর্পূর মিশ্রিত পানক) তিন্নীয় (শালিধান্য)। তেজপত্র। ত্রিফলা। তুম্বুরু (ফলবৃক্ষ বিশেষ)। নিঃসার দুগ্ধ দধি। দাড়িম্ব। দ্রোণপুষ্প। ধনিয়া। দুগ্ধাম্র। দুগ্ধ ফেণী।

(ক্ষুদ্র ক্ষুপ বিশেষ)। দেব সর্ষপ (বৃক্ষভেদ)। দ্রোণ পুষ্পী। ধূম্রপত্রী (ক্ষুপ বিশেষ)। নল (তৃণ বিশেষ)। নাগরাঙ্গ। নাগকেশর। পক্ক নারিকেলের জল। (ক্রমশঃ)

—•••—

চিকিৎসক ও কবিতা।

এখনকার এই সত্যানুসন্ধিৎসার এবং বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার পূর্ণ পরিণতির দিনে যখন সকল রকম প্রশ্নই অবাধে উত্থাপিত এবং আলোচিত হইতেছে তখন যদি আমরাও কোন একটা অদ্ভুত রকম প্রসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বোধ হয় তত অপরাধী না হইতেও পারি। চিকিৎসক কবি হইতে পারে কি না? এসম্বন্ধে আলোচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। অনেক ডাক্তার কবির নাম ইংরাজী সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাঁহাদের কল্পনাচাতুর্য্য এবং কবিত্ব প্রতিভা নিতান্ত অনাদরের সামগ্রী নহে। Goldsmith, Schiller, Keats, Crabbe প্রভৃতির নাম কে না জানে? এদেশের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যেও বোধ হয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও গোবিন্দ দাস কবিরাজের নাম নিতান্ত অপরিচিত নহে। এই সকল দেখিয়া সহজেই মনে হয় যে, চিকিৎসকের পক্ষে কবি হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু বিষয়টা আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যে কয়জন কবির নামোল্লেখ করা গেল তন্মধ্যে কয়জন প্রকৃত চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন দেখা উচিত। কয়জন ঔষধ প্রস্তুতের এবং রোগ পরিচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে বীণাপাণির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কীট্‌স্, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে একবার হাঁসপাতাল পরিদর্শনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তারপর আর কখনও চিকিৎসা কার্য্যে বড় একটা মনোনিবেশ করেন নাই। Goldsmith দুই একবার পসারের চেষ্টা করিয়াই চিকিৎসা ব্যবসায় এককালে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার চিকিৎসার কথা, লোকে কিছুদিন পরে এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিল।

Crabbe, এককালে Fox, Walter Scott, Wordsworth, Cardinal Newman প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনিও চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। Scheller সুযোগ পাইবা মাত্রই সেনানিবাসের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাসও ভগবত্‍ প্রেমে যেরূপ উন্মত্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও যে চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ রুচি ছিল এমন মনে হয় না। চিকিৎসার সঙ্গে কবিত্বের সম্বন্ধ এইরূপে দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে কবিতা দেবীর তেমন সদ্ভাব নাই।

Mathew Arnold বলেন "যে, সমস্তমানবজীবন, চিকিৎসকের পক্ষে যুগপৎ উদ্ভাসিত হয়, একথা যথার্থ বটে। কিন্তু চিকিৎসকের দৃষ্টি অতিশয় সূক্ষ্ম। কবির দৃষ্টির সঙ্গে সে দৃষ্টির অনেক প্রভেদ। কবি অসুন্দর বস্তু দেখিতে ভাল বাসেন না।

সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ডাক্তারের পক্ষে তাহা খাটে না। সুন্দর ও অসুন্দর সমস্ত জীবনই তাঁহার কাছে নূতন ভাবে দেখা দেয়।

Shelley বলেন, "কবিতা, পবিত্র এবং প্রফুল্ল চিত্তের সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় সময়ের বিবরণ মাত্র"। কিন্তু যিনি প্রকৃত চিকিৎসক, তিনি যখন রোগীর কষ্ট ও যন্ত্রণার উপশম করিতে পারেন, তখন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ও সন্তুষ্ট হন। জন্ম মৃত্যুর কঠোর সত্যের সম্মুখে বসিয়া কবিতা রচনা করিবার প্রবৃত্তি কাহারও চিত্তে উদিত হইতে পারে না। সেই জন্যই কোন প্রাচীন লেখক বলেন যে, "কোন চিকিৎসকের স্বভাব জাত কল্পনাচাতুর্য্য' এবং কবিত্বশক্তি থাকিলেও যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর ভীষণ দৃশ্যের সংসর্গে তাহাদের সৌসাদৃশ্য রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে।

কল্পিতচিত্র-সৃষ্টি, কবির পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু চিকিৎসকের ব্যবসায়ই তাঁহাকে কঠোর সত্যপ্রিয় করিয়া তুলে। রোগী মাত্রেই স্বর্গমর্ত্ত বিহারিণী, লীলাময়ী কল্পনা সমন্বিত সুকবি অপেক্ষা, প্রশান্ত চিত্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি চিকিৎসককে সমধিক সমাদর করে। অসুন্দর চিত্রকে একেবারে উপেক্ষা

কথা চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব। স্বভাব লইয়াই তাঁহার কারবার—শিল্প লইয়া নহে। কবিতাসুন্দরী তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ভক্তের প্রতিই কৃপাবর্ষণ করিয়া থাকেন কিন্তু ব্যবসায়ী চিকিৎসকের পক্ষে সে সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা বড় কম। কাজেই কোন চিকিৎসক কবি হইবার চেষ্টা করিতে গেলে প্রায়ই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মধ্যশ্রেণীর কবি হইয়া উঠেন, তাঁহার আশা কখনই ফলবতী হয় না। এদেশে এপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী ডাক্তারকে কবিতা দেবীর প্রীতিভাজন হইতে দেখা যায় নাই। সুতরাং চিকিৎসকদের মধ্যে যদি কাহারও আপনাপন নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের Carl ile উপদেশ মত সে সব কথা সরল গদ্যে প্রচার করাই ভাল। এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনেকেই সফলকাম হইয়াছেন। Sir Thomas Browne, Dr John Browne, Professor Huxley প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। খিদিরপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক-লেখক ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের নামও এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী বঙ্গদর্শন, প্রচার প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রিকার ক্রোড়দেশ সুশোভিত করিয়াছে।

কিন্তু চিকিৎসকেরা কবিতা ভিন্ন অন্য প্রকার কাল্পনিক রচনায় সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করেন না কেন, বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের শিক্ষা, স্বতঃই তাঁহাদিগকে সূক্ষ্মদৃষ্টি করিয়া তুলে। মানবচরিত্রের ভাল, মন্দ, মহত্ত্ব, নীচত্ব সমস্তই যুগপৎ তাঁহার নয়নপথে উদ্ভাসিত হয়। মুখে পাউডার মাখা নটের মত, আমরা আমাদের যথার্থ প্রকৃতি, সভ্যতার আবরণে ঢাকিয়া রাখি। কিন্তু রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়া যখন আমাদের সমস্ত দেহ অসহ্য যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট ও প্রপীড়িত হইতে থাকে তখন বাহ্যিক আড়ম্বর কোথায় ভাসিয়া যায়! পাউডার মুছিয়া গিয়া সমস্ত স্বভাব তাহার নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। কাজেই চিকিৎসকের পক্ষে মানব প্রকৃতি অধ্যয়ন করা অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের মানবচরিত্রাভিজ্ঞ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। রোগীর মানসিক প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে অবগত না হইলে রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা

করা সুকঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং চরিত্রজ্ঞান শিক্ষা, চিকিৎসকদের পক্ষে ব্যবসায়গত। গল্পের উপাদানের জন্যও তাঁহাদের বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিবার সময়েই কত লোমহর্ষণ ঘটনা তাঁহাদের কর্ণগোচর হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

James Payn বলেন যে, তিনি যতগুলি উৎকৃষ্ট ঘটনা লিখিয়াছেন প্রায় সব গুলিই চিকিৎসাব্যবসায়ীর নিকট হইতে কিন্তু অতি অল্প চিকিৎসককেই কল্পনাবহুল রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় এবং যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাও তেমন কৃতকার্য্য হন নাই। ডাক্তার লেখকদের গ্রন্থে, চরিত্রের বিকাশও তেমন সুস্পষ্ট হয় না। আরও একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাঁহাদের গ্রন্থে চিকিৎসকের চিত্র বড় বিরল; যৎসামান্য যাহা আছে তাহাও তত উজ্জ্বল নহে। George Elliot অথবা "Lydgate", Balzac, "Horace Bianchon" সঙ্গে Smollet প্রভৃতি ডাক্তার লেখকের চিকিৎসকচিত্রের তুলনাই হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহই যে কল্পিত চিত্রসৃষ্টিতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই এমন কথা আমরা বলিতেছি না। এদেশের একজন স্বনামখ্যাত ডাক্তার লেখক এ অপবাদ বিমোচন করিয়াছেন। আমরা সুবিখ্যাত পরলোকগত উপন্যাসিক, বাবু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাই বলিতেছি। দৃশ্যের পরিপাট্যে, চিত্রের স্বাভাবিকতায় এবং ভাবের উদ্দীপনে আমরা "স্বর্ণলতাকে" কোন বাঙ্গালা উপন্যাসের নিম্নে আসন দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় উপন্যাসলেখক, ডাক্তারদের মধ্যে কয়জন আছেন?

৺ ডাক্তার ফকির চাঁদ বসু একজন উচ্চশ্রেণীর লেখক না হইলেও তাঁহার প্রণীত শিবজীর অভিনয় এবং আরও কয়েকখানি গ্রন্থ নিতান্ত মন্দ নহে। *

---

* আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক ও ব্যাঙ্গ নাট্যকার এবং ষ্টার থিয়েটারের কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু অমৃতলাল বসু পূর্ব্বে একজন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, তিনি থিয়েটারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এলাহাবাদে নাকি প্র্যাক্‌টিশ করিতেন।

যাহা হউক আমরা এ প্রবন্ধে কবিতা রচনার কথাই বলিতেছিলাম, আমাদের বোধ হয়, একজন চিকিৎসক "পসারে" থাকিয়া উচ্চদরের কবি হইতে পারেন না, এটা এক রকম স্থির। তিনি যদি শুধু আমোদের জন্য কবিতা লেখেন, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না, কিন্তু যদি তিনি যথার্থই কবিতা লিখিয়া অমরত্ব লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের মতে তাঁহার কোন একটা বিষয় ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবিমধ্যে গণ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা যে নিতান্তই তুচ্ছ উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

অধিকন্তু, সত্যকথা বলিতে গেলে কবি যখন এই ক্লেশকর জীবন-যাত্রার দুঃখরাশি মধ্যে, কবিতার উপাদান খুঁজিতে ব্যস্ত, তখন যে চিকিৎসক আপনার ক্ষুদ্র বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভাবে সাধ্যমতে রোগপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানবের রোগ দূরীকরণে এবং কষ্ট নিবারণে নিযুক্ত, তিনি যে কবি অপেক্ষা উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত, এ কথা অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং আমাদের মতে একজন ব্যবসায়ী চিকিৎসকের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর কবি হইবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করা অপেক্ষা আপনার ব্যবসায়ে থাকিয়া এই দুঃখজর্জ্জরিত, তাপক্লেশপ্রপীড়িত পৃথিবীতে শান্তি ও আরোগ্যের শীতলবারি সেচনের ব্যবস্থা করা যে, অনেক বেশী গৌরবের কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

নেসা।

যে দ্রব্যের ব্যবহারে চেতনাশক্তি ও জ্ঞানের বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে মাদকদ্রব্য বলে, পক্ষান্তরে উহাকে "নেসার জিনিসও" বলা যায় এবং এই নেসার জিনিসকে যাঁহারা অকারণে নিয়মিত রূপে আমোদের বা স্ফূর্ত্তির জন্য ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে "নেসাখোর" উপাধিতে আখ্যাত করা অযৌক্তিক নহে। "নেসাখোরের" আখ্যা

"হিষ্টি" আমরা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিবার জন্ত সাধ্যমতে চেষ্টা পাইব। জগতের প্রায় সকল জাতির মধ্যেই এই নেসার প্রচলন আছে। নেসা করিবার জন্ত তামাক, সিদ্ধি, গাঁজা, চরস, অহিফেন, চণ্ডু, গুলি, সুরা প্রভৃতি অনেকানেক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

নেসার প্রকৃত অর্থ মাদক দ্রব্য এবং যাঁহারা ইহা ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে নেসাখোর। চলিত কথায় অনেকে দৃষ্টান্ত দেন যে, "আমার খবরের কাগজ পড়িবার এমনি নেসা যে, প্রত্যহ আমাকে লাইব্রেরিতে যাওয়া চাই।" এস্থলে কদভ্যাসকে নেসার সঙ্গে অনেকে তুলনা করেন, কিন্তু প্রকৃত নেসা অর্থে, মাদকদ্রব্য ব্যবহারকেই বুঝায়।

নেসার জন্ত যে কোন দ্রব্যই ব্যবহার করা হউক না, তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারই সম্ভব সুতরাং "নেসা করা" মন্দ কার্য্য, নেসার জন্ত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে; ইহা প্রায় অনেকেই বিদিত আছেন, তত্রাচ লোকে কেন যে নেসা করে, তাহা নেসাখোরেই ঠিক উত্তর দিতে পারে না। তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় পাঠ করিয়া যদি কেহ কিঞ্চিন্মাত্র সন্তুষ্ট হয়েন তবেই জানিব যে, আমাদের বক্তব্য বিষয়ালোচনায় অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি।

তামাক।

তামাকের মাদকতা গুণ আছে কিন্তু অন্যান্ত দ্রব্যাপেক্ষা কম; অপরাপর নেসায় যত শীঘ্র শারীরিক অপকার করে, ইহাতে তদপেক্ষা অনেক কম। তামাক বিবিধ রূপান্তরিত অবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং ঐই রূপান্তরাবস্থায় এক একটা স্বতন্ত্র নাম ধারণ করে। তামাকের পাতা পাকাইয়া অগ্নি সংযোগে ধূমপান করিলে, সেই পাকান দোক্তা পাতা "চুরুট" নাম প্রাপ্ত হয়। কলিকায় সাজিয়া ব্যবহার করিলেও তামাক বা গুড়ুক ব্যতীত আর কিছু নাম পাওয়া যায় না। তামাককে শুদ্ধ কথায় (সংস্কৃত) তাম্রকূট এবং ইংরাজিতে টোব্যাকো বলে।

তামাকের আদিজন্ম বা উৎপত্তি স্থান আমেরিকার অন্তঃপাতী ট্যাবাকো বা ট্যাবাস্কো উপদ্বীপ, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তদ্দেশবাসীগণ প্রথমে টোব্যাকো নামক হুঁকায় তামাক সাজিয়া ব্যবহার করে; পরে হুঁকার নামেই তামাকের-টোব্যাকো নামকরণ হয়, কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজি গ্রন্থের মত যে, ম্যাক্সিকো প্রদেশ বাসীগণ ইহা প্রথম টোব্যাস্কোতে প্রথমে দেখিতে পান বলিয়া টোব্যাকো নাম হয়। যাহা হউক আমেরিকাই তামাকের আদি জন্মস্থান।

ঔষধার্থে তামাকের পাতা ব্যবহৃত হয়। প্যারিস্ দেশবাসী মিঃ রইল, ...ব্রিয়া মেডিকায় তাম্রকূটের বিষয় প্রথম লিখেন এবং আমেরিকা দেশোৎপন্ন তামাকই, ইউরোপবাসীগণ ঔষধার্থে ব্যবহার করেন। অস্মদেশে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের রাজত্বের শেষ সীমায় তামাকের প্রচলন হয়। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে তামাকের চাষ ছিলনা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সার্ ওয়াল্টার্ রেলি, ইউরোপের সর্ব্বত্র ইহার চাষ প্রচলন করিয়াছেন। এক্ষণে ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই তামাকের চাষ বাস হইতেছে। এ্যালোপ্যাথিক্ চিকিৎসায়, তাম্রকূট ঔষধার্থে পূর্ব্বকালে কোন কোন চিকিৎসক কর্তৃক ব্যবহৃত হইত এবং এখনও উহা ব্রিটিশ্ ফার্ম্মাকোপিয়া হইতে পরিত্যক্ত হয় নাই কিন্তু ঔষধার্থে তাম্রকূটের ব্যবহার আজকাল নাই বলিলেই হয়, কারণ তাম্রকূটাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ এবং অল্পানিষ্টজনক অনেক ঔষধই বর্ত্তমান রহিয়াছে সুতরাং ঔষধার্থে তামাকের ব্যবহার প্রায় নিষ্প্রয়োজন। প্রধানতঃ নেসার জন্তই এখন তামাক ব্যবহৃত হয়। আজ কাল "বার্ডস্আই" নামক এক প্রকার তামাকের সৃষ্টি হওয়ায় তামাকের ব্যবসায় কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে মাত্র। ইউরোপ খণ্ডে তামাক," চুরুটাকারেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দুই এক স্থানে "তামাক সাজিয়া ধূমপান করা হয়।" ভৈষজ্যতত্ত্ব গ্রন্থে তামাকের বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ বর্ণিত হইয়াছে। সোলেনেসি জাতীয়, নাইকোটিনা টোব্যাকম্ নামক বৃক্ষের শুষ্কপত্র ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহা পূর্ব্বে মার্কিন দেশে জন্মিত. এক্ষণে ভার্জিনিয়া এবং ইউ-

রোপের অন্যত্র ও ভারতবর্ষের স্থানে২ রোপিত হইয়াছে। অস্মদ্দেশীয় হিঙ্গলি, ভিতিহারি ও অন্যান্য কতিপয় শুষ্ক তামাকের প্রায় উক্তরূপ গুণ আছে এবং ঔষধার্থেও ব্যবহার করিতে পারা যায়। আমেরিকা দেশোৎপন্ন একটি পূর্ণ পত্র ২০ ইঞ্চেরও দীর্ঘ হয় এবং আমেরিকা দেশীয় পত্রগুলি অনেকটা সালপত্রের ন্যায়; অগ্রভাগ সূক্ষ্ম (ছুঁচাল) ও গাত্রে একপ্রকার ধূসরাভ শ্বেতবর্ণ সূক্ষ্ম২ লোম দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষ বা অন্যত্র ইহাপেক্ষা দীর্ঘপত্র প্রায় জন্মায় না। তামাকের পাতায় এক প্রকার উগ্র দুর্গন্ধ আছে, যাহা অনভ্যস্ত দিগের ঘ্রাণপথে প্রবেশ করিলে হাঁচি উৎপন্ন হয়। স্থান বিশেষে দোক্তাপাতার বিভিন্নতাও লক্ষিত হয়। কোন স্থানোৎপন্ন তামাকের বর্ণ তামার ন্যায় ধূসর; কোথাও বা ধূসর মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ দোক্তা কাগজের ন্যায় অত্যন্ত পাতলা এবং দুর্গন্ধাদি অপেক্ষাকৃত অল্প, এই পত্রে উত্তম চুরুট প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশে যে দোক্ত জন্মে, তাহা বড় পাতলা হয় না। বর্ম্মাদেশোৎপন্ন তামাক অত্যন্ত পাতলা এবং তথায় তামাকের চুরুট উৎকৃষ্ট হয়, বোধ হয় আমাদের পাঠকগণ বর্ম্মা চুরুটের নাম প্রায় শুনিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বে বর্ম্মা দেশোৎপন্ন চুরুট ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিক্রয় হইত, কিন্তু এক্ষণে "জার্ম্মণি ও বিলাতীয়" আমদানিতে, বর্ম্মার পূর্ব্ব গৌরব অনেক হ্রাস হইয়াছে। তামাকে শতকরা দুই হইতে আট অংশ পর্য্যন্ত অত্যন্ত উগ্র, তাম্রকূটের গন্ধ যুক্ত এক প্রকার উৎপত্তিষ্ণু অর্থাৎ উবিয়া যাওয়া গুণ বিশিষ্ট অত্যন্ত তিক্ত, তরল পদার্থ পাওয়া যায় ইহাকে নাইকোটিয়া বা নাইকোটিন্ বলে এবং তামাককে ক্ষার বা পটাশ দ্রবের সহিত চুয়াইলে উক্ত গুণ বিশিষ্ট "নাইকোটিয়েনিন্" নামক আর একটি তৈলবৎ পদার্থ প্রস্তুত হয়। যে তামাকের যত উগ্র গন্ধ, নাইকোটিন্ও তাহাতে তত অধিক থাকে। যাহা হউক উক্ত দ্রব্যদ্বয়ই তামাকের সার বা বীর্য্য। রাসায়নিক প্রকরণে উক্ত বীর্য্যদ্বয় তামাক হইতে বাহির করিয়া লইলে উহা প্রায় নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তামাকের অনিষ্টোপ-কারিতা উক্ত বীর্য্যদ্বয়ের উপরই অধিক নির্ভর করে। এক্ষণে তামাকের ক্রিয়াদি সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিত হইল। নেশার জন্য তামাক ও

চুরুটের ধূমপান প্রায় সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। এরূপ হইবার কারণ এই যে, তামাক অন্যান্য মাদক অপেক্ষা ক্ষীণ, ব্যবহারে অল্প কষ্ট এবং শারীরিক অনিষ্ঠ প্রায় হয় না, এই নিমিত্ত ইহার প্রচলন অপেক্ষাকৃত অধিক দৃষ্ট হয়। তামাকের ক্রিয়া অবসাদক ও মাদক। নাইকোটিন্, প্রবল অবসাদক; এমন কি উহার আঘ্রাণ লইলে ভয়ঙ্কর হাঁচি হইতে থাকে ও মাথা ঘুরিতে থাকে। তামাকের চুরুটে "নাইকো-টিয়েনিন্" থাকে না, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় গুড়ুক তামাকের ব্যবসায়ীগণ, সাজিমাটি, চূণ প্রভৃতি মিশাইয়া যে তামাক বিক্রয় করে তাহাতে, নাইকোটিয়েনিন্" নামক বীর্য্য, স্বতঃই প্রস্তুত হয়। সুতরাং ইহা ব্যবহারে আরও অনিষ্ঠ সম্ভব।

চুরুট পত্রে নাইকোটিয়েনিন্ প্রস্তুত হইতে পারে না। কারণ উহাতে কোন প্রকার ক্ষার দ্রব্য মিশ্রিত করিবার উপায় নাই। চরুট দীর্ঘশ্বাসের সহিত টানিতে পারা যায় না যেহেতু উহাতে তামাকের উগ্রতা হারক গুড় অম্ল বা কোন দ্রব্য মিশ্রিত থাকে না। গুড়ুক তামাকে গুড় মাখিয়া উহার উগ্রতা হ্রাস করা যায়। কলিকায় সাজিয়া, হুঁকায় জল দিয়া উহার ধূম টানিলে আরও উগ্রতা হ্রাস বোধ হয় কেন না জলের সহিত "নাইকোটিন্" কতক দ্রব হইয়া যায়। নাইকোটিন্ $\frac{1}{8}$—$\frac{1}{2}$ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে বিষ ক্রিয়া করে। তামাকে উক্তবীর্য্য-দ্বয় ব্যতীত উক্তগুণ বিশিষ্ট আরও কএকটি দ্রব্য পাওয়া যায়। যথা পাইরিডিন্, পাইকোলিন্, লুটিডিন; কোলিডিন্ ইত্যাদি। কিন্তু ইহাদের মাদক শক্তি নিতান্ত অল্প। পাইরিডিনের ক্রিয়া ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উগ্র পরন্তু হইা নাইকোটিন অপেক্ষা অনেক ক্ষীণ। পাইরিডিন্ বর্ণহীন তরল পদার্থ, ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র, হুঁকার নলিচায় যে, ময়লা জমে তাহাতে পাইরিডিন্ অপরিস্কৃত ভাবে থাকে। তামাক হইতে উল্লিখিত বীর্য্যগুলি রাসায়নিকোপায়ে বাহির করিয়া লইলে তামাকের কোন গন্ধাস্বাদই পাওয়া যায় না অধিকন্ত তামাক নিস্ক্রিয় হইয়া যায়। বিশুদ্ধ নাইকোটিয়া দ্বারা উদ্ভিজ্জ পীতবর্ণ, লালবর্ণ ধারণ করে এবং পারক্লোরাইড্ অব প্ল্যাটীনম্ ও হাইড্রোজেনের ক্লোরাইড সংযোগে উহা অধঃপতিত হয়। সুরা, ইথর, জল ও

তৈলে নাইকোটিন্ দ্রবণীয় এবং অম্ল (এসিড) সংযোগে লবণ উৎপন্ন হয়। নাইকোটিনিনের রাসায়নিক উপাদান, কার্ব্বন দশ ; হাইড্রোজেন্ সাত এবং নাইট্রোজেন্ একঅংশ মাত্র। যে পত্রগুলি অধিক ভঙ্গুর, সেই পত্রে তত অধিক নাইকোটিন্ থাকে। তাম্রকূটের উগ্রগন্ধে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাম্রকূট অবসাদক, এই অবসাদন ক্রিয়া, স্নায়ু মণ্ডলের উপর অধিক প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ স্নায়ু সমূহকে উত্তেজিত ও পরে অবসাদিত করে।

এ ভিন্ন তাম্রকূটের আরও কএকটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহা মৃদুবিরেচক, বমন কারক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, ক্ষুৎকারক অর্থাৎ হাঁচি উৎপাদক এবং লাল নিঃসারক অধিক মাত্রায় বিষ ক্রিয়া করে। (বাহ্য) স্থানিক প্রয়োগ বেদনা নিবারক উগ্রতা সাধক এবং শোষক। কোন ক্ষত স্থানে তামাকের বাহ্য প্রয়োগ করা যুক্তি যুক্ত নহে, কারণ এরূপ প্রয়োগ করায় বিষাক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। যদি অল্পমাত্রায় তাম্রকূট মুখে রাখা যায়, তাহা হইলে মুখে গহ্বর ও জিহ্বা চিন্‌চিন্ করিয়া উঠে এবং লাল নিঃসৃত হইতে থাকে, গা মাথা ঘুরিয়া উঠে, বিবমিষা অর্থাৎ গা বমি বমি করিতে থাকে, ক্বচিৎ বমনও হয়। ইহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, উক্ত লক্ষণ গুলি নিশ্চয় প্রকাশ পায় এবং তৎসহ বিষ লক্ষণ দেখা যায় তখন সমুদয় পৈশীক শক্তির উপর স্বাধিনতা থাকে না—গা হাত কাঁপিতে থাকে ; পৈশীক শৈথিল্যতা প্রযুক্ত সার্ব্বাঙ্গিক দুর্ব্বলতা, শরীর শীতল ও অসুখ বোধ ঘর্ম্মাভিষিক্ত, অচেতন না হইলেও কেহ২ কথা কহিতে পারে না—অতি সামান্যই পারে। নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত বা বিষম, শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু ও দ্রুত, কখন কখন মূর্চ্ছা ও প্রলাপ দৃষ্টি হয়। অনেক স্থলে শ্বাস রোধ ও হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা হেতু মৃত্যু হয়। হৃৎপিণ্ডের অবসাদ প্রযুক্ত সিন্‌কোপ, পৈশীক বলাভাব প্রযুক্ত উহার শৈথিল্য, আলস্য কখন কখন পক্ষাঘাত, ডিলিরিয়ম্ অর্থাৎ মৃদু প্রলাপ ও মদাতঙ্কের ন্যায় লক্ষণ দেখা যায়। যাঁহারা প্রথমে তামাকের ধূমপান করিতে অভ্যাস করেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অত্যন্ত কাসি হয়, এমন কি শ্বাসকৃচ্ছ্র পর্য্যন্ত

হইতে পারে। অনেকের "বিষম" লাগে; বোধ হয় যেন, বুকের ভিতর ধূম আটকাইয়া রহিয়াছে; কাহারও কাহারও অত্যন্ত হাঁচি হইতে থাকে কেহবা কাশিতে কাশিতে বমন করিয়া ফেলেন। কাহারও গা মাথা ঘুরিয়া উঠে; মনে হয় যেন পড়িয়া গেলাম; আবার অনেকে তখন বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না—কেমন এক প্রকার অসুখ বোধ হয়, এবং শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। উল্লিখিত দুর্লক্ষণ গুলি প্রথমাভ্যাসিগণের মধ্যে অল্প বিস্তর প্রকাশ পাইবার সম্ভব অধিকন্তু অল্প বয়স্ক ও দুর্ব্বল ব্যক্তি অপেক্ষা সুস্থ ও সবল ও যুবা ব্যক্তিদের দুর্লক্ষণ অল্প প্রকাশ পাইবার সম্ভব।

যদ্যপি উক্ত দুর্লক্ষণগুলি সকলের সমান ভাবে প্রকাশ পাইত তাহা হইলে বোধ হয় কেহই তামাকের নেশার বশীভূত হইত না। যাঁহারা তাম্রকূটের ধূমপানে প্রথম অভ্যস্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে উক্ত লক্ষণ গুলির মধ্যে কয়েকটী যে অবশ্যই প্রকাশ পায়, তাহা "তামাক-খোর" মাত্রেই বিদিত আছেন। উল্লিখিত লক্ষণ গুলিতে যাহারা ত্যক্ত না হইয়া প্রত্যহ সেবন করিতে অভ্যাস করেন, তখন তাঁহারা উহার বশীভূত বা অভ্যস্ত হইয়া পড়েন;—অভ্যাসির নিকট কোন কার্য্যই কষ্টকর নহে; (প্রত্যুত অভ্যস্ত কর্ম্মের অসদ্ভাবেও এক প্রকার কষ্ট হয়) তদ্রূপ তামাকেও তখন কষ্ট হয় না; বরং এক প্রকার সুখানুভব হয় এবং "তামাক খাইতে" না পাইলেও কষ্টবোধ হয়; সম্ভবত তামাকের ধূমপান করিয়া কাহার মৃত্যু হয় নাই কিন্তু উক্ত দুর্লক্ষণ সমূহ অনেক স্থলে হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাম্রকূট শোষক, ক্ষত স্থানে দোক্তা পাতা বান্ধিয়া রাখিলে, শোষিত হইয়া বিষাক্ত হইতে পারে। দন্ত মাড়ীতে ক্ষত থাকিলে "দোক্তা" পাতা ব্যবহার করা উচিত নহে ইহাতে বিষাক্ত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। নেসায় বিষাক্ত হইলে তৎপ্রতিকারার্থে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পরে বিবৃত হইবে।

ক্রমশঃ।

—০০০—

চিকিৎসা—সংবাদ।

কার্‌বলিক্ এসিড্ } "সায়েটিকা" বেদনায়, ২০ ফোঁটা "কার্‌বলিক এসিড্" এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া, তাহার পাঁচ হইতে দশ ফোঁটা "হাইপোডার্ম্মিক্ সিরিঞ্জ" করিয়া, ইন্‌জেক্ট করিয়া দিলে বেদনা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। কারবঙ্কল হইলে, ২০ হইতে ৫০ ফোঁটা কার্‌বলিক্ এসিড্ এক আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া, স্ফীত স্থানের তিন চারি জায়গায় উত্তমরূপে পিচকারী করিয়া দিতে হয়। প্রয়োজন হইলে তাহার পরদিনও ঐরূপ পিচকারী করা আবশ্যক। তারপর সেই যন্ত্রণা স্থানে নিম্ন লিখিত ঔষধটি লিণ্টে ভিজাইয়া লাগাইয়া দিলে বিশেষ উপকার লাভ করা যায়:—

কার্‌বলিক্ এসিড্—৩০ ফোঁটা।
ট্যানিন্—৪ ড্রাম।
জল—২ ড্রাম। (একত্রে মিশ্রিত কর।)

প্রমেহ রোগে ১০ ফোঁটা কার্‌বলিক্ এসিড্ এক আউন্স জলে মিশাইয়া, তাহা দিবসে দুই তিনবার ইনজেকট্ করিয়া দিলে, শীঘ্রই উক্ত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে।

* * * * * *

এক্সিমা—"মেডিক্যাল রিপোর্টার" নামক চিকিৎসা বিষয়ক ইংরাজি মাসিক পত্রে ডাঃ গঙ্গাভূষণ রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন যে, নিম্ন লিখিত ঔষধটী ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন:—

প্লম্বাই এসিটাস্—৫০ গ্রেণ।
জিন্সাই অক্সাইড—১ আউন্স।
চূণের জল—২৪ আউন্স। ক্ষতের উপর ইহা লাগাইতে হইবে।

ইহার পূর্ব্বে আবশ্যক হইলে ক্যাষ্টর অয়েলের প্রলেপ এবং পূর্ব্বোক্ত লোসনের সঙ্গে নিম্ন লিখিত ঔষধটী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে :—

লাইকর্ আরসেনিক্—১.মিং।

পটাস্ বাইকার্ব— ½ ড্রাম।

জল—মোট ১ আউন্স। (একমাত্রা৹)

আহারের পর ইহা প্রতিবারে এক আউন্স মাত্রায়, দিবসে ২।৩ বার করিয়া সেবনীয়।

উক্ত পত্রিকায় বাতরোগের নিম্ন লিখিত ঔষধটী প্রকাশিত হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে:—

সোডি স্যালিসিলাস্—৩½ ড্রাম।

সিরাপ্ টোলু—৩আউন্স।

জল— মোট ১২ আউন্স। দুইঘণ্টান্তর এক চামচ করিয়া সেবনীয়।

* * * * * *

ডাঃ জিউলার পুরাতন শিরঃপীড়ার নিম্ন লিখিত উপকারী ঔষধটি প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

আর্সেনিয়েট্ অব্ সোডিয়ম্—½ গ্রেণ।

সল্‌ফেট্ অব এট্রোপাইন্—½ গ্রেণ।

এক্‌ষ্ট্র্যাক্ট অব্ একোনাইট—৭½ গ্রেণ।

দারুচিনি চূর্ণ— —যথা প্রয়োজন।

সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া ১—৪ বটিকা সেবনীয়।

* * * * * *

সর্পদংশনে ষ্ট্রিকনিয়া } গত মার্চ মাসের "ল্যানসেটে" ডাঃ এম্, পার্সিভাল্ লিখিয়াছেন যে, সর্পদংশিত এক ব্যক্তি ষ্ট্রিকনিয়া ইনজেক্‌সনের দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি সর্প-কর্ত্তৃক দংশিত হইবার চারিঘণ্টা পরে তাঁহার সমীপে আসিয়াছিল। তখন তাহার আকৃতি অত্যন্ত ম্লান হইয়া গিয়াছে, গাত্র হইতে শীতল স্বেদ নির্গত এবং নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ ও দ্রুত চলিতেছিল। ওষ্ঠের উপর সর্প দংশনের একটি চিহ্ন দেখা গেল। ১০ মিনিটের মধ্যে ১/১৭ গ্রেণ "ষ্ট্রিকনিয়া"

তথায় ইন্‌জেকট্‌ করিয়া দেওয়ার পর, নাড়ী বেশ বুঝাগেল, তৎপরে আর একবার ইন্‌জেকট করায় নাড়ীর গতি ৯৬ বার হইয়া আসিল। ২০ মিনিট অন্তর ২. গ্রেণ ষ্ট্রিকনিয়া ইনজেক্‌সনের পরে নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি ও শ্বাসগতি স্বাভাবিক অবস্থায় চলিতে লাগিল, স্বেদও ক্রমে কমিয়া আসিল। তৎপরে আরও কয়েক বার ইন্‌জেকট করার পর সন্ধ্যার সময় একবার দাস্ত ও বমি করিয়াছিল ; কিন্তু পরে সম্পূর্ণ রূপ আরোগ্য লাভ করে।

*　*　*　*　*　*

জরিমানা। কলিকাতা মাণিকতলার বারজন অধিবাসী তাহাদিগের সন্তানদিগকে টীকা দিতে অস্বীকার করায়, প্রত্যেকের ১০।১৫ টাকা পর্য্যন্ত জরিমাণা হইয়াছে।

*　*　*　*　*　*

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা। — উত্তর পাড়ার মুখোপাধ্যায়েরা কলিকাতায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি শিক্ষাদিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এই বিদ্যলয়ের সংশ্লিষ্ট, ভেষজ-তরুলতাপূর্ণ একটী উদ্যানও প্রস্তুত হইবে। এই মহদুদ্দেশে সকলেরই অল্প বিস্তর সাহার্য্য করা উচিত। এইরূপ বিদ্যালয় বাঙ্গলায় স্থাপিত না হইলে, দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিব।

*　*　*　*　*　*

শোকে বিশ্রাম—ডাঃ লুমি বলেন যে, শোকের পর বিশ্রাম ও নির্জ্জন স্থান সবিশেষ প্রয়োজনীয়। কার্য্য করিয়া কিম্বা আমোদে, শোক বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করা এক প্রকার বিড়ম্বনা ও অনর্থক। দুঃখ কিম্বা শোককে তাড়াতাড়ি একটা আনন্দের আবরণে ঢাকিয়া ফেলা যায় না। শোকের পর নির্জ্জন স্থান, নির্ম্মল বায়ু, একেবারে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরতি অত্যন্ত আবশ্যক।

*　*　*　*　*　*

কলেরায় কুইনাইন। } ডাঃ এস্‌কিন্‌ ফলারটন বলেন যে, কুইনাইন কলেরার পক্ষে সবিশেষ উপকারক এবং তাঁহার বিশ্বাস, কুইনাইনের দ্বারা কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা খুব কমিয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে দশ গ্রেণ কুইনাইন, ১০ বিন্দু সলফিউরিক্‌ এসিড সংযোগে ১ আউন্স জলের সহিত এক ঘণ্টান্তর, কয়েক বারে রোগীকে ৪০।৫০ গ্রেণ, সেবন করাইতে হইবে। ভয়ানক উদরাময় হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অন্তর এবং অল্প মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঔষধ প্রায়ই বমনের দ্বারা উঠিয়া যায় না এবং শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিতে থাকে।

— * * * * * *

পল্লিগ্রামে স্বাস্থোন্নতি। } ইংলিশম্যান পত্রিকায় একজন লেখক কি প্রকারে পল্লীগ্রামের স্বাস্থোন্নতি করা যায়, তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি বলেন, যেখানে অন্ততঃ ২।১ ঘর মেথর আছে, এমন কোন একটি গ্রামে যদি প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট হইতে এক পয়সা করিয়া চাঁদা আদায় করা হয়, এবং ঐ সংগৃহীত পয়সা সেই স্থানের কোন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি কিম্বা গ্রামের "পঞ্চাইত" কর্ত্তৃক স্বাস্থোন্নতি বিষয়ক কতকগুলি কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সহজে, অথচ অল্প করে গ্রামের স্বাস্থোন্নতি হইতে পারে। তাঁহার মতে এইরূপ যতগুলি গ্রাম, "ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড" কিম্বা লোক্যাল বোর্ডের" অধীনে রাখিলে এবং নিয়মিত রূপে ঐ সংগৃহীত টাকা লোক্যাল বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে দিলেও স্বাস্থোন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

— * * * * * *

ভারতে চক্ষু চিকিৎসা। } ভারতে চক্ষুরোগ বড় কম নহে। পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ চক্ষুরোগ অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে "ল্যানসেট্‌" নামক পত্রিকায় এতৎ সম্বন্ধে এলাহাবাদ চক্ষুচিকিৎসালয়ের সার্জ্জন্‌ লেপ্টেন্যাণ্ট জি, সি, হল, সাহেবের চক্ষুরোগ চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠে জানা যায় এতদ্দেশে কত চক্ষু অযত্নে চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যায়, চিকিৎসাভাবে কতশত লোক

অন্ধ হইয়া যাবজ্জীবন ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। উক্ত ডাক্তার সাহেব অযোধ্যা প্রদেশে চিকিৎসার্থ একটী পল্লীগ্রামে অহুত হন। গ্রামটি ষ্টেসন হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ। চতু[illegible] গ্রাম সমূহে তাঁহার আগমন সংবাদ বড় একটা দেওয়া হয় নাই, [illegible]চ এই সংবাদ অধিকক্ষণ অজ্ঞাত থাকে নাই। তিনি উক্ত পল্লীগ্রামে একটি তাম্বুতে ছিলেন, দেখিতে দেখিতে তথায় দলে দলে লোক আসিতে লাগিল—কেহ বা পদব্রজে, কেহবা গরুর গাড়ি, কেহবা তাহাদের আত্মীয়ের স্কন্ধে চড়িয়া আসিতে লাগিল। প্রাতঃকালে দেখিতে দেখিতে তাঁহার তাঁবুর চারি পার্শ্ব ভরিয়া গেল। ছয়দিনে রোগীরসংখ্যা ৩৯৪ জন হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১১৪ জনের অস্ত্র করা হয়; ছানি তোলা হয় ৬৯ জনের। খোলা মাঠে একটী আম্র-বৃক্ষের তলায় অস্ত্র করা হয়। ৬ষ্ঠ দিবসে ঐ সকল রোগীদের দেখিবার জন্য একজন দেশীয় ডাক্তার রাখিয়া এবং ঐ সকল রোগীদের জন্য ৬৫টী চসমা প্রদান করিয়া, স্বস্থানাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। ডাক্তার সাহেবের এ কার্য্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

* * * * * *

দদ্রু চিকিৎসা—ডাঃ গোল্ডস্মিথ্ ব্রিটিশ্ মেডিক্যাল জর্ণালে লিখিয়াছেন যে, তিনি নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবহার করায় তাঁহার নিজ পরিবারে তিনটী রোগী অতি অল্প দিবসে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

হাইড্রাজ্ বিন্ আইওডাইড—$\frac{1}{2}$ ড্রাম।

সোলিউসন্ অব্ সোডি আইওডাইড্—$\frac{1}{2}$ ড্রাম।

ইহার অতি অল্পাংশ, তিনভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তুলি করিয়া লাগাইবে। প্রত্যেক বারে নূতন তুলির প্রয়োজন।

* * * * * *

সর্প দংশন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গত জানুয়ারি মাসে, সর্প দংশনে প্রায় ৪৫ জন লোক মরিয়াছে। গত বৎসর ঠিক ঐ সময়ে অতজন লোক মরিয়াছিল, সর্প দংশনের কি একটা যথার্থ ঔষধ বাহির হয় না?

* * * * * *

অতিসারের ঔষধ। নিম্ন লিখিত ঔষধটী ভরতপুর "মেওলি রেজিমেণ্টাল" হাসপাতালে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ইহা অতিসার রোগে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছেঃ—

কুইনাইন সল্ফ—১ গ্রেণ।

পলভ্ ইপিক্যাক কোং—৫ গ্রেণ।

এমন্ ক্লোরাইড্—১০ গ্রেণ। চারি ঘণ্টান্তর সেবনীয়।

* * * * * *

ওলাউঠা চিকিৎসা "মেডিক্যাল রিপোর্টারে" কে, বাসুদেবরাম, ওলাউঠা চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ওলাউঠা রোগে প্রতিবৎসর কত শত লোক যে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার সংখ্যা নাই। ডাক্তারেরা সকলেই আপনাপন মতে ওলাউঠা চিকিৎসা করিতেছেন, একটার পর একটা ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন, যে টার একটু উপকার প্রাপ্ত হন, সেটা কিছুদিনের জন্য ব্যবহার করেন, আবার সেটা বদলাইয়া আর একটা ধরেন, এইরূপে ওলাউঠা চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত ওলাউঠার প্রকৃত ঔষধ আবিষ্কৃত হইল না। ওলাউঠা কর্ত্তৃক ক্রমাগত আক্রমণে, উহার উৎপত্তির কারণ না জানিলেও, লক্ষণাদির সহিত আমরা বিশেষ অভ্যস্ত। সুতরাং এ সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাসুদেব রাম বলেন যে "টারপিন তৈল" ওলাউঠার মহৌষধ। "থেরাপিউটিক্সে" আমরা জানিতে পারি যে, ইহা প্রতিষেধক, সঙ্কোচক এবং মূত্রকারক। ইহার প্রতিষেধক ক্রিয়া ওলাউঠার উপর বিশেষ কার্য্য করে, উপসর্গ সকল শীঘ্র দূরীভূত হয়, এবং সঙ্কোচক গুণ থাকায় ভেদ-বমনাদি নিবারণ করে এতদ্ভিন্ন ইহা মূত্রকারক।

তিনি নিম্নলিখিত ঔষধটী ওলাউঠা রোগে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ—

টারপিন তৈল—২০।৩০ বিন্দু।

মিউসিলেজ—যথা প্রয়োজন।

স্পিরিট ইথর নাইট্রিক—২০ বিন্দু।

স্পিরিট ক্লোরোফরম—১৫ বিন্দু।
টিং ডিজিটেলিস্—৫ বিন্দু।
জল—(মোট) এক আউন্স।

অবস্থানুসারে দুইএকঘণ্টা অন্তর সেবন করা বিধেয়।

তিনি বলেন, যে "আমি পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সঙ্গে ক্লোরোডাইনও ব্যবহার করিতাম, কিন্তু পরে দেখিলাম যে, উহাতে উপকার হইতে অপকারের আশঙ্কা অধিক"। কেননা অনেক রোগী, শীঘ্র রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য একেবারে অনেকটা করিয়া ঔষধ সেবন করিয়া ফেলে এবং ক্লোরোডাইনে মর্‌ফিয়া থাকাতে বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয়। অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলেও রোগী শীঘ্র আসন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তিনি বলেন "আমি পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইহার দ্বারা বিস্তর রোগী আরোগ্য লাভ] করিয়াছে। তারপিন তৈলই এ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।"

*　　*　　*　　*　　*　　*

শ্বাসকাশ (হাঁপানি) রোগে আইওডাইড্ পটাসিয়ম। সার্জ্জন মেজর ডব্লিউ রয়টার বলেন যে, তিনি হাঁপানি রোগে আইওডাইড্ অব পাটসিয়ম্ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মতে নিম্নলিখিত ঔষধটী উক্ত রোগের সকল অবস্থাতেই বিশেষ উপকারী:—

পটাস আইওডাইড—১০ গ্রেণ।
স্পিরিট এমন এরোমেটিক—২০ বিন্দু।
স্পিরিট ইথর সলফ—২০ বিন্দু।
টিং বেলাড্রনা—৫।১০ বিন্দু।
কর্পূরের জল (সমষ্টি) ১ আউন্স।

হাঁপানির (ফিটের) সময় সেবন করিতে হইবে।

সৎসঙ্গ।

স্পর্শমণি স্পর্শ করাইয়া ধাতু মাত্রকেই হেম করা যাইতে পারে সকলেই শুনিয়াছেন ; বাস্তবিক স্পর্শমণি কি এবং কিরূপ, আমরা তাহার কিছুই জানি না ; তবে ঐ নামটী শুনিয়া উহাতে হেম পাওয়া যায় এই শ্রুতেতিহাস শ্রবণ করিয়া এতল্লাভাশায় আমরা বড়ই ব্যাকুল। এই স্পর্শমণি-স্পর্শে-স্পর্শনীভূত ধাতু মাত্রই স্বুবর্ণ হইয়া যায়, অপর জিনিষ হয় না ; তাই উহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয় মাত্র, আগুণ নির্ব্বাণ বা আকাঙ্ক্ষার, নিবৃত্তি হয় না ; আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইলে সন্তোষ লাভ কিরূপে সম্ভবপর ? তাই সংসার সম্ভোগের মধ্যে, বাসনার আবাসে প্রকৃত সুখ আশা, আর মরীচিকায় জল আশা উভয়ই সমান ; উভয়ই তৃষ্ণার অনল প্রজ্বলিত করিয়া দেয়, কিন্তু কেহই উহার নির্ব্বাপণের জন্য ব্যগ্র নহে। তবে আমাদের এরূপ স্পর্শমণির প্রয়োজন কি ? আমরা এমন স্পর্শমণি চাহিব যাহার স্পর্শে অবিরল ধারে তরল হেমের মহাসাগর বহিতে থাকিবে ; আর পার্থিব হেমের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না এবং অজস্র বর্ষণে ডুবু ডুবু হইয়া আমাদের ভবের তৃষ্ণা নিবিয়া যাইবে। তাই শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেব, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সমানীত স্বর্ণ গাড়ু অবলোকনে বলিয়াছিলেন "আমি ও জল চাইনা, উহাতে আমার পিপাসার নিবৃত্তি হইবে কেন ? অর্জ্জুন ! তুমি জ্যা কর্ষণ করতঃ পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার, অবিরাম জলোচ্ছাস-সেই পবিত্র-সলিলা স্রোতস্বতীর অজস্র ধারা আনিয়া আমার জীবনের চির পিপাসা ও জ্বালা যন্ত্রণা নিবাইয়া দেও"। তাই আমরা স্পর্শমণি চাহিব তো এমন চাহিব, যেন উহার স্পর্শে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হেমময় হইয়া—আমাদের লৌহময় দেহ কাঞ্চন হইয়া হেমাকারে চির নিবৃত্তি সাধন করিয়া দেয়। জিজ্ঞাসা করিবে এমন স্পর্শমণি কোথায় পাইব। উত্তরে ভক্ত বলিবেন—"সাধুদিগের পবিত্র আবাসে-প্রেমের ঘরে। উহাঁদের পদধুলিই ঐ অজস্র হেমবর্ষণের জনমেঘ। তাই বলি সাধুসঙ্গই ঐরূপ স্পর্শমণির আকর এবং ঐ

স্পর্শমণির জন্য ব্যাকুল হই—এই প্রাণের বাসনা ও জীবনের কর্তব্য-তাই । চৈতন্যদেব বলিয়াছেন——

"সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভগবত-নাম
ব্রজেবাস, এইচারি সাধন প্রধান.
এইচারি মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়.
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়"।

সঙ্গই আমাদের জীবনোন্নতির ভিত্তি বা সুখ সোপান । সঙ্গ প্রভাবে আমাদের হৃদয় দিন দিন নূতন নূতন পরিবর্ত্তণে নূতন নূতন ভাব ধারণ করে। কিন্তু উহার অনুভূতি, পুকুরের নীচে যে অদৃশ্য গুপ্ত উৎস থাকে, তদ্‌গমের ন্যায় সহজে অনুভূত হয় না ; ঐ উৎস জলে হৃদয়রূপ সরোবর পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ শিক্ত না হইলে, উহার অনুভূতি অসম্ভব। হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে, সদসজ্জনিত সুধা ও বিষ এই বৃক্ষদ্বয়, সুবিশাল সংসার সাগরের দুইপাড়ে বিপরীত গুণ সম্পন্ন দুই ফল ফলাইয়া দুই সঙ্গের তারতম্য দেখাইয়া দিবে। একদিকে অননুভূত পূর্ব্ব স্বর্গের পূর্ণালোক, অপরদিকে নরকের বিঘোর অন্ধকার, একদিকে পূর্ণচন্দ্রের শারদছবি ও বিমল জ্যোৎস্না, অপরদিকে অমার আকাশে মেঘের আচ্ছাদন সম্ভূত ঘোর তমসা, একদিকে পুণ্যের ক্ষীরদ-সিন্ধু এবং অপরদিকে পাপের বিষ-সমুদ্র প্রবাহিত, এক দিকে জগদ্বন্ধু নরহরি বিপদভঞ্জন শ্রীহরির পদ-পঙ্কজ এবং অপরদিকে সয়তানের নারকীয় পৈশাচিক প্রলোভন প্রদর্শিত হইয়া—দুইএর তারতম্য বুঝাইয়া দিয়া তোমার জীবন সমস্যা মিটাইয়া দিবে, এবং জ্ঞাননেত্র ফুটাইয়া দিয়া তোমার হৃদয় তমসা উড়াইয়া কালমেঘের অঙ্কে নিহিত করিবে। প্রেমময়ের প্রেমরূপ-জাহ্নবী জলে অবগাহন করিলে তোমার হৃদয়ের সকল জ্বালা নিবিয়া যাইবে। তাই বলি—

"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ"।

অনেকে বলিবেন, সাধু এমন স্পর্শমণি কেমন করিয়া হইল যে, তাঁহার স্পর্শমাত্রেই হৃদয় ভরিয়া, জগৎ ভরিয়া—পবিত্র প্রেমের বিমল হেমস্রোতে স্বর্গীয় মন্দাকিনীর প্রবাহ বহিতে থাকিবে, সমস্ত কলুষরাশির

জানাইয়া লইবে। উত্তরে বলিব যাহা আছে তাহা সঙ্গকর, তবেই বুঝিবে বিচারে মিলবেনা। স্বয়ং উপলব্ধি কর; পরের রসনায় আস্বাদিত রসগোল্লার স্বাদ কথা শ্রবণ করিলেই তুমি স্বাদের কি বুঝিবে? সহজে সাধুকে চিনিয়া লওয়া যায় না। সাধু, তোমার আমার মত বক্ বক্ করিয়া রাস্তাঘাটে স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য পাগল নহেন। প্রাণের কথা, মনের কথা খুলিয়া বলিলে লোকে শুনিবে না, বলিবে পাগল; তাই সাধু সকল সময়ে সকলের নিকট, আবেগের স্রোতে প্রাণ ভাসাইয়া—হৃদয়ের নির্ঝর হইতে আপনার অভীপ্সিত প্রেমের নদ, অস্থানে দিয়া প্রবহমান করিতে চান না। চোরে চোরকে এবং সাধু সাধুকে সহজেই চিনিয়া লইতে পারে।

"সাধুর নদী বহে তাই প্রেমিকের দেশে"।

তাই সাধু দেখিলে সাধুর হৃদয় প্রেমতরঙ্গে নাচিতে নাচিতে কি রসে তাঁহাকে ডুবাইয়া দেয়, তাহা যে একবার সেই সুধারসের প্রেম নদীতে ডুবিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে; নারিকেলের অন্তরতম প্রদেশে কি রস আছে, তাহা যে একবার পান করিয়াছে, সেই বুঝে; অন্যে বুঝিবে কি রূপে? সাধুর উপরে কিছুই নাই; নারিকেলের মত ভিতরে ঢুকিয়া যাও, যাহা পাইবে, তাহা অতুল ও জগতাতীত তাহাতে তোমার ভবের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া দিবে।

যিনি একটু উপরে উঠিতে পারিয়াছেন, যাঁহার লক্ষ্য সংসারের শিকার ভূমি অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধগামী হইয়াছে, তিনি নিম্নস্থ দ্রব্যাদি অসার, অনিত্য ও নরকের সঙ্গী বলিয়া ত্যাগ ও উপেক্ষা করেন। তাই চাতক সামান্য জলে পিপাসার শান্তি করিতে চায় না; কবে বৃষ্টি হইবে এই আশায় প্রাণ বাঁধিয়া উর্দ্ধমুখী হইয়া কাল যাপন করে:—উর্দ্ধদৃষ্টি-সীতাও তাই রাবণের কুৎসিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন—

"চাতকী কি কভু মেঘ-বারিআশা, ত্যজি পান করে ভূতল বারি"?

আবার ক্ষণ মাত্রেই পিপাসায় কাতর হইয়া উষ্ণ, দুর্গন্ধ ও অপরিস্কৃত জল পানকারী মৃগ, অচিরেই উহার বিষময় পরিণাম অনুভব করিয়া থাকে। তদ্রূপ যিনি একদিন সৎসঙ্গ করিয়া, তাহার অদ্ভুত মাহাত্ম্য

বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কি আর কুসঙ্গ করিতে বাসনা যায়? তিনি উপরে উঠিয়াছেন, তিনি উর্দ্ধনেত্র। ধীরবায়ু উপরেই থাকে; যদি নীচে আসে, সে কেবল সময়ে লোক বিশেষের শারীরিক উপকারার্থ। সাধু ভগবানের আবাসের লোক; তবে যে সময়, সময় ভূলোকে নয়ন পথে পড়িয়া থাকেন, সে কেবল লোক বিশেষের প্রেমের কাঙ্গালীদের মনস্তাপ, মনোমালিন্য ও নরক—ফলপ্রদ কুসংসর্গের বিষ-দোষ নিরাকরণ করিয়া দেওয়ার জন্য। সৎসঙ্গের আলোকে তাহাদের দৃষ্টি উর্দ্ধে প্রধাবিত করিয়া আকাঙ্ক্ষার চির নিবৃত্তি সাধন করিয়া দিবার জন্য। তাই বলি সৎসঙ্গ ধর্ম্মপথের সহায় এবং অসৎসঙ্গ ধর্ম্মপথের কণ্টক। সৎসঙ্গের বিমল জ্যোৎস্নায়, অবিদ্যান্ধকার ঘুচিয়া যায়। সাধুসঙ্গের ফল প্রদর্শন করিতে আমরা অনেক দূর যাইব না; জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রত্যেক সাধুর হৃদয়ে জাগরিত আছে। প্রভুর যেমন প্রেমমাখা কথাটী—

"মাল্লি মাল্লি কলসীর কাঁদা, তাইবলে কি প্রেম দিবনা"।

তাহার শ্রুতিও তেমন হৃদয় গলান। তাই জগাইমাধাই গলিয়াছিল। নারদও সাধুসঙ্গে নবজীবন লাভ করেন। তিনি একটী দাসীর গর্ভজাত ছিলেন, প্রভু কর্ত্তৃক সাধুসেবায় নিযুক্ত হইয়া, সাধুদিগের পদধূলি মস্তকে ধারণ, উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন এবং তাঁহাদের মুখে কৃষ্ণনামামৃ-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহার জীবনের কলুষরাশি তিরোহিত হইয়া অবিদ্যান্ধকার ঘুচাইয়া দেয়—চিদানন্দের বিমল প্রেম—সলিলে জীবনের তৃষ্ণা নিবাইয়া, ভগবানে তাঁহার অভূত পূর্ব্ব অভিরুচি জন্মাইয়া দেয়, তিনি কৃষ্ণচরণাম্বুজে ভক্ত ভ্রমর হইয়া, বিমলানন্দে জীবন যাপন করিতে থাকেন। কে না জানেন প্রহ্লাদের সঙ্গ করিয়া তাহার গুরু প্রভৃতি কেমন ভাবে, ভববন্ধন মোচন রূপ, ভগবৎ প্রেমলাভ করিয়া অনায়াসে ভবসিন্ধু পার হইয়া গিয়াছেন।

সাধু, সুশীতল জল বা প্রজ্বলিত অনল। আবেগের সহিত, প্রবৃত্তির সহিত, ভক্তির সহিত পানকর, প্রাণের তৃষ্ণা মিটিয়া যাইবে। আবার বিরুদ্ধ ভাবে তাঁহারদিকে অগ্রসর হও দেখিবে, তিনি প্রজ্বলিত অনল।

তোমার মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সকল পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া দিবেন। সাধু, গৃহপোষিত মেষবৎ নির্জীব ও সহিষ্ণু—আবার গুহাস্থিত ভীমবল স্বাধীন সিংহ। তিনি তোমাকে এবং তুমি তাঁহাকে—এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া, প্রেম নয়নের সরল কটাক্ষে তাকাও—প্রেমালিঙ্গনে প্রাণ গলাও, দেখিবে তিনি তোমার ক্রীতদাস, পোষিত মেষ। কিন্তু তুমি পাপী, অহঙ্কারী উদ্ধত ও অবিনীত ভাবে বল প্রয়োগ করিতে তাঁহার নিকট যাও, দেখিবে তিনি অজেয় সিংহ—পরাক্রমশালী বীর-পুরুষ। তোমার সমস্ত বেগ, বল, ঔদ্ধত্য একেবারে পবনবেগে তৃণাংশবৎ উড়াইয়া ফেলিবেন ; তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া তোমাকে ঐ মেষের সহিষ্ণুতা বা জিতের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে কথাটী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

একদা ভক্ত হরিদাস, বেনা পোলের একটী নির্জ্জন বনে সাধন করিতে ছিলেন। স্থানীয় রাজা রামচন্দ্র খান, তাঁহার বৈরাগ্য ধর্ম্ম নষ্ট করার মানসে পরম রূপবতী একটী বেশ্যাকে তাঁহার আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। অশেষ বেশভূষা সম্পন্না বেশ্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় পাপ বাসনা অবগত করাইলে, বাবাজি, আপনার দৈনিক নিয়মিত তিন লক্ষ নাম করণ সমাপ্ত হইলে তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন, এই আশ্বাস বাক্যে তাহাকে সেই স্থানে বসাইয়া রাখিলেন। নাম করিতে করিতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল ; বেশ্যা ভগ্ন মনোরথ হইয়া স্ববাসে প্রতি নিবৃত্ত হইল। দ্বিতীয় দিন পুনরায় ঐরূপ প্রেরিতা হইয়া, বেশ্যা সমস্ত রাত্রি বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে—মধ্যে মধ্যে নিজেও হরিনাম করিতে লাগিল। রজনী প্রভাতে প্রত্যাগতা বেশ্যা, খান সাহেবকে, হরিদাসের-হরিভক্তির কথা সবিশেষ অবগত করাইল। কিন্তু পাপীর মন ভাব বিলাস—সয়তান চায় নরকে রাজত্ব, তাই হরিদাসের হরিকথায় রামচন্দ্রের মন ভিজিবে কেন? যাহার হৃদয়াকাশ ঘোরঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, সুবিমল চন্দ্রালোক তুল্য ভগবন্নামালোক তাহার হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচাইবে কিরূপে? তাই রাজা রামচন্দ্র সাধুর মন প্রলোভিত করিয়া তাঁহাকে নরক পথের পথিক করিবার নিমিত্ত,

তৃতীয় দিবসও ঐ বেশ্যাকে তদাশ্রমে প্রেরণ করিল। এ দিবস বেশ্যাকে দেখিয়াই হরিদাস বলিলেন "কয়েক দিন যাবত তোমাকে বড়ই কষ্ট দিতেছি; অদ্য অচিরেই নাম জপ সুমাধা করিয়া তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব; একটু অপেক্ষা কর"। সাধুসঙ্গের কি অপার মহিমা—কি বিমল জ্যোতিঃ—যাহার প্রভায় বেশ্যার হৃদয়তমসা, মারুতবেগে নভঃস্থিত জলদরাশির ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। বেশ্যা বুঝিল যে, তাহার অপরিসীম অপ্সরোপম—রূপলাবণ্য কেবল রঙ্গরসের লীলাস্থলী সংসারবাসী—বিলাসী—নারকীদের মন ভুলাইবার জন্য। যাঁহার হৃদয় একবার বিমলানন্দময় সচ্চিদানন্দের পবিত্র প্রেমকটাক্ষ—প্রেমালিঙ্গন পাইয়াছে;—একবার সেই প্রেমের বিমলরসে ডুবিয়াছে, তাঁহার নিকট এই অসার অনিত্য নারীসম্ভোগরূপ পৈশাচিক বৃত্তিজনিত ক্ষণসুখ নরকের শ্বাসরোধ যন্ত্রণা হইতেও অধিক কষ্টপ্রদ ও ভয়াবহ। এই জ্ঞান লাভ করিবা মাত্র বেশ্যা অনুতাপে হৃদয়ের কষ্টে অধীর হইয়া হরিদাসের চরণ যুগলে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিল, "প্রভো! আমায় ক্ষমা করুন্, আর না, আর আমি জীবনে ঐরূপ পাপানুসরণে ব্রতী হইব না। আজ হইতে আমি আপনার চরণের দাসী; আমাকে ও চরণে আশ্রয় দিয়া ভবার্ণবের কাণ্ডারী, শ্রীহরির শ্রীচরণ পাইবার পথ দেখাইয়া দিন। আমি অতি পাপিনী, পিশাচী, নরকের কীটানুকীট; আপনি সাধু—স্বর্গীয়দেবতা—নন্দনকাননের পারিজাত কুসুম। আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আপনার স্বর্গীয় জ্যোতিতে আমার হৃদয়ান্ধকার ঘুচাইয়া দিন,—পারিজাতের সৌরভে ভুলাইয়া আমার বাসনা-বন্ধন ছুটাইয়া দিন"। শুনিয়া হরিদাসের হৃদয় কাঁদিয়া—উঠিল হৃদয়ে দয়ার স্রোত বহিতে লাগিল। তিনি আশ্বাস বাক্যে তাহাকে বুঝাইয়া ভূমি হইতে তুলিলেন এবং পবিত্র ভগবান্নামে, তাহাকে দীক্ষিত করিয়া ভবের পাপ শৃঙ্খল ছেদন করিয়া দিলেন। বারবিলাসিনী আজ উদাসিনী সন্ন্যাসিনী। তাই দেখুন, সাধুর সঙ্গ, অতুল কি না? হৃদয় সরোবরের গুপ্ত উৎস কি না? জীবনো-ন্নতির সুখসোপান কি না! জীবন সরোবরের প্রেকমল ফুটাইবার

সুখ সূর্য্য কি না ? প্রেমসুবর্ণের অকৃত্রিম স্পর্শমণি কি না ? তাই সাধু বলিয়াছেন—

নলিনীদলগত দলমতি তরলং। তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং—
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকাভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।

শ্রীমধুসূদন সেন।

দন্তমঞ্জন প্রস্তুত প্রণালী।

দন্তরোগ প্রায় অধিকাংশ লোকেরই আছে। দাঁতের গোড়া শক্ত হইবার জন্ত দন্তমঞ্জন ব্যবহার করা যায়। এক্ষণে আমাদের পাঠক বর্গকে দুই একটী দন্তমঞ্জন প্রস্তুত প্রণালীর বিষয় বিদিত করিব। দন্তমঞ্জন প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে যে যে দ্রব্য আবশ্যক, তাহা উত্তমরূপে অগ্নি বা রৌদ্রোত্তাপে শুষ্ক এবং খলে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট চালুনিতে ছাঁকিয়া লওয়া উচিত।৪।৫টি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক দ্রব্য উক্তরূপে স্বতন্ত্র চূর্ণ করিয়া পরে একত্র উত্তম রূপে মিশ্রিত করা আবশ্যক। ১টি বোতলের মধ্যে সমুদয় দ্রব্য পুরিয়া কিছুক্ষণ বোতলটি নাড়িয়া চালুনি দ্বারা ছাঁকিলে, অনায়াসে সমুদায় দ্রব্য উত্তম রূপে মিশিয়া যায়। কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা প্রকারান্তরে জলদ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হয়। যথা, খড়ি, প্রবাল ইত্যাদি। খড়ি মাটি অপরিষ্কার থাকিলে জলে নিক্ষেপ করিলে, ময়লা জলের সহিত মিশিয়া যায় এবং খটিকা বিশুদ্ধাবস্থায় থাকে কারণ খড়িমাটি জলের সহিত মিশ্রিত হয় না। যে দন্তমঞ্জনে অম্ল বা লবণ অম্ল (এসিড্ ও এসিড্ সলট্স্) থাকে তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত নহে। শিশুদের সূক্ষ্মচূর্ণ ব্যতিত অন্তরূপ দন্তমঞ্জন ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নহে। "হেভি কার্বনেট্ অব্ ম্যাগ্নিশিয়া" মিশ্রিত দন্তমঞ্জন উহাদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। বাজারে আজ কাল বহুল সুবাসিত ও দন্তমূল কঠিন হইবার জন্ত "পেটেণ্ট টুথ পাউডার বা দন্তমঞ্জন" বিক্রিত হইতেছে "চিকিৎসক ও সমালোচকের" গ্রাহকবর্গকে

আমরা এক্ষণে উক্তরূপ এক একটি দন্তমঞ্জনের প্রস্তুত প্রণালী মধ্যে মধ্যে জ্ঞাত করিব। বিলাতী দন্তমঞ্জন প্রস্তুত করিতে অধিক ব্যয় পড়ে ও আমাদের পক্ষে অনেক দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয় পরন্তু সাধারণের রুচি অনুসারে আমরা উভয়বিধ প্রয়োগরূপই লিখিব। দন্তমঞ্জন প্রস্তুতার্থে অনেকানেক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় আমরা ক্রমশঃ এক একটির গুণাগুণ বর্ণনা করিব। যথাঃ—

১। পচন নিবারক দন্ত-মঞ্জন। বিশুদ্ধ খটিকা চূর্ণ (খড়ি) ২ আউন্স বা এক ছটাক; শুষ্ক ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ ১০ গ্রেণ, লবঙ্গ বা দারুচিনির তৈল ৫ বিন্দু। কাঁচ বা পাথরের খলে, খড়ি ও ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ উত্তমরূপে মিশাইয়া পরে তৈল মিশাইয়া লইবে। আবশ্যক হইলে লেভিগেটেড্ বোল্ বা গেরিমাটি দ্বারা রং করিয়া লইতে পারা যায়। দন্তে ক্ষত থাকিলে ইহা ব্যবহার করিতে পারা যায়। যে সমুদায় দ্রব্য সঙ্কোচক, পচন নিবারক; রক্তরোধক ও দুর্গন্ধ হারক, তৎসমুদায় দ্রব্যই দন্তমঞ্জনার্থে ব্যবহার করা উচিত। শুষ্ক ও গুড়া দ্রব্য দন্ত-মঞ্জনের সহিত মিশাইতে হয়, তরল পদার্থ উক্ত গুণ বিশিষ্ট হইলেও মিশ্রিত করা উচিত নহে। কারণ চূর্ণ পদার্থের সহিত তরল দ্রব্যের সংমিশ্রনে উহা সংযত হইয়া যাইতে পারে কিম্বা তৎক্ষণাৎ সংযত না হইলেও অল্প ঠাণ্ডা লাগিলে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভব। দন্ত-মঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বিস্তৃত মুখ বিশিষ্ট (ওয়াইড্ মাউথ) কাঁচের ছিপিযুক্ত শিশিতে ও উহা শুষ্ক স্থানে রাখা উচিত। কাঁচের ছিপি যুক্ত শিশিতে দন্ত-মঞ্জন রাখিলে উহার গুণ শীঘ্র নষ্ট হয় না। দন্ত-মঞ্জনার্থে "দাঁতন কাঠি" বা টুথ্ ব্রস্ ব্যবহার করা ভাল। নিম গাছের "দাঁতন-কাঠি" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রত্যহ দুইবার দন্ত-মঞ্জন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য পরন্তু যাঁহাদের দন্তরোগ আছে বা যাঁহারা অত্যন্ত তাম্বুল সেবী, তাঁহাদের ৪।৫বার দন্ত-মঞ্জন করা উচিত। যাঁহারা দাঁত বান্ধাইয়াছেন তাঁহাদেরও ঐ নিয়ম পালন করা উচিত।

ডাক্তার রায়ের কৃত দন্ত রোগনাশক সৌগন্ধযুক্ত দন্তমঞ্জন। নং ১

বিলাতী প্রকরণে—

বিশুদ্ধ খড়িমাটি* চূর্ণ, ৮ আউন্স বা ১ পোয়া; ফটকিরি* (চাটুতে ভাজিয়া খই) অথবা ট্যানিক্ এসিড্* উত্তম চূর্ণ, এক্‌ষ্ট্র্যাক্ট্ র‍্যাটানি*; গন্ধবোল* চূর্ণ; গেরিমাটি* চূর্ণ; সোহাগার খই* চূর্ণ; কর্পূর চূর্ণ প্রত্যেক ½ আউন্স; দারুচিনি ও লেবুর তৈল প্রত্যেক ৫।১০ বিন্দু করিয়া; গোলাপী আতর ১০। ১৫ বিন্দু।

(* চিহ্নিত) কঠিন দ্রব্য গুলি স্বতন্ত্র চূর্ণ পূর্ব্বক, পরে সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পরিশেষে সুগন্ধি তৈল গুলি মিশাইতে হইবে। দন্তরোগ থাকিলে উক্ত সুগন্ধি তৈলের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিলে আরও অধিক উপকার হইবার সম্ভব। দারুচিনি তৈলের পরিবর্ত্তে পিপারমেণ্ট্ অয়েল্ ১০ বিন্দু বা মেন্থেল ১০। ১৫ গ্রেণ; এবং কার্বলিক্ এসিড কিম্বা ক্রিয়েজোট্ ১০। ১৫ বিন্দু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ফটকিরী ও সোহাগার খই প্রস্তুত করিয়া লইলে উহার ক্রিয়া অধিক ফলপ্রদ হয়। ১ খানি কটাহ (কড়া) বা চাটুতে অনুমান ½ আউন্স্ ফটকিরী বা সোহাগা চূর্ণ করিয়া ভাজিয়া লইলে উহা খইয়ের ন্যায় হইবে। পরে উক্ত দ্রব্যগুলি পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া দন্ত-মঞ্জনের সহিত মিশাইতে হয়। গেরি-মাটী অত্যন্ত কঠিন; লোহের হামামদিস্তায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক চূর্ণকে সূক্ষ্ম চালুনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে দন্ত-মঞ্জনার্থে ব্যবহার করা যায়। রেক্টিফায়েড্ স্পিরিট অর্থাৎ শোধিত সুরা ২।৫ বিন্দু, ১টি কাঁচের খলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে কর্পূর মাড়িলে, চূর্ণ হইয়া যায়। যদি ২।৫ বিন্দুতে উত্তম চূর্ণ না হয় তবে আরও ২।৫ বিন্দু সুরা দিলে কর্পূর উত্তম চূর্ণ হইয়া যাইবে। সমুদায় চূর্ণ পদার্থ একত্র করিয়া ১টি বড় খলে রখিয়া সুগন্ধ তৈল, ধীরে ধীরে নিক্ষেপ করিয়া উক্ত চূর্ণের সহিত মিশাইয়া লইতে হয়।

উক্ত দন্তমঞ্জনের ব্যবহার—যাঁহাদের দন্তে ক্ষত আছে, তাঁহারা প্রত্যহ ২।৪ বার করিয়া এই মঞ্জন দ্বারা দন্ত মার্জ্জিত করিবেন, যদি দন্তমঞ্জন দ্বারা আরোগ্য সম্ভব হয়, তবে ইহাদ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবেন। প্রত্যেক বার উক্ত মঞ্জন দ্বারা ৫ হইতে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত দন্ত মাজিয়া পরে মুখ ধৌত করিবেন। দন্ত মাজিবার পূর্ব্বে উষ্ণ এবং মঞ্জনের পর মুখ ধৌত করিবার সময় শীতল জল ব্যবহার করিতে হইবে। দাঁতের গোড়ায় বেদনা জনক ক্ষত না থাকিলে টুথ ব্রস দ্বারা মঞ্জন ব্যবহার শ্রেয়ঃ। এই মঞ্জনের আর একটী গুণ এই যে, দন্ত ক্ষতের সহিত যদ্যপি জিহ্বায় ক্ষত থাকে তাহা হইলে এই মঞ্জনের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া কুল্য করিলে আরোগ্য হইবার সম্ভব। যদি পেটের অসুখ অর্থাৎ উদরাময় থাকে তবে এই মঞ্জনের ৫ গ্রেণ শিশুদের, ১০ গ্রেণ বালক এবং ২০ গ্রেণ যুবা বয়স্কদিগের অল্প জলের সহিত দিবসে ৩।৪ বার সেবন করাইলে সামান্য উদরাময় আরোগ্য হইতে পারে। কঠিন উদরাময়ে, জলের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধ ছটাক আঁরবি গঁদের মণ্ড অর্থাৎ মিউসিলেজ অব্ একেসিয়া এবং প্রতি মাত্রায় ১০ বিন্দু লডেনম্ অর্থাৎ অহিফেনের অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। শিশুদের ঐ চূর্ণ মাত্রার সহিত মিউসিলেজ্ ও ২ বিন্দু অহিফেনের অরিষ্ট প্রয়োগ করা যায় ; পরন্তু শিশুদের অহিফেনের অরিষ্টের পরিবর্ত্তে ৫ বিন্দু, খদিরের অরিষ্ট বা ২ গ্রেণ বা ১ কুঁচ খদীর চূর্ণ প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। কোন স্থান সামান্য পরিমাণে কাটিয়া গেলে, অপর কোন দ্রব্য না পাইলে এই মঞ্জন চূর্ণ, ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিয়া বান্ধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সামান্য রক্ত স্রাব রোধ হইবে।

বারান্তরে—ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ ও ক্লোরোডাইন্ প্রস্তুত প্রণালী ও উহাদের ক্রিয়াদি অর্থাৎ গুণাগুণ ও ব্যবহার প্রণালী বর্ণিত হইবে।

তারা।

চেওনা চেওনা তারা তোমরা ভারত পানে,
সদন্ত বারণ করে বঙ্গবালা অভিমানে।
তোমরা স্বর'গ বালা,
পবিত্রতা হৃদে ঢালা,
স্বরগ বাসীকে তোষ সুধামিষ্ট আলাপনে,
চেওনা চেওনা তারা তোমরা ভারত পানে।
চেওনা চেওনা তারা তোমরা ভারত পানে,

পূত তোমাদের দেশ,
পাপের নাহিক লেশ,
পরহিতে ব্রতী সব পর হিংসা নাহি জানে;
কলুষিত হৃদি পূর্ণ চেওনা ভারত পানে।
চেওনা চেওনা তারা তোমরা ভারত পানে,
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কোথা গেছে কেবা জানে।
এবে ঘোর কলিকাল,
নর সব পশু পাল,
সমস্ত জীবন যাপে শুধু স্বার্থ অম্বেষণে,
পরহিতে প্রাণ দিতে ভুলিয়াছে হিন্দুগণে।

চেওনা চেওনা তারা তোমরা ভারত পানে,
নাহি পবিত্রতা লেশ,
শুধু হিংসা শুধু দ্বেষ,
মোহ মদে মত্ত সবে হিতবাণী নাহি শুনে,
ন্যায় পথ ভ্রষ্ট এরা চেওনা ভারত পানে।
চেওনা চেওনা তারা তোমরা ভারত পানে,
এদেশের সতী নারী,
তোমাদেরি সহচরি,

পাষণ্ডের কাণ্ড দেখে লুকায়েছে গৃহ কোনে,
পূতোজ্জ্বল মুখখানী আবরি অবগুণ্ঠনে।

তথাপি চাহিয়া আছ তোমরা ভারত পানে,
কি আশ্চর্য্য ভয়নাই নিরখি পাষণ্ডগণে!
তোমাদের হিয়া তারা,
সরলতা দিয়া গড়া,
বুঝিতে অক্ষম এরা কত কপটতা জানে;
সরল অন্তরে চেয়ে নিঃশঙ্ক নির্ভয় প্রাণে।

চেওনা চেওনা তারা তোমরা ভারত পানে,
নিরখি এ অধোগতি কত ব্যাথা পাও প্রাণে।
পাও শুধু পরিতাপ,
দাও শুধু অভিশাপ,
পৈশাচিক কাণ্ড দেখে যাও চলে ভগ্ন মনে,
তাই বলি বার বার চেওনা ভারত পানে।
চেওনা চেওনা তারা তোমরা ভারত পানে,
তোমাদের কোপানলে,
সকলই গেল জ্বলে,
আগুণ লাগিলে বনে সদসদ্ নাহি মানে,
ফিরে যাও ফিরে যাও চেওনা ভারত পানে।

শুনগো নক্ষত্রবালা করি এই নিবেদন,
তোমরা পথিকে নাকি কর পথ প্রদর্শন,
দৃষ্টি করি তব প্রতি,
নাবিকেরা করে গতি,
অকুল অর্ণবে নাকি হও 'দিক্ দরশন',
পথহারা হিন্দুগণে কর পথ প্রদর্শন।

শুনগো নক্ষত্র বালা করি এই নিবেদন,
কৃষিজীবী মৃগজীবী ছিল যবে আর্য্যগণ?

ছিল যবে মহাবনে,
মিলি নানা পশু সনে,
তুমি নাকি তাহাদের কর পথ প্রদর্শন,
সেই পথে উন্নতিতে করে তারা পদার্পণ।

শুনগো নক্ষত্রবালা করি এই নিবেদন,
সিংহ ব্যাঘ্র পশু পাল,
বনে রহে চিরকাল,
মনুষ্যত্ব পেলে আর্য্য পেয়ে তোমা দরশন,
পথহারা হিন্দুগণে কর পথ প্রদর্শন।

শুনগো নক্ষত্রবালা করি এই নিবেদন,
স্মৃতি শ্রুতি রত্নে যাঁরা,
সাজাইয়া বসুন্ধরা,
বীরদর্পে একছত্রে করিয়া রাজ্য পালন।
রাজসূয় যজ্ঞ কত করিগেছে সমাপন।
শুনগো নক্ষত্রবালা করি তোমা নিবেদন,
সেই আর্য্য বংশ এবে হতেছে অধোপতন।
ফিরাও কুপথ হতে,
লয়ে যাও আর্য্য মতে,
রাখুক আর্য্যের মান আর্য্যের সন্তানগণ,
পথহারা হিন্দুগণে কর পথ প্রদর্শন।

শুনগো নক্ষত্র বালা করি এই নিবেদন,
ন্যায় পথভ্রষ্ট হায় ভারত সন্তানগণ।
অকুল অর্ণবে তারা,
দিক্‌হারা কুলহারা,
কৃপাকরি তুমি তারা কর পথ প্রদর্শন,
যে পথেতে গিয়াছিল পুরাতন আর্য্যগণ।

শ্রীবিধুমুখী রায়।

চিকিৎসক ও সমালোচক।

মাসিক পত্র

১ম খণ্ড। } সন ১৩০২ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

আর্য্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

প্রথমকাণ্ড।—সেকাল ও একাল।

যখন ভোগবাসনাবিরত তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ধর্ম্মপিপাসু আর্য্যঋষিদিগের হস্তে রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রণয়নের গুরুতর ভার অর্পিত ছিল, যখন সেই সকল মায়ামোহ নির্ম্মুক্ত সর্ব্বদর্শী মহাত্মাদিগের প্রণীত শাস্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় পৃথিবী পালন করিতেন, যখন ক্ষণকালের জন্যও কেহ কর্ত্তব্যপালনে ঔদাসিন্য প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সেই, সত্য ত্রেতা দ্বাপর প্রভৃতি যুগ পরম্পরায় বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কয়জন লোককে চিররুগ্নাবস্থায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত? কয়জন লোকেই বা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া জননী ও জন্মভূমিকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া দিত? মন্বাদি শাস্ত্র প্রণেতাগণ বহুকাল পর্য্যন্ত দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতি তন্ন তন্ন রূপে সমালোচনা করিয়া এক একটী বিধিপ্রণয়ন করিয়াছিলেন। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য, মানবদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। আবার কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ এবং জাত্যনুসারে

ব্যক্তিগত প্রকৃতিরও প্রভেদ লক্ষিত হয়। সুতরাং একই প্রকার ব্যবস্থা, সকল দেশে সকল সময়, সকল প্রকার জাতির পক্ষে কখনও একান্ত উপযোগী হইতে পারে না। তুষার মণ্ডিত অত্যুচ্চ পার্ব্বতীয় প্রদেশের যে প্রকার নৈসর্গিক অবস্থা, তত্রত্য মানবদিগের দেহ মন এবং প্রকৃতিও ঠিক তদনুযায়ী গঠিত, কিন্তু জলপ্লাবিত উষ্ণ প্রদেশে এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগের অবস্থা আবার তাহার বিপরীত। যে সকল দেশে সরলভাবে চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া থাকে সেই সকল দেশ এবং তদ্দেশবাসী প্রাণীদিগের অবস্থার সহিত সুমেরু ও কুমেরু কেন্দ্রবাসী প্রাণীগণের সর্ব্বথা তুলনা হইতে পারে না। দুর্জ্জয়-লিঙ্গ (বর্ত্তমান দার্জ্জিলিঙ্গ) প্রভৃতি শীতপ্রধান স্থানে কখনও প্রত্যহ স্নান করা যায় না। তথায় স্নান করিবা মাত্রেই অমনি কর্ণশূল উপস্থিত হয়। কিন্তু কলিকাতা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে আবার দিনের মধ্যে তিনবার স্নান করিলেও কিছুমাত্র অসুখ লক্ষিত হয় না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, স্থানভেদে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিও ভিন্নরূপ হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ কর্ম্ম বা জাতিভেদেও যে শরীর ও মনের আংশিক অবস্থান্তর হইয়া থাকে এবং তাদৃশ অবস্থায়ও যে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মাদির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক তাহা সকলেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয় সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াই পূর্ব্বতন শাস্ত্রপ্রণেতাগণ নানাবিধ বিধি ব্যবস্থা অবধারণ করিয়া গিয়াছিলেন এবং এমন ভাবে সমাজ মধ্যে তৎসমুদায় পরিচালিত হইয়াছিল যে, পণ্ডিত মুর্খ সকলকেই বাধ্য হইয়া সর্ব্বদা তদনুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। কেহই তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না। আহার বিহার, নিদ্রা, জাগরণ, ধর্ম্মকার্য্যাদির অনুষ্ঠান এবং নিত্ত নৈমিত্তিক উপাসনা পদ্ধতি, ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি ছিল। তজ্জন্যই পূর্ব্বতন আর্য্যগণ সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারিতেন। অতি পূর্ব্বকালের কথা দূরে থাকুক স্বেচ্ছাচারী যবনদিগের রাজত্বকালেও হিন্দুসমাজে এতাদৃশ অকাল মৃত্যুর আবির্ভাব লক্ষিত হয় নাই। হিন্দু শাস্ত্রে ঐকান্তিক ভক্তিই ইহার একমাত্র কারণ।

বর্ত্তমান ইংরেজ রাজত্বেও যে দুই চারিটী লোক হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নিয়মাদির বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা আহার বিহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও অপেক্ষাকৃত সুস্থ শরীরে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়াও যে বর্ত্তমান শিক্ষিত মণ্ডলীর চৈতন্যোদয় হয় না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

মন্বত্রি প্রভৃতি প্রাচীন ব্যবস্থাপক এবং সমাজ-সংস্কারকগণ যে সকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এস্থলে তৎসমুদায় উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধেই ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের যে প্রকার অবস্থায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সমূহ ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার কৃত্রিম আলোকে বর্ত্তমান ভারতবাসীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে বলিয়াই তাহারা প্রকৃত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। পূর্ব্বকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রাজ্ঞ হইতে পারিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় সকল প্রকার শাস্ত্রীয় বিধি প্রতিপালন করিয়া সর্ব্বদা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মায়া মোহ-মুগ্ধ, কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত ঘোরতর বিষয়ানুরক্ত ব্যক্তিদিগকেও সমাজ-শাসনে বাধ্য হইয়া শাস্ত্রোক্ত পথে বিচরণ করিতে হইত। এই সমস্ত কারণেই সহসা কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারিত না। বর্ত্তমান সময়ে নগরে নগরে যেপ্রকার এক একটী "মানব-পালন-সমিতি" সংগঠিত হইতেছে, পূর্ব্বকালে কখনও এরূপ হইত না। তাই লোক-ক্ষয়কারী মহামারীও সহসা দৃষ্টিগোচর হইত না। এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে এই মানব-পালন-সমিতি ও তৎসম্বন্ধীয় অভিনব ব্যবস্থাদির বিষয়* কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে হাড়ি ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি সকলেই নিরপেক্ষভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান সমালোচনায় সকলেরই সমান অধিকার জন্মিয়া

* Municipality and Municipal Act. &c.

থাকে। সকলেই রাজদ্বারে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে ডোম-পুত্র, চণ্ডাল-ভ্রাতা প্রভৃতি মহাত্মাগণ উচ্চাসনে উন্নীত হইয়া জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্বতন ঋষিগণ নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহ নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। এক্ষণে তাহা পরিবর্ত্তন না করিলে আর দেশের মঙ্গল হইতে পারে না। আবার কেহবা দেশের দুরবস্থা মোচনের জন্য লম্বা চৌড়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—"দেশ উচ্ছন্ন হইল, দেশবাসী ধনে প্রাণে মারা পড়িল, ওলাউঠার ভীষণ অত্যাচারে—ম্যালেরিয়ার করালগ্রাসে আর কাহারও নিষ্কৃতি নাই। শীঘ্রই দেশসংস্কারের প্রয়োজন ইত্যাদি।" দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ হইল। নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে প্রায় এক একটী করিয়া সমিতি স্থাপিত হইল। অচিরে বহুতর পারিষদ নিযুক্ত হইল। সকলেই প্রাণপণে দেশের দুরাবস্থা মোচনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নালা জোলা প্রভৃতি খনন করিয়া একস্থানের বদ্ধজল বহু স্থানে চালনা করিয়া দেওয়া হইল। তাহাতে গ্রামবাসী প্রজা সমূহের একমাত্র জীবনোপায় ধান্য ক্ষেত্রের যথেষ্ট অপকার হইতে লাগিল। কৃষি-প্রজাগণ শস্যাদি হারাইয়া ক্রমশঃ জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিল। সেই জীর্ণদেহে আবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণ আরও প্রবলরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এদিকে সমিতির পক্ষ হইতে সদরে রিপোর্ট পাঠান হইতে লাগিল যে, গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই অবসরে কেহবা নিজ বাটীতে পুষ্করিণী খনন করিয়া সাধারণের জলকষ্ট দূর করিয়া থাকেন। আবার কেহবা বৈঠকখানার সম্মুখে আলোকস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া দেশের অন্ধকার হরণ করেন। এই সমিতি দ্বারা যে, দেশের কোনও উপকার হয় না তাহা একেবারে বলিতে পারি না। কিন্তু মোটামোটি তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে উপকার অপেক্ষা অপকারের ভাগই অধিক হইয়া পড়ে। এই অভিনব মানব পালিনী সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই, অমনি সাধারণের মলমূত্রাদির উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন। মন্বাদি প্রণীত শাসন নীতির সময় মলমূত্র লইয়া কেহই এতদূর আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, জগৎ—পাবন মার্ত্তণ্ড কিরণ সংযোগে যাবতীয় পদার্থই সংশোধিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা উপরিস্থিত পরিত্যক্ত মলমূত্রাদির উপর অবারিত ভাবে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে, তৎসমুদায় পচিয়া কখনও দুর্গন্ধোৎপাদন করিতে পারে না, সুতরাং তদ্দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবারও সম্ভাবনা নাই। পরন্তু উহা দ্বারা আরও ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্য পূর্ব্বকালে বাটী হইতে কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে মল পরিত্যাগের নিয়ম ছিল। অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রত্যেক বাটীর পশ্চাদ্ভাগে যথেষ্ঠ স্থান রক্ষিত হইত। অধুনা মানব-পালিনী সভার সংগঠন হওয়ায় ঐ প্রকার নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। সহর পল্লী প্রভৃতি যে সকল স্থানে এই সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, সেই সেই স্থানের প্রত্যেক বাটীতে মলমূত্রাদি পরিত্যাগের জন্য ২।১টী পায়খানা নির্ম্মাণী হইয়া থাকে। ঐ সকল পায়খানা বাসগৃহ বা রন্ধন-শালা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত হয় না। প্রত্যেক পায়-খানাতে এক একটী পাত্র রাখিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ পাত্রোপরি অবিরত মলমূত্র এবং জল একত্রে নিপতিত হওয়ায় ৪।৫ ঘণ্টা মধ্যেই মল সমূহ পচিয়া নিতান্ত দুর্গন্ধ বিস্তার করিতে থাকে। এই সমস্ত দুর্গন্ধ দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে কেমন করিয়া যে, সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় তাহা বলিতে পারি না। ইহার পর আবার প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৯টা পর্য্যন্ত পথে পথে যে প্রকার সুগন্ধি বিস্তৃত হইতে থাকে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পায়খানাস্থিত মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিবার জন্য সমিতিতে বহুসংখ্যক ভৃত্য নিযুক্ত থাকে, তাহারা প্রাতঃকালে ৯টা পর্য্যন্ত পচা দুর্গন্ধময় মলপূর্ণ এক একটী ভাণ্ড স্কন্ধে লইয়া পথে পথে অবিরত দুর্গন্ধবহন করিয়া বেড়ায়, সেই সময় পথ দিয়া গমনাগমন করা যে, কতদূর কষ্টকর—অসহ্য ব্যাপার তাহা সভ্য মহাত্মাগণ কখনও জানিতে পারেন না, কেন না তাঁহারা যখন ১০টার সময় আহারাদি করিয়া কার্য্যালয়ে যাইবার জন্য বহির্গত হন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মল-বাহক ভৃত্যগণ মল সংস্কার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে,

কিন্তু আমাদিগের ন্যায়, যে সকল লোককে প্রাতঃকালেই ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই মলসংস্কার ব্যাপার নিতান্ত অসহনীয় অস্বাস্থ্যকর। পচা দুর্গন্ধময় মল সমূহের পরমাণুকনা বায়ু সহযোগে ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া কি প্রকারে যে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা করে তাহা আমাদিগের জ্ঞানাতীত এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত। এস্থলে অনেকেই মনে করিতে পারেন যে সহর প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ স্থানে সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে লোক বাস করে, সুতরাং তাহাদিগের মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার জন্য বর্ত্তমান পায়খানাকাণ্ডের অভিনয় না করিলে সহরস্থিত জল বায়ু প্রভৃতি অত্যন্ত দূষিত হইয়া সাধারণের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে তদপেক্ষা বর্ত্তমান নিয়মেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিক অপকার হইয়া থাকে। বাসগৃহ বা রন্ধনশালার সন্নিকটে পায়খানা স্থাপিত হওয়ায় তত্রত্য বায়ু-রাশি নিয়ত দূষিত হইতে থাকে, অধিকন্তু কীট পতঙ্গ প্রভৃতি মক্ষিকাগণ প্রতি নিয়ত পায়খানা হইতে উড্ডীয়মান হইয়া আহারীয় দ্রব্যাদিতে পতিত হয়, ইহা নিতান্ত দোষাবহ। ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ইংরেজগণ বাস গৃহের মধ্যেই মলমূত্র ত্যাগের জন্য স্বতন্ত্র কোন স্থান অবধারণ করেন বলিয়া, বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালী মহলে যে প্রকার অল্প পরিমিত স্থানে বহুসংখ্যক বাটী সন্নিবিষ্ট এবং প্রত্যেক বাটীর পায়খানাও ঘন ঘন স্থাপিত, ইংরেজ মহলে তদ্রূপ নয়। সুতরাং বাঙ্গালী পল্লীই যে, অধিক অস্বাস্থ্যকর হইবে তাহাতে আর আশ্চয্যের বিষয় কি? যদি প্রত্যেক বাঙ্গালীর বাটীই প্রশস্ত স্থানে নির্ম্মিত হইত এবং বাসগৃহ হইতে উপযুক্ত রূপ দূরে পায়খানা স্থাপিত থাকিত, যদি পথে পথে দুর্গন্ধ বিস্তারের কোনও সম্ভাবনা না থাকিত এবং মল পরিষ্কারের স্বতন্ত্র কোন বন্দবস্ত বা সময় অবধারণ হইত তাহা হইলে বোধ হয় কোনও সহরে এতদূর রোগের আক্রমণ দেখা যাইত না। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়। কবিরাজ।

কবিরাজি মতে ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই অবস্থায় বিসর্পণ চূর্ণ * একান্ত উপযোগী। যদি নাড়ীর স্পন্দন থাকিতে থাকিতে অর্দ্ধযব মাত্রায় এই বিসর্পণ চূর্ণ সেবন করিতে দেওয়া যায় এবং উদরে তাহা স্থায়ী থাকে তবে কখনও নাড়ীর স্পন্দন বিলুপ্ত বা রোগীর জীবনান্ত হয় না—ইহা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। অপামার্গ মূলের রসসহ উক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া প্রস্ফুটিত ধুস্তুর ফুলের মধ্যস্থিত ৫টী কেশর (অর্থাৎ শিশ্) এবং ২।৩ টা গোলমরিচ একত্রে পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত অনুপান করিতে দিবে ! পরক্ষণেই যদি বমি হইয়া ঔষধ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে শীতল জলের সহিত একটী বমনারি বটী সেবন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত সহ-পান এবং অনুপানের সহিত আবার বিসর্পণ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। যত-ক্ষণ পর্য্যন্ত বমির বেগ কমিয়া না যায় এবং ঔষধও উদরে স্থায়ী না থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পর্য্যায় ক্রমে কেবল এই দুইটী ঔষধই সেবন করিতে দেওয়া উচিত। এইরূপে ঔষধ একবার স্থায়ী হইলে পুনরায় ইহা প্রয়োগ করা যায় না—মুহুর্মুহুঃ অতিরিক্ত মাত্রায় ইহা প্রযুক্ত হইলে পরিণামে অনিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা। এই ঔষধ অত্যন্ত উত্তেজক এবং কিঞ্চিৎ মাদক। ইহা প্রযুক্ত হইলে ধাতু নিঃসরণ স্থগিত হয় সুতরাং উদ্বেষ্টন, অবসাদ এবং কোন প্রকার বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা যকৃৎ ও পিত্তাশয়ের কার্য্যাদি অব্যাহত থাকে বলিয়া মলও স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন

* বহু পরিশ্রমে কোন অবধোত সন্যাসীর নিকট হইতে "আদিত্য-সংহিতা" নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত অনুবাদিত বা মুদ্রিত হয় নাই। বিসর্পণ চূর্ণ প্রভৃতি কতঃগুলি ঔষধের বিষয় সেই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ঐ সকল ঔষধের উপকরণ এবং প্রস্তুত প্রাণালী এই প্রবন্ধের শেষে দেওয়া যাইবে। এক্ষণে কেবল চিকিৎসা প্রণালীই বলা যাইতেছে।

করাইলে কাহারও কাহারও নিদ্রার আবেশ হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে কোনও ভয়ের সম্ভাবনা নাই। চক্ষু রক্তবর্ণ অথবা শিরঃশূল উপস্থিত হইলে, মস্তকে অবিরত শীতল জল সিঞ্চন করিবে। যদি দুই একবার ভেদ, বমি হইয়াই চেতনা লোপ এবং মনিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, রোগী নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে থাকে, সেই সময় কক্ষতলে অঙ্গুলি সন্নিবেশ করিয়া দেখিলে, যদি সামান্যরূপেও নাড়ী স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত বিসর্পন চূর্ণের সহপানের সহিত অর্দ্ধরতি মৃগনাভী মিশ্রিত করিয়া দিবে। এইরূপ ২।৩ বার ঔষধ সেবন করাইলে যদি মনিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে রোগীর জীবনরক্ষা হইতে পারে, নতুবা এই ঔষধ দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় অথবা কক্ষতলেও যদি নাড়ী অদৃশ্য হয়, তাহা হইলে যে সকল ঔষধ একান্ত উপযোগী, তাহা পরে বলা যাইবে। কেহ কেহ বলেন, অতীসারাবস্থায় একধান পরিমিত বিশুদ্ধ অহিফেনের সহিত ৪।৫ রত্তি রসচূর্ণ সেবন করিতে দিলে ধাতু নিঃসরণ বন্ধ হয় এবং নাড়ীর গতিও ঠিক থাকে। রসচূর্ণের সহিত অত্যল্প পরিমাণে অহিফেণ থাকায় কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া উদরস্ফীত হইবার সম্ভাবনা নাই। জলের সহিত শুভ্রবটী সেবন করাইলেও অনেক স্থলে উপকার হইতে দেখা যায়। আবার পাকা কুমড়া ও নারিকেল শস্য, শিলায় পেষণ করিলে যে প্রকার ছাকা ছাকা শুভ্রবর্ণ ধারণ করে, থাকিয়া থাকিয়া যদি সেই প্রকার মল নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হয় তবে তাহাকেও খিকারের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। মর্ম্মগ্রন্থি হইতে ক্রমশঃ শ্লেষ্মা স্খলিত হইয়া মলরূপে পরিণত না হইলে কথনও এরূপ হয় না। ঐ শুভ্রবর্ণ মলসমূহ শরীরস্থ শ্লেষ্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এরূপ অবস্থায় "কালান্তকরস" অত্যন্ত উপকারী—শ্বেত বিছাটী মূলের রস অথবা অপামার্গমূলের রস সহ এক একটী করিয়া বটী মাড়িয়া, এক একবার প্রয়োগ করিতেহয়। ৩।৪ বার ঔষধ সেবন করিলেই মলের ঐ প্রকার অবস্থা দূর হয়। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নকুমার মৈত্রেয়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। (চিকিৎসা)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

ডাক্তার স্থান্‌সম বলেন যে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রথমাবস্থায় যদি রোগ অতি সামান্য আকারের হয় তাহা হইলে, উত্তম বায়ুসম্পন্ন গৃহে, সম্পূর্ণরূপে শারীরিক এবং মানসীক বিশ্রামই অনেকটা ঔষধের কার্য্য করে। প্রথমাবস্থায় ক্যাষ্টর অয়েল্ ড্রাফট্, ক্যাস্কারা এলিক্সার্ বা (রেউচিনি) রুবার্ব্ ঘটিত মৃদু বিরেচক ঔষধ বিশেষ উপকারক। তিনি বলেন যে, অধিক মাত্রায় (২০ গ্রেণ) সল্‌ফো কার্ব্বলেট্ অফ্ সোডিয়ম্ ১ আউন্স দারুচিনির জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগের অবস্থানুসারে ২।৩ ঘণ্টান্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার লক্ষিত হয়। শরীরোত্তাপ ১০৩ বা ততোধিক না হইলে ডাইলুটেড্ হাইড্রোব্রোমিক্ এসিড্, ২০ বিন্দু; কুইনাইন্ ৫ গ্রেণ; ১ আউন্স ক্লোরোফম্ ওয়াটারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই তিন ঘণ্টান্তর সেবন করিতে দেওয়া উচিত। তিন চারি মাত্রা সেবন করিয়া যদ্যপি উত্তাপ হ্রাস না হয় তাহা হইলে ফিনাসিটিন্ (৪।৮ গ্রেণ্) অথবা এণ্টিপাইরিন্ (৫।১০ গ্রেণ) তিন চারি ঘণ্টান্তর ২।১ মাত্রা প্রয়োগ করিবে।

উক্ত ঔষধ সমূহ সেবন দ্বারা যদ্যপি রোগের লক্ষণাদির হ্রাস বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে সল্‌ফো কার্বলেট্ অব্ সোডিয়ম্ ৩০ গ্রেণ, ১ বিন্দু লাইকর আর্সেনিক্, ১ আউন্স সিনেমন্ ওয়াটারের সহিত দিবসে তিন বার করিয়া, অন্যূন সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত সেবন করা উচিত। ডাঃ স্থান্সম্ আরও বলেন যে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। তিনি ১০০ শত জন রোগীর মধ্যে, ২৩ জনের হৃৎপিণ্ড স্থানে বেদনা এবং ৩৭ জনের হৃদয় দ্রুত ও ৩৫ জনের সামান্য (স্নায়ুবিকার) অসুস্থতা দেখা গিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, হৃৎ-দুর্ব্বলতা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে প্রায় ঘটিবার সম্ভব।

বক্ষ ও হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে কোনরূপ বেদনাপোস্থিত হইলে, ইন-

ফ্লুয়েঞ্জা আরোগ্যের কিয়দ্দিবসান্তে তাহা আপনাপনি আরোগ্য হইতে পারে কিন্তু প্রবলাবস্থায় রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকিতে হইবে।

সময়ে সময়ে ইহার সহিত বক্ষপ্রদেশে স্নায়বিক বেদনা এত প্রবল হয় যে, রোগ যন্ত্রণা একপ্রকার অসহ্য হইয়া পড়ে এমতাবস্থায় মর্ফিয়ার হাইপোর্ডার্মিক্ ইঞ্জেক্সন্ ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের অবসাদ হেতু বিপদ হইতে পারে, অতএব মার্ফিয়াদি অবসাদক ঔষধ সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত। ব্রাণ্ডি, এমোনিয়া প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, মর্ফিয়া—ইঞ্জেক্শন্ ব্যবস্থা করিলে বিপদ সম্ভাবনা থাকে না। এস্থলে একটি উত্তেজক মিশ্রের উল্লেখ করা গেল;—স্পিরিট্ ইথারিস্, ½ ড্রাম; স্পিরিট্ এমোনিয়া এরোমেটিক্, ½ ড্রাম; টীংচার সম্বল্, ½ ড্রাম; কর্পূরের জল—সর্ব্বশুদ্ধ ১ আউন্স। একমাত্রা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে এবং তৎপরে মর্ফিয়ার হাইপোডামিক্ ইঞ্জেক্সন্ ব্যবস্থা করিবে। হাই-পোডামিক্ ইঞ্জেকসন্ করিবার পর, যদি কোন দুর্লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে উক্ত উত্তেজক ঔষধ আরও ১ মাত্রা সেবন করা বিধেয়। যখন জ্বরের হ্রাস দৃষ্ট হইবে, তখনই হাইড্রোব্রোমিক এসিডের সহিত, কুই-নাইন্ মিশ্র ৩।৪ ঘণ্টান্তর পর্য্যায় ক্রমে সেবন করিতে দেওয়া এবং বেদনার হ্রাসার্থে "মর্ফিয়া ড্রাফট্" রাত্রে ২।১ মাত্রা বয়ক্রমানুসারে দেওয়া উচিত, ইহাতে কেবল রোগের যন্ত্রণার হ্রাস হয় এমন নয়—সুনিদ্রাও হইবার সম্ভব। বক্ষ, পৃষ্ঠ প্রভৃতি যে যে স্থানে রোগী বেদনানুভব করিবে, তত্তৎ স্থানে বেদনানিবারক ও উত্তেজক মর্দ্দন (লিনিমেণ্ট্) একত্র মিশ্রিত করিয়া, দিবসে ২।৩ বার করিয়া মালিস করা উচিত। লিনিমেণ্ট্ কেম্ফর্ কম্পাউণ্ড্, লিনিমেণ্ট্ এমোনিয়া বা লিনিমেণ্ট্ ক্লোরোফর্ম্, এই মর্দ্দন গুলির যে কোন একটি লইয়া তাহার সহিত সমপরিমাণে, লিনিমেণ্ট্ বেলডনা অথবা লিনিমেণ্ট্ ওপিয়াই মিশ্রিত করিয়া, মালিসার্থে ব্যবস্থা করিবে। আমাদের দেশীয় তার্পিণ তৈলের সহিত কর্পূর ও অহিফেন মিশাইয়া মালিস করিলেও চলে। হৃদ্ প্রদেশে বেদনা থাকিলে—(Mustard) মাষ্টার্ড বা রাই সরি-

যায়, অহিফেন, বেলাডনা বা একোনাইট ইত্যাদির পলস্ত্রা (প্ল্যাষ্টার্) স্থানিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাঃ স্মান্সম্ বলেন, উষ্ণ জলে স্যালিসিলেট্ অব্ সোডিয়ম্ নিক্ষেপ করিয়া সেই জলের সেঁক দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

এণ্টিপাইরিণ, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে বিশেষ ফলপ্রদ, কিন্তু কোনরূপ স্নায়বিক অবসন্নতা লক্ষিত হইলে ইহা প্রয়োগ নিষিদ্ধ। অল্প মাত্রায় এবং বার বার প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা অধিক উপকার সম্ভব। এণ্টিপাইরিন্, ৪ গ্রেণ; সোডা বাইকার্ব্, ৪ গ্রেণ; স্পিরিট এমোনিয়া এরোমেটিক্, ১০ মিং; সিরাপ ½ ড্রাম; ডিল ওয়াটার, সমষ্টি ½ আউন্স। একমাত্রা। ১ ঘণ্টান্তর ৩ মাত্রা প্রয়োগ করিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু আবশ্যক হইলে আরও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে ইহার সহিত লডেনম্ (৫।১৫ বিন্দু) অবশ্য প্রযোজ্য। ইহাতে স্নায়বিক দুর্ব্বলতাদি কুলক্ষণ গুলি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে শিরঃপীড়া প্রায় রোগীতে বর্ত্তমান থাকে। ৫ গ্রেণ. ফিনাসটিনের সহিত এফার্ভেসেন্স হাইড্রোবোমেট্ অব্ ক্যাফিন্ ½ ড্রাম মিশ্রিত করিয়া ২।৪ ঘণ্টান্তর ২।১ মাত্রা প্রয়োগ করিলে গাত্রোত্তাপ ও শিরঃপীড়ার হ্রাস হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে "কাশি" একটি কষ্টদায়ক লক্ষণ, তন্নিবারণার্থে;—ব্রোমাইড্ অব্ এমোনিয়া, ৫ গ্রেণ; টিংচার ক্যাম্ফর, কম্পাউণ্ড্, ২০ মিং; এক্ষ্ট্রাক্ট গ্লাইসিরিজি লিকুইড ১৫ মিং, টিংচার ডিজিটেলিস্, ৩।৪ মিং; সিরাপ্ টোলু, ½ ড্রাম; কর্পূরের জল মোট এক আউন্স। মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে অনেক বিশেষ হয়। রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে প্রথম হইতে উত্তেজক ঔষধের সহিত কুইনাইন্ প্রয়োগ করা উচিত। প্রথমাবস্থায় কুইনাইন প্রয়োগ—অনেকের অমত থাকিলেও আবার অনেকে বলেন, ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন কিন্তু রোগোপশমকালে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব। ক্যাটার (সর্দ্দি) উপশমার্থে;—উষ্ণজলে কোনায়ম্ প্রয়োগ করিয়া ভাপরা প্রয়োগ করিতে অনেকে উপদেশ দেন। ফুসফুস্ ও শ্বাসনালীর

কোন প্রকার প্রদাহ দৃষ্ট হইলে তন্নিবারণার্থে ভাইনম ইপিকাক্ ৫ মিং; টীং ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড্ বা টিংচার ওপিয়াই ১৫ মিং, সোডা বাইকার্ব্ব, ১০ গ্রেণ; সিরাপ্ সিলি, ৩০ মিং; ইন্‌ফিউসন্ সেনেগা মোট ১ আং। মিশ্রিত করিয়া ৩ ঘণ্টান্তর সেবনীয়। অধিক শ্লেষ্মানিঃস্রবণ আবশ্যক হইলে ইহার সহিত ৫।১০ মিনিম্ মাত্রায় ভাইনম্ এণ্টিমনি বা ভাইনম্ ইপিকাক্ মিশ্রিত করা উচিত। শরীরে বেদনা থাকিলে টীংচার ওপিয়াই আরও ৫ বিন্দু অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিস্তৃত শ্বাসনালী প্রদাহ থাকিলে—কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া, ৫ গ্রেণ; ইথর ক্লোরিক্, ১৫ মিং; ভাইনম্ ইপিকাক্, ১০ মিং; টিংচার কাম্ফর কম্পাউণ্ড, ১৫ মিং; ডিককটম্ সিঙ্কোনা, মোট ১ আং। মিশ্রিত করিয়া ৩।৪ ঘণ্টান্তর ব্যবহার এবং বেদনাদি উপশমিত না হইলে—কুইনাইন* ৫ গ্রেণ; ডাইলিউটেড্ এসিড্ ১০ মিং, টিংচার অব্ বেলাডনা, ৫ মিং বা টিংচার ওপিয়াই, ১০ মিং; আইয়োডাইড্ অব্ পটাসিয়ম্, ২ গ্রেণ† স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্, ১৫ মিং; কর্পূরের জল সমষ্টি ১ আউন্স। দিবসে ৩।৪ বার। জ্বরসত্ত্বে ইহা প্রয়োগ করা উচিত নহে। এণ্টিপাইরিণ্ দ্বারা স্নায়বিক দুর্লক্ষণ সমূহ নিবারিত হয় না, কিন্তু ব্রাণ্ডির সহিত প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। মস্তকে "আইস ব্যাগ্" তদভাবে শীতল জলধারা প্রয়োগ করিলেও স্নায়বিক দুর্লক্ষণ সমূহের উপশম হয়। রোগোপশম কালে, ফেরি এট্ কুইনাইন্ সাইট্রাস্, ৩।৪ গ্রেণ; এসিড নাইট্রো মিউরিয়েটিক্ ডিল্, ১০ মিং; টিংচার সিঙ্কোনা কম্পাউণ্ড, ১৫ মিং; স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্, ১৫ মিং; ক্যাস্কারা এলিক্সার, ৩০ মিং (কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আরও কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় অথবা টিংচার রিয়াই বা অন্য কোন প্রকার মৃদু বিরেচক) গ্লিসিরিণ, অর্দ্ধ বা ১ ড্রাম; টিংচার নক্স ভমিকা, ৪ মিং; ইন্‌ফিউজম্ ক্যালম্বা অথবা কোয়াসিয়া মোট

* শিরঃপীড়া থাকিলে হাইড্রোব্রোমেট্ অব্ কুইনাইন্; তদভাবে সলফেট্ অব্ কুইনাইনকে হাইড্রোব্রোমিক এসিডে দ্রব করিয়া লইবে।

† ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে

১ বা অর্দ্ধ আউন্স মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩ বার সেবন ব্যবস্থেয়। সামান্ত কাশি থাকিলে ইহার সহিত ৫ মিং মাত্রায় ভাইনম্ ইপিকাক্ বা ভাইনম্ এণ্টিমনি এবং গ্লিসারিণের পরিবর্ত্তে সিরাপ্ সিলি বা টোলু ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রোগান্তে দৌর্ব্বল্যারোগ্যার্থে পোর্ট ওয়াইন্—কেহ কেহ কড্লিভার অয়েল্; ফেলোজ সিরাপ্ প্রভৃতি সেবনানুমোদন করেন। পুষ্টিকর অথচ লঘু পথ্য এই সময় গ্রহণ করা উচিত। ইন্ফ্লুয়েঞ্জার প্রবলাবস্থায় উষ্ণ দুগ্ধ, বীফ্ টি ইত্যাদি পথ্য দেওয়া বিধেয় এবং অন্যান্য গুরুপথ্য দেওয়া অকর্ত্তব্য। রোগোপশম কালে স্থান পরিবর্ত্তন, উষ্ণ গৃহে বাস, উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণার্থে বরফ অথবা শীতল পানীয় সেবন করিতে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ, অপিচ তৃষ্ণা—রোগোপসর্গ হইলে ঔষধের সহিত ক্লোরেট্ অব্ পটাশ বা সাইট্রেট্ অব্ পটাশ মিশ্রিত পানীয় ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। সময়ান্তরে আমরা ইন্ফ্লুয়েঞ্জার হোমিওপ্যাথিক ও দেশীয় চিকিৎসার বিষয় কিছু বলিব।

শ্রীশৌরিন্দ্রমোহন গুপ্ত।

স্ফোটকস্রো। (ABSCESS).

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবে, বিনা অস্ত্রোপচারে অধিকাংশ স্থলে ফোড়া আরোগ্য হইয়া যাইতেছে দেখিয়া অধুনা চিকিৎসারাজ্যে মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে এবং সাধারণে ইহা জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। তজ্জন্য স্ফোটক চিকিৎসা বর্ণনা করা গেল, অধিকন্তু অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা আর বড় সহ্য করিতে হয় না।

সংজ্ঞা—শরীরের কোন স্থান প্রদাহিত হইলে প্রদাহিত স্থানে রস জমিয়া যায়। এই রসকে একজুডেশন্ কহে। তাহা ক্রমে পূজে পরিণত হইয়া উঠে। এই পূজযুক্ত স্ফীত স্থানকে স্ফোটক বা য়্যাবসেস্

বলে। স্ফোটক তরুণ (Acute) ও পুরাতন (Chronic) ভেদেদুই প্রকার।

তরুণ স্ফোটকের লক্ষণ—স্ফোটক স্থান স্ফীত, উজ্জ্বল লালবর্ণ ও ধকধকানি বা টাটানি যুক্ত বেদনা এবং জ্বর বর্ত্তমান থাকে। ফোড়ায় শীঘ্র পূজ জন্মিয়া যায়। পূজ হইলে স্ফোটকের বর্ণ ফেঁকাশে হয় এবং ফোড়ার ভিতর দপ্ দপ্ ও কট্ কট্ করিতে থাকে, কম্প দিয়া বা শীত করিয়া জ্বর আইসে। পূজ জন্মিলে ফোড়া ভারি বলিয়া বোধ হয় ও টান টান যন্ত্রণা (Tensi on pain) অনুভব হইয়া থাকে। স্ফোটকের মুখ দিন দিন উন্নত হইয়া উঠে। অঙ্গুলি সঞ্চাপনে স্ফোটক আন্দোলন করিলে এই পূজ স্রোত স্পষ্টই অনুভব করা যায়। এই সময়ে ফোড়া আপনি ফাটিয়া যাইতে পারে আর যদি গভীর স্থানে পূয় থাকে তাহা হইলে শীঘ্র বিদীর্ণ হয় না প্রত্যুত ফোড়ার যন্ত্রণা অধিক হইতে থাকে এবং জ্বরও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

পুরাতন স্ফোটক (Chronic abscess) প্রথমতঃ পীড়িত স্থান ততোধিক স্ফীত বলিয়া বোধ হয় না এবং তরুণ ফোড়ার ন্যায় কোন প্রকার বিশেষ যন্ত্রণা থাকে না। বহুদিন গত হইলে পর স্ফোটকের যন্ত্রণা ও জ্বরাদি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় এবং ইহাতে রোগী বিলক্ষণ কষ্ট পায়। কখন স্ফোটক বিদীর্ণ না হইয়া পরিশুষ্ক হইয়া যায় কখন বা ক্ষত হইয়া আরোগ্য কার্য্য সাধিত হয়। পুরাতন ফোড়ায়, প্রায় অস্থি দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে।

কারণ—অধিকাংশ স্থলে ধাতু দৌর্ব্বল্য বশতঃ স্ফোটক জন্মিয়া থাকে। অবসাদক কঠিন জ্বরের শেষাবস্থায় রক্ত দূষিত হইয়া ফোড়া উৎপন্ন হয়। কখন কখন আঘাতাদি অথবা শরীরে কোন পদার্থ বিদ্ধন জন্য স্ফোটক জন্মিতে দেখা যায়। দূষিত অস্থি ও স্ফোটক উৎপন্নের অন্যতর একটী কারণ।

চিকিৎসা—স্ফোটক চিকিৎসা করিতে হইলে প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখিয়া কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

১ম—স্ফোটকের প্রথম অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহা পরিশুষ্ক করিয়া দিতে হইবে।

২য়—যদি ফোড়া বসিয়া না যায় তাহা হইলে ঔষধ দ্বারা পূয় ফোড়ার উপরিভাগে আনয়ন পূর্ব্বক ফাটাইয়া দিতে হইবে।

৩য়—ফাটিয়া যাওয়ার পর যে ক্ষত হয় তাহা আরোগ্য সাধন করা।

এই সকল কার্য্য সাধন জন্য অনেক ঔষধের আবশ্যক হয় তন্মধ্যে যে গুলি প্রধান ও সচরাচর প্রয়োজন হয়, ক্রমান্বয়ে তৎসমুদয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। ফোড়া বসাইয়া দিবার জন্য—একোনাইট, এপিস মেল, আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেলাডনা, মার্কিরিয়স, রসটকস্, সলফর, হিপার—সলফর ও সিলিকা প্রধান। শৈত্য বা উষ্ণ সেক দেওয়ায় উপকার হয়।

২। যখন পূজ হইয়া উঠে, কোন মতে বসিয়া যায় না তখন নিম্নস্থ ঔষধ দ্বারা ফোড়া ফাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়, ক্বচিৎ অস্ত্র উপচারের আবশ্যক হয়। আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবন দ্বারা যদি ফোড়া ফাটিয়া না যায় তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে পেশী বিধ্বংস, মাংস খসিয়া পড়া, শেষে অন্যান্য নানাপ্রকার বিকৃতি ঘটিয়া উঠে, সেই জন্য সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য যে, প্রথমতঃ ঔষধ সেবন দ্বারা স্ফোটক বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করা।

তজ্জন্য—মার্কিরিয়স, হিপার সলফর ও সিলিকা প্রধান।

৩। স্ফোটক বিদীর্ণ অথবা অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন করিয়া দিবার পর ফোড়া শুষ্ক করিবার জন্য—হিপার সল্ফ, সিলিকা, সলফর ও ক্যালকেরিয়া প্রভৃতি প্রধান ঔষধ।

পুরাতন স্ফোটক বা ক্রণিক য়্যাবসেস্—য়্যাসা, অরম, ক্যালকেরিয়া, কার্ব্বভেজ্, কোনায়ম, হিপার, আইয়ড, লাইকো, মার্কস, মার্ককর, নাইট্রিক এসিড, ফস্ফরাস্, সিপিয়া, সিলিকা ও সল্ফর প্রধান।

ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ।

একোনাইট—প্রদাহিত স্থানে লালবর্ণ, উষ্ণ ও চকচকে, অতিশয় জ্বর ও ধকধকানি বেদনা, অত্যন্ত ছটফটানি ও অসহ্য যন্ত্রণা থাকা।

এপিস—স্ফোটকের উপক্রমাবস্থা, হুল বিদ্ধবৎ বেদনা ও কোলতা দংশনের ন্যায় স্ফীত হওয়া। ইহাতে অতি অল্প সময় মধ্যে ফোড়া বসিয়া যায়।

আর্ণিকা—স্ফোটক উষ্ণ, শক্ত ও চকচকে এবং স্ফীত হওয়া বিদ্ধনবৎ বেদনা, দুর্ব্বলতা; আঘাতজনিত প্রদাহের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্সেনিক—জ্বর কালে অসহ্য জ্বালাজনক বেদনা; ফোড়া ফাটিয়া গিয়া গ্যাংগ্রিণ ক্ষত হইবার উপক্রম, দুর্গন্ধময় জলবৎ প্রচুর পূয় নিঃসরণ; অতিশয় দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা ও অশান্তি। ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে প্রযোজ্য।

বেলাডনা—অতিশয় জ্বর, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, ধকধকানিযুক্ত মস্তক বেদনা, ফোড়া অতিশয় টন্‌টন করা। ফোড়া গরম ও উজ্জ্বল লাল-বর্ণেরও স্ফীতিযুক্ত। অসুস্থ পূজ নির্গত হওয়া। সাধারণতঃ আমরা এই ঔষধ দ্বারা ফোড়া বসাইয়া দিয়া থাকি। অতি প্রথমে এই ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে, পূজ উৎপন্ন না হইয়া স্ফোটক আরোগ্য হইয়া যায়।

হিপার সলফর—ইহা স্ফোটকের বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা দ্বারা ফোড়ায় পূয় বৃদ্ধি করা যায় অর্থাৎ পাকান, বসান ও ফোড়া ফাটান এবং ক্ষত শুষ্ক করা যায়। ফোড়ার মধ্যে বিদ্ধনবৎ, ধকধকানি ও কটকটানি বেদনা, ফোড়ার উপরের চর্ম্ম অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠে, এবং শক্ত ও উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। পূজ অল্প ও রক্তবর্ণ; রাত্রে ও ঠাণ্ডা লাগিলে যাতনার বৃদ্ধি হওয়া।

মার্কুরিয়স্—এই ঔষধ হিপারের ন্যায় গুণকারী। কিন্তু আমরা সচরাচর ইহা দ্বারা পূজযুক্ত স্ফোটক শুষ্ক করাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি, আবার যখন ফোড়া না বসিবার হয়; তখন এই ঔষধ দ্বারা ফোড়া পাকিয়া উঠে। অতএব ইহা ফোড়া বসান ও ফাটান এই উভয় শক্তিসম্পন্ন ঔষধ। ফোড়া বসাইবার জন্য ৩ শ ডাইলিশন ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বেয়ার ইহাপেক্ষা নিম্ন ডাইলিউসন সেবনের পরামর্শ দেন।

যে ফোড়ার ধীরে ধীরে পূজ উৎপন্ন হয় তাহার পক্ষে মার্কুরিয়স অতি উত্তম ঔষধ।

সলফর—পুরাতন স্ফোটকের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

•সিলিকা—ইহা দ্বারা পূজ বৃদ্ধি হয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পূজ হ্রাস হইয়া আইসে। পূজ নির্গত হইলে ইহা দ্বারা ফোড়া পরিশুষ্ক হইয়া যায়।

বাহ্যিক প্রয়োগ—স্ফোটকের প্রথমাবস্থায় ফোড়ার উপর ক্রমাগত জলপটী, জলের সহিত অল্প মাত্রায় স্পিরিট মিশ্রিত করিয়া তাহার পটী অথবা বরফ প্রয়োগ করিলে স্ফোটক শোষিত হইতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত জল বা বরফ প্রয়োগে একটী ভয়ের বিষয় আছে। দুর্ব্বলাবস্থায় অথবা স্থানিক দুর্ব্বলতায় অবিরত জলপটী দিলে সেই স্থানের তেজের হ্রাস হইয়া পচিয়া যাইতে পারে অতএব তজ্জন্য সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। উষ্ণ প্রয়োগেও কখন কখন ফোড়া বসিয়া যায় কিন্তু সচরাচর ফোড়া পাকাইবার জন্য গরম পুলটিশ প্রয়োজিত হইয়া থাকে। আঘাত প্রাপ্ত স্থানে যদি কিছু ফুটিয়া থাকে অগ্রে তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। আধছটাক গাভীঘৃত বা অলিভ অইলের সহিত ১০ ফোটা ক্যালেণ্ডিউলা মূলমরিষ্ট মিশাইয়া ফোড়ায়ঘায়ে দিলে যথেষ্ট উপকার হয়। কলিকাতার মাননীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে ক্যালেণ্ডিউলা, কার্ব্বলিক এসিড ও বেনজয়িক এসিড, অন্যান্য পচন নিবারক ঔষধাপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

অস্ত্রক্রিয়া—উল্লিখিত উপায়ে যদি স্ফোটক বসিয়া বা ফাটিয়া না যায়, তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে উত্তমরূপে ফোড়া পাকাইয়া—একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা (এব্‌সেস্ ল্যানসেট) দ্বারা কাটিয়া পূজ বাহির করিয়া দেওয়া ভাল। পরে হিপার সলফর ও সিলিকা ব্যবহার করিলে শীঘ্র ফোড়া শুষ্ক হইয়া যায়। যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্যালেণ্ডিউলা তৈল বা ঘৃত অথবা জল মিশ্রিত লোশন লিণ্ট বা পুরাতন পরিষ্কার জীর্ণ বস্ত্র দ্বারা ব্যাণ্ডেজ বান্ধিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

পথ্য—লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর আহার আবশ্যক। জ্বর সত্ত্বে অন্ন পথ্য দেওয়া উচিত নহে।

ডাক্তার শ্রীঅভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎকট ব্যবস্থা।

১০৩ পৃষ্ঠার পর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মজুমদারদের বাসভবনের উত্তরদিকে একটী স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী ছিল। প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে তাহাতে একটী অবগুণ্ঠনবতী প্রতিবেশিনী, সমাবেশ হইত। একদিন অপরাহ্নে মজুমদারগৃহিণী তাঁহার কোন প্রিয় সখির সহিত বাপীতটে পাত্রপ্রক্ষালন কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের ক্ষীণরশ্মি, নিকটস্থ গৃহের শিরোভাগে লোহিতাভা প্রদান করিতে করিতে নিম্নস্থ রমণীদ্বয়ের বদনমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া একটী সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিতেছিল। পুষ্করিণীটী ঘনসন্নিবিষ্ট, বিহগনিনাদিত বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে তাঁহাদিগের হাস্যবিকশিত কথোপকথন, বীণাঝঙ্কার সদৃশ শ্রবণমনোহর বোধ হইতেছিল। কিন্তু এই রমণীর চিত্র ও মজুমদার পত্নীর রূপরাশি দর্শকশূন্য ছিল না। বন্ধুত্ব-বিচ্যুত কৃষ্ণকিশোর; পুষ্করিণীর অনতিদূরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে করিতে হঠাৎ সেই দৃশ্যের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং কিয়ৎকাল ধরিয়া তাঁহাদিগের অলক্ষিতে অনিমেষ লোচনে নারীসৌন্দর্য্যের অদৃষ্টপূর্ব্ব আকর্ষণীশক্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা গৃহে গমন করিলে, যুবকও অনিচ্ছার সহিত নিজস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে, কৃষ্ণকিশোর ভাগীরথীতীরে একাকী "বায়ুভক্ষণ" করিতেছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ পূর্ব্বদিনের চিত্রখানি মনে পড়িল। অনতিবিলম্বে অদৃশ্যরজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুষ্করিণী সমীপে উপস্থিত

হইলেন। অদ্য তাঁহার চক্ষে মজুমদার গৃহিণী অধিকতর রমণীয়া বোধ হইল এবং গৃহে ফিরিতেও সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ পাইল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া, কিছুকাল মধ্যে অসংযতমনা কৃষ্ণকিশোর তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন যে, পিতা-মাতার নিকটে তাঁহার দৈনিক কার্য্যকলাপের বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। কিন্তু মজুমদার মহাশয় বা তদীয় পত্নী ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। কৃষ্ণকিশোর নিয়তই চিন্তা করিতেন "স্ত্রীলোকটী অতীব সৌন্দর্য্যশালিনী। এরূপ সৌন্দর্য্য-সুধা যে পান করিতে পায়, না জানি এ ধরাধামে সে কত সুখী। হায়! এ সৌন্দর্য্য-সুধা কি আমি কখনই পান করিতে পাইব না? আমি তাহাকে বড়ই ভালবাসি—একথা শুনিলে সে কি আমায় ভাল বাসিবে না? তাহার ভালবাসা পাইবার জন্য আমি বড় ব্যাকুল হইয়াছি। সে কি আমার প্রণয় পিপাসামিটাইবে না? এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল চিন্তমালা তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ক্রমে নিস্তেজ করিয়া ফেলিল। সয়তান মনুষ্যশরীরে অধিকার লাভ করিলে যে প্রবঞ্চনা করী হৃদয় বলের সঞ্চার হইয়া থাকে, সেই বল কৃষ্ণকিশোরকে কিঞ্চিৎ সাহসী করিয়া তুলিল। সংকল্প করিলেন মজুমদার মহাশয় আহারান্তে কার্য্যস্থানে গমন করিলে, একদিন তিনি সুযোগক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রণয়পাত্রীকে প্রণয় বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবেন। কিন্তু পথিমধ্যে ধূর্ত্তসাহস তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিল ও সেই অভিপ্রায় আর সাধিত হইয়া উঠিল না। মজুমদার গৃহিণীর হৃদয় পরীক্ষা করিতে তখন তাঁহাকে উপায়ান্তর অন্বেষণ করিতে হইল। অনেক চিন্তা করিয়া পত্র দ্বারা কার্য্য সমাধা করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অবিলম্বে পত্র লিখিত হইল এবং একটী বালক দ্বারা দ্বিপ্রহর কালে মজুমদার পত্নী সমীপে প্রেরিত হইল। পত্র পড়িয়া গৃহিণী বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং স্বামী গৃহে আসিমাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখাইলেন। মজুমদার মহাশয় কিছুতেই হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং হাসিতে হাসিতে পত্র সমেত বেহারী ঠাকুর্দ্দাদার নিকটে গিয়া কহিলেন "দেখুন, কৃষ্ণকিশোরের বুদ্ধির পাক ধরিয়াছে।

ছোঁড়াটা দেখিতেছি, ঘরে বসিয়া বসিয়া ভালবাসা শিখিয়াছে।” পরে পত্রখানি দেখাইয়া বলিলেন “এ বিষয়ে আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন।”

“বটে, ইহার মস্তকে এত বিদ্যা ঢুকিয়াছে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্বে ইহাকে যখন বিবাহের কথা বলি, তখন সে একেবারে মূর্চ্ছাগত প্রায় হইয়াছিল। যাহা হউক, উহায় ভালবাসার দৌড় একবার দেখিতে হইবে।”

এই বলিয়া ঠাকুদ্দাদা মহাশয় চসমা লাগাইয়া টেড়াবাঁকা হস্তে এক পত্র লিখিতে বসিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকিশোর সরকার

শ্রীচরণ কমলেষু—

আপনার বিরহে আমার মানসাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল হঠাৎ আপনার পত্র পাইয়া ঠিক যেন তাহার উপর একপসলা ঠাণ্ডা বৃষ্টি হইয়া গেল। আপনাকে যে কত ভালবাসি তাহা এক-মুখে বলা যায় না, আপনি কল্য সন্ধ্যার পর যোগীন বাবুদের বাগানের উত্তরে যে পগার আছে তাহার পশ্চিমে অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপস্থিত থাকিবেন। সেই নির্জ্জনস্থানে আপনার সহিত প্রেমালাপ করিব। অধিনীর অনুরোধ অবহেলা করিবেন না। ইতি—

আপনার প্রেমভিখারিণী—
সরোজিনী মজুমদার।

যথা সময়ে গুপ্তভাবে পত্রখানি ভ্রান্ত কৃষ্ণকিশোরের নিকটে আসিল ও তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রাপ্ত হইল। সেদিন রজনীতে নিদ্রাকালে তিনি কতপ্রকারের সুখ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। পরদিন আনন্দিত চিত্তে নানারূপ সুন্দর বেশভূষা প্রস্তুত করিলেন এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে মনোহর বেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিবার জন্য গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। কিয়দ্দূর যাইবা মাত্র পথিমধ্যে ঠাকুদ্দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঠাকুদ্দাদা ছাড়িবার পাত্র

নহেন, তৎক্ষণাৎ বলিলেন "কি দাদা, কবে বিবাহ হইল ? আমরা তো কিছুই জানিতে পারি নাই। তোমার শ্বশুরালয় এখান হইতে কতদূর ভাই ?"

"আমায় বিরক্ত করিবেন না। আপনি জানেন, আমি কখনই বিবাহ করিব না। আমার একটী বন্ধু আসিয়াছেন দেখা করিতে যাইতেছি।" এই বলিয়া ক্ষণকাল মধ্যে নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া মজুমদার পত্নীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু স্থানটী বড় ভয়ানক। ঐ স্থানে গ্রামের তাবৎ আবর্জ্জনা রাশি নিক্ষিপ্ত হইত বিশেষতঃ নিম্নস্থিত পগারের বমনোদ্রেককারী দুর্গন্ধে আরও ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছিল, এতদ্ব্যতীত রাত্রিকালে সেখানে মানবের গতিবিধি থাকিত না এবং মধ্যে মধ্যে ঝিল্লী রব ভিন্ন চতুর্দ্দিকে এক গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত। তাহার মধ্যে প্রণয়োন্মত্ত কৃষ্ণকিশোর তাঁহার কল্পিতা প্রেমাকাঙ্খিণীর আশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন—নিশাচর শিবাকুল গলিত মাংস মুখে করিয়া প্রেতমূর্ত্তিভ্রমে তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলাইয়া গেল। প্রণয়! তুমিই জগতের অর্দ্ধেক সুখদুঃখের প্রবর্ত্তয়িতা!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে কৃষ্ণকিশোরের পিতামাতা অনেক রাত্রি হইলেও সে গৃহে আসিল না দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইলেন, পরে আরও কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রাত্রি প্রায় একটার সময় তাঁহার পিতা, একজন বন্ধুকে লইয়া লণ্ঠন হস্তে বেহারী ঠাকুদ্দাদার নিকটে গমন করিলেন। ঠাকুদ্দাদা কহিলেন "বটে, এখনও সে বাড়ী আসে নাই! তাহাকে সন্ধ্যার সময় যোগীন বাবুদের বাগানের দিকে যাইতে দেখিয়াছিলাম; তাহার নাকি কোন্ বন্ধু আসিবে।" অনন্তর সকলে সেই দিকে যাত্রা করিলেন। ঠাকুদ্দাদা লণ্ঠনহস্তে অগ্রবর্ত্তী হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণকিশোর অবনতশিরে তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন "এই যে ভায়া, তোমার বন্ধু যে অনেক

পোলাও কালিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল দেখিতেছি, তাই খাইতে এত দেরি হইল। দেখিও, যেন পেটের পীড়া হয় না।"

"বিদ্রূপ করেন কেন ? বন্ধুর বাড়ী হইতে আসিবার সময় ভ্রমবশতঃ অন্তদিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম তাহাতেই দেরি হইল।"

"আহা, তা বেশ ! রাস্তায় ছেলেধরারা থলের ভিতর পূরে নাই-ত ? কিন্তু ভাই এদিকে তো কেবল গরুগুলা চরিয়া বেড়ায়। এস্থানে তোমার বন্ধু আবার কে ? বলি তাদের মধ্যে কেহ নাকি ?

"ওরূপ উপহাস করা বড় অন্তায় জানিবেন।"

"অবশ্য অবশ্য ! কিন্তু বাপ মাকে ভোগাইয়া বন্ধুর বাড়ী অতরাত্রি পর্য্যন্ত পোলাও কালিয়া মারাটাও অন্যায়। চল, এখন গৃহে চল।" কৃষ্ণকিশোর গৃহে ফিরিয়া জনকজননী কর্ত্তৃক যথোচিত তিরস্কৃত হইলেন। এদিকে প্রণয় পিপাসা সকলই ব্যর্থ হইল দেখিয়া অন্তঃকরণে দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হইল—সে রাত্রি আর নিদ্রা হইল না।

কিছুকাল পরে একদিন প্রাতঃকালে ঠাকুদ্দাদা মহাশয় কৃষ্ণকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে অন্তর্দাহের সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকটিত রহিয়াছে এবং বুঝিলেন যে, সে এখনও মজুমদার পত্নীর চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। আরও বুঝিলেন যে, প্রণয়ান্ধ ব্যক্তি উপদেশ বাক্য গ্রাহ্য করে না, কিন্তু কঠিনতম বেত্রাঘাতে কখন কখন চক্ষুপ্রাপ্ত হয়, অতএব এস্থলে কৃষ্ণকিশোরের আরও কিছু বেত্রাঘাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ মিষ্ট বচনে তাঁহার মনস্তুষ্টি করিয়া ঠাকুদ্দাদা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হয়, যেন তোমার মনে একটী কি গূঢ়তর চিন্তা রহিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে ঠাকুদ্দাদার নিকটে খুলিয়া বলিতে আর লজ্জা কি ! আমি যথাসাধ্য তাহার প্রতিকারের চেষ্টা দেখিব।"

কৃষ্ণকিশোর কহিলেন "আজ্ঞা না, চিন্তা আর কি একটা ভাল কাজকর্ম্ম যাহাতে হয়, মধ্যে মধ্যে তাহারই উপায় আলোচনা করি।"

"না, একথা বোধ হয় তুমি ঠিক বলিতেছ না। যেন কিছু লুকাইয়া

রাখিতেছ। নিশ্চয় জানিও এব্যক্তি হইতে তোমার সকল চিন্তা দূর হইতে পারিবে। বল, খুলিয়া বল।"

এই বার কৃষ্ণ কিশোরের মন কিঞ্চিৎ টলিল। বলিলেন "আজ্ঞা, সেকথা কি করিয়া আপনার সমক্ষে—"

"ভয় কি! আমার কাছে কোন লজ্জা করিও না। সমস্ত কথা খুলিয়া বল। আমি তোমার সব ভাবনা দূর করিব।"

"আজ্ঞা, তবে—বলিতেছি। আমি—আমি ভুল করিয়া কোন কুল ললনাকে ভাল বসিয়াছি। এক্ষণে তাহার ভালবাসা পাইবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছি। আপনার পায়ে পড়ি কাহাকেও বলিবেন না।"

"রাম, রাম! এসব কথা কি কাঁহাকেও বলে? তা, এরূপ ভুল তো প্রায়ই লোকের হইয়া থাকে। আমি ইহার উত্তম ঔষধ জানি। সেদিন বাগ্দিপাড়ার মাথমকে দিয়াছিলাম, উত্তম ফল হইয়াছে।"

কৃষ্ণকিশোর আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কাছে সরিয়া গিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন। "সত্য নাকি মহাশয়? কিরূপ ঔষধ বলুন দেখি। শুনিয়া আমার বুকের ভার যেন কমিয়া যাইতেছে।"

ঠাকুদ্দাদা আর ও নিম্নস্বরে কহিলেন "সে বেশী কিছুই নয়; এক প্রকার মলম মাত্র। তাহা কল্য আমি লইয়া আসিব এবং সমস্ত নিয়মাদি বলিয়া দিব। অদ্য অপেক্ষা কর।"

অপরাহ্ণে দূরবর্ত্তী এক জঙ্গলের ভিতর হইতে ঠাকুদ্দাদা লালচিত্রা নামক গাছের শিকড় সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে সেই শিকড় বাটিয়া সুন্দর মলম প্রস্তুত করিলেন। ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণকিশোরের নিকটে গিয়া মলমটী দিয়া কহিলেন, "দেখ, এই দ্রব্যটী তোমার কপালে লেপন করিয়া, শুষ্ক করিবার জন্য সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিও। তাহাতে অল্প অল্প জ্বালা করিবে, তজ্জন্য কিছু মনে করিও না বা ভয় পাইও না, জ্বালা আরম্ভ হইলেই তোমার প্রণয়পাত্রী তোমার নিকটে ছুটিয়া আসিতেছে।" ঠাকুদ্দাদা পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেলে মনের উল্লাসে কৃষ্ণকিশোর সমস্ত মুখে মলম লেপন করিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল সূর্য্য কিরণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মলমটী ক্রমে বেশ

শুরু হইয়া উঠিল। যদিও প্রথমে তাঁহার অল্প যন্ত্রণা হইতে ছিল, কিন্তু প্রণয়াবেশে তাহা উপলব্ধি হইল না। ক্রমে যাতনা অত্যন্ত প্রবল হইলে আর সহ্য হইল না। তখন "বাবাগো, মাগো, রবে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জনক জননী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন পুত্রের মুখ চন্দ্রিমা লোহিতবর্ণ ও স্ফীত হইয়া বিকটাকার ধারণ করিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, কোন উত্তর পাইলেন না। গ্রাম্য চিকিৎসক আসিয়া কিঞ্চিৎ যাতনা শান্তি করিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বীভৎস ঘায়ের আবির্ভাব হইল। সেই ঘা শুকাইতে কৃষ্ণকিশোরের প্রায় একমাস লাগিয়াছিল।

এদিকে ক্রমে ক্রমে সেই দিনের মধ্যেই সমস্ত সত্য ঘটনা নানা প্রকারে রঞ্জিত হইয়া গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই মধ্যে মধ্যে শয্যাগত কৃষ্ণকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; এবং যতদিন না সমস্ত ঘা শুকাইয়া গেল ততদিন তিনি কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিতেন না। বোধ হয় এ স্থলে আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই ঠাকুর্দ্দাদার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। কিন্তু আমরা জানি, ঠাকুর্দ্দাদার এই উৎকট ব্যবস্থাই কৃষ্ণকিশোরের জীবন পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। ধন্য ঠাকুর্দ্দাদা! তোমারই বুদ্ধিবলে আজ আমাদের মিত্রহারা চিরপরিচিত কৃষ্ণকিশোর দ্বার পরিগ্রহ পূর্ব্বক সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কুপথাশক্ত ব্যক্তিকে সৎপথে আনিতে হইলে এইরূপ কৌশলই অবলম্বন করিতে হয়। অধুনা ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে কৃষ্ণকিশোরের ন্যায় অনেক নরপশু দৃষ্টিগোচর হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, বোধ হয় সে সকল স্থানে এমন উপযুক্ত ঠাকুর্দ্দাদা নাই। থাকিলে নিশ্চয়ই উল্লিখিত সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাদিগের অন্ধচক্ষু ফুটাইয়া দিতেন।

শ্রীনৃ * * * *।

চিকিৎসা সংবাদ।

—•••—

বহুমূত্র রোগীর পথ্য।

"স্ক্যালপেল" নামক পত্রিকায় বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রিপোর্টার হইতে গৃহীত, কাশ্মীরের ডাক্তার এ. মিত্রের বহুমূত্র রোগের পথ্যাদি সম্বন্ধে একটী সুখ পাঠ্য প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। আমরা ক্রমান্বয়ে বহুমূত্র রোগীর পক্ষে সাধারণ প্রচলিত খাদ্যাদির গুণাগুণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছি :—

দুগ্ধ। আমরা জানি দুগ্ধে শ্বেতশার, শর্করা প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু ইহার মধ্যে শ্বেতসার সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অপকারী. এইজন্য অনেক চিকিৎসক বহুমূত্র রোগীদিগকে একেবারে দুগ্ধ পান করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ বলেন দুগ্ধ বহুমূত্র রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারি পরন্ত ডাঃ মিত্র বলেন যে, অল্প পরিমাণে এবং সাটা তুলিয়া দুগ্ধ পান করিলে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। ছানা বহুমূত্র রোগীরা গ্রহণ করিতে পারেন।

খাদ্য। চাউল, বার্লি, ময়দা প্রভৃতিতে শ্বেতশার এবং কা' হাইড্রেটের অংশ সমধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়, এতদ্ভিন্ন ই কিয়ং-পরিমাণে নাইট্রোজেনের অংশও আছে। বাঙ্গালায় সাধার বহুমূত্র রোগী দিগকে অন্নের পরিবর্ত্তে রুটী দেওয়া হয়, কিন্তু রাসায়নি বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে, রুটীতেও অধিক পরিমাণে শ্বেত-সার আছে। শ্বেতসার বহুমূত্র রোগে বিশেষ অনিষ্টকর, পক্ষান্তরে গ্লুটেন (Gluten) বহুমূত্র রোগের পক্ষে উপকারী, কেমনা তাহাতে নাইট্রোজে-নের অংশ অধিক পরিমানে দৃষ্ট হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বহু-মূত্র রোগে রুটির পরিবর্ত্তে গমের "চোকর" ব্যাবহার করা যাইতে পারে। বহুমূত্র রোগে উদর পীড়া শূন্য রাখা কর্ত্তব্য। সুজি কিম্বা পানি ফলের শস্য চূর্ণের রুটি ; বহুমূত্র রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

শাক সব্‌জি। বহুমূত্র রোগে সবুজ এবং টাট্‌কা শাক্ আহার করাই প্রশস্ত, যাহাতে অল্প চিনি আছে অর্থাৎ মটর, বিটমূল, কাঁচা ডুমুর, কপি প্রভৃতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেহ-কেহ বলেন কপি, পলাণ্ডু প্রভৃতি বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অপকারী কিন্তু ইহাতে চিনির মাত্রা না থাকাতে অপকারাশঙ্কা নাই।

ফল। মিষ্ট ফল একেবারে পরিহার্য্য।

মাংস। যকৃত ও প্লীহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট মাংস আহার করা যাইতে পারে। মৎস্য, ডিম্ব, চর্ব্বি প্রভৃতি আহার করা নিষিদ্ধ নহে। এতদ্ভিন্ন বহুমূত্র রোগীর পক্ষে প্রাতঃকালে কিয়ৎ পরিমাণে দুগ্ধপান করা কর্ত্তব্য। চা, কাফি প্রভৃতিও পান করা যাইতে পারে। কিন্তু মদ্যাদি গ্রহণ করা বহুমূত্র রোগীর পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ লুচি, অল্প দাউল; খিচুড়ি, ময়দার "চোকরের" রুটি প্রভৃতিও বহুমূত্র রোগীরা আহার করিতে পারেন। ঘোল পান করিলে নাকি বহুমূত্র রোগের উপকার হয়।

* * * * *

শুষ্ক হ্যাভাক্স্ হোয়াইট্‌পেণ্ট্ ইরিসিপিলাস্ রোগে স্থানিক প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রদ।

* * * * *

শুষ্ক সোহাগা চূর্ণ, মৎস্যের গাত্রে প্রয়োগ করিয়া শুষ্ক স্থানে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলে, উহা টাটকা মৎস্যের ন্যায় থাকে।

* * * * *

সিমলা শৈলে টাইফয়েড্ জ্বরের প্রাদুর্ভাব দৃষ্টে ডাঃ কনিংহাম্ তত্রত্য দূষিত দুগ্ধ বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

* * * * *

অস্ত্রোপচারান্তে ড্রেস করিবার জন্য কাল পিন্ ব্যবহার করা ভাল ইহা শীঘ্র মরিচা ধরে না এবং সহজ প্রাপ্য।

* * * * *

পেন্সন্ প্রাপ্ত, ভূতপূর্ব্ব মেডিকেল্ কালেজের অধ্যক্ষ, সার্জন্ কালোনেল্ জর্জ মার্টিন্ কোটস্ এম, ডি, অকস্মাৎ কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া বিগত ১০ জুলাই ইহলীলা সম্বরন করিয়াছেন ডাক্তার কোটের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

*　*　*　*　*

বারান্তর হইতে চিকিৎসক ও সমালোচকে সরল ভৈষজ্য তত্ত্বের উত্তরাংশ অর্থাৎ শেষভাগ প্রকাশিত হইবে।

সংগ্রহ ও মুষ্টিযোগ।

আতিস বৃক্ষ। হিন্দিতে ইহাকে "আতৈচ" বলে। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র বিষাক্ত গুল্ম বিশেষ, সেই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে "বিষা" বলে। বর্ণ ভেদে ইহা সচরাচর শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত, এই তিন প্রকারের দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় তিক্ত, গন্ধশূন্য এবং সহজে ভাঙ্গা যায়। সেইজন্য ইহার আর একটা সংস্কৃত নাম "ভঙ্গুয়া"। ইহা পালাজ্বর এবং সবিরাম জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরের মন্দাবস্থায় ইহা চূর্ণ করিয়া সেবন করাইলে পুনরায় জ্বর আশা বন্ধ হয়, এতদ্ভিন্ন ইহা পাচক, বলকারক এবং জ্বরঘ্ন। ইহা কাশি, কৃমি, বমনাদি রোগে বিশেষ ফলদায়ক। জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থেও ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আতিস চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাশি জ্বর ও বমি নিবারণ হয়। রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ও পর্য্যায় জ্বরে ইহার চূর্ণ ২-৩ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

ভুধিয়া। এক প্রকার লতা, সচরাচর সাঁওতাল পরগণার পাহাড় ও শৈল প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার পত্র অনেকটা কল্মী শাকের পত্রের ছায়, তবে তদপেক্ষা সরু এবং মাঝে একটী শ্বেতবর্ণের রেখা আছে, পত্রের রং কৃষ্ণবর্ণ। ইহা পত্রের আয়তন ভেদে দ্বিবিধ, যথা ছোটা ভুধিয়া এবং বড় ভুধিয়া। ইহার বাঙ্গলা কিম্বা সংস্কৃত নাম ঠিক বলিতে পারি না, পাহাড়ীরা এই লতাকে "ভুধিয়া" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহার স্বাদ, মিষ্ট এবং ঈষৎ তিক্ত কিন্তু এক প্রকার সুগন্ধ

আছে। ইহা রক্ত সংশোধক এবং পুষ্টিকারক। অনেকটা সালসার কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার মুল সিদ্ধ করিয়া মিছরি কিম্বা শর্করা সংযোগে সেবন করিলে, বিবিধ চর্ম্মরোগ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা বিশেষ পুষ্টিকারক—অল্প পরিমাণে ইহা সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। খোস্, চুলকনি, পাঁচ্ড়া প্রভৃতিতে ইহা সেবন ও স্থানিক প্রয়োগে অতি শীঘ্র উপসমিত হয়।

অর্জ্জুন বৃক্ষ। ইহা এক প্রকার বৃহৎবৃক্ষ—বঙ্গদেশে পল্লিগ্রাম সমূহে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় ইহাকে আজন্ গাছ বলে। দেখিতে ঠিক পেয়ারা গাছের মতন, ফল অনেকটা কাম্‌রাঙ্গার ন্যায়। ইহার পত্রও অনেকটা পেয়ারা পাতার ন্যায়, তবে অপেক্ষাকৃত কোমল এবং মসৃণ। ইহা প্রান্তরে বিস্তর পরিমাণে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। ইহার বল্কল সচরাচর ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। স্বাদ, ঈষৎ তিক্ত ও কষায় এবং ইহা কফ,পিত্ত ও তৃষ্ণা নাশক এবং হৃৎপীড়া, বাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পাথুরী রোগে বিশেষ উপকারী। ইহার ত্বক; অস্থিভঙ্গ ও আঘাত জনিত বেদনায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার ছাল চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ সহ সেবন করিলে রক্ত পিত্ত, পুরাতন জ্বর, এবং হৃদ্রোগ অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রশমিত হইয়া থাকে। কখন কখন ইহা চেলোনি জলে বাটিয়া, সর্প দংষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আপাং বৃক্ষ। ইহা প্রান্তরে তৃণের সহিত পতিত স্থান প্রভৃতিতে জন্মাইয়া থাকে। ইহা দুই প্রকার, শ্বেত এবং লোহিত। ইহার পত্র, মূল, বীজ প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত ও কটু এবং ইহা উদরাময়, কফ, অর্শ, মূত্র পীড়া প্রভৃতি দোষ নিবারক। ইহার মুল পেষণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে, উন্মত্ত শৃগাল ও কুক্কুরের দংশন জনিত দোষ নষ্ট হয়। ইহার মূলের ধূম আঘ্রাণে পালা জ্বর আরোগ্য হয়। ইহার শিকড়, অশ্বত্থ ছালের সহিত ভস্ম করিয়া সেবন করাইলে শূল বেদনা উপসমিত হয়। আপাং

পত্রের রস প্রয়োগে কাটা স্থান হইতে রক্ত স্রাব শীঘ্র বন্ধ হয়। বৃশ্চিক দংশিত স্থানে ইহার পাতা বাটিয়া লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিত হয়। ওলাউঠা রোগে ইহার সিকড় গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে ভেদবমন বন্ধ হয়। অপাং পাতার রসে মূলার বীজ বাটিয়া লেপ দিলে সত্বর চুলী রোগ আরোগ্য হয়। আয়ুর্ব্বেদকারগণ বলিয়া গিয়াছেন "তদেব যুক্ত ভৈষজ্যং যদা রোগায় কল্পতে" অর্থাৎ যাহাতে যে রোগ আরাম হয়, তাহাই সে রোগের ঔষধ, কথাটা খুব ঠিক। যাহাদ্বারা রোগ আরোগ্য হয়, তাহা ইংরাজিই হউক, আর বাঙ্গলাই হউক তাহাই সে রোগের ঔষধ। যদিও আজ কাল কার এই বিবিধ ঔষধ প্লাবিত দেশে, কোন ঔষধের মতে চিকিৎসা করিবে—রোগী ভাবিয়া উঠিতে পারে না. কিন্তু যদি আমরা ইংরাজী ও বাঙ্গলা কোন দুইটী ঔষধের মধ্যে বাঙ্গলা ঔষধের কি কোন বনজ বৃক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করি, কি গাছ্ গাছ্ড়ার আশ্রয় লই, তাহা হইলে উভয়বিধ ঔষধেরই ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারি। গাছ্ গাছড়া ব্যবহারের একটী মহৎ সুবিধা, ব্যয়াল্পতা। পরমেশ্বর কেবল ধনির জন্য ঔষধ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার কাছে সকল মনুষ্যই সমান, তাঁহার অনন্ত করুণার নিদর্শন সহজ প্রাপ্য মহদুপকারী কত শত বনজ গাছ্ গাছ্ড়া কত শত অরণ্যে অরণ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরালায় শুকাইয়া যায়, কে তাহার সংখ্যা করিবে! আমরা অল্প বুদ্ধি মানব, আমরা একটী সামান্য দুর্ব্বাঘাসের গুণ বর্ণনা করিতে পারি না. আর আমাদের দেশে এত উপকারী ঔষধ থাকিতে আমরা বিদেশীয় ঔষধের স্মরণাপন্ন হইতে যাই! ধিক আমাদের! কালের প্রলয় স্রোতে আমাদের দেশের যে সমস্ত রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে, বুঝি মুষ্টিযোগ তাহার মধ্যে অন্যতম। আজকাল তখনকার মত আর কেহ কথায় কথায় দু' চারিটী মুষ্টি-যোগের উল্লেখ করিতে পারে না—আর লোকেরও তখনকার ন্যায় মুষ্টিযোগের প্রতি একটা বড় আস্থা নাই।

ভৈষজ্য তত্ত্ব—নূতন ঔষধ।

ক্ষার ও বসা, টার অএলের সহিত চুয়াইলে "লাইসল" প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ, পচন নিবারক। জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ রোগে ইহাতে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে। সাধারণ পচন নিবারণার্থ ইহার (শতকরা তিনভাগ) লোসনে উপকার দর্শে। হাতের দুর্গন্ধ নিবারণার্থ ইহার তুল্য কিছুই নাই। ডাঃ পিঃ ইহা ব্যবহার করিয়া বিস্তর উপকার পাইয়াছেন।

বিশেষ পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

বেদনা নিবারক প্রলেপ—হিরাকশ. ২ ভাগ, অহিফেন, ৩ ধুতুরা পাতার রস ৪ ভাগ। প্রথমে হিরাকশ গুঁড়া করিয়া ধুতুরার রসে নিক্ষেপ করিয়া উহাতে অহিফেন চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া লইতে হইবে। এই প্রলেপ প্রদাহিত স্থানে লাগাইলে বেদনার হ্রাস ও ফুলা কমিয়া যায়। কোন স্থানে পুয়োৎপত্তি সম্ভব হইলে, ধুতুরার রসে উক্ত প্রলেপের সহিত কিঞ্চিৎ (১।২ ভাগ) মুসব্বর মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পেটেণ্ট ঔষধ।

ডাক্তার রায়ের কৃত (বিশেষ পরীক্ষিত) ম্যালেরিয়া জ্বরনাশক ঔষধ। কুইনান্ সলফাস্, ৩গ্রেণ, এসিড্ সল্‌ফিউরিক্ ডাইলিউট্ অর্থাৎ জল-মিশ্রিত গন্ধক দ্রাবক, ৪বিন্দু ; ক্লোরাইড্ অব এমোনিয়া অর্থাৎ পরিষ্কার নিসাদল, ২।৩গ্রেণ ; সলফেট্ অব্ আয়রণ বা বিশুদ্ধ হিরাকস, ½ গ্রেণ ; সলফেট্ অব ম্যাগ্নিশিয়া (সল্ট্) ½ ড্রাম ; টিংচার জিঞ্জার অর্থাৎ আদার আরক (অরিষ্ট) ১৫।২০ বিন্দু ; লাইকর আর্সেনিয়াই হাইড্রো-ক্লোরিকস্, ১ফোঁটা ; এসিড্ কার্ব্বলিক্, ½ বিন্দু ; লাইকর ষ্ট্রিক্নিয়া, ১বিন্দু (না দিলেও চলে) কর্পূর, মৌরী অথবা ডিল্‌ওয়াটার অৰ্দ্ধ আউন্স পূর্ণার্থে যতটুকু আবশ্যক হয়। ১টী পরিষ্কার কাঁচের গেলাসে কুইনাইন ও এসিড্ দ্রব করিয়া পরে ১টি খলে হিরাকশ গুঁড়াইয়া উক্ত কুইনাইন দ্রবের সহিত মিশ্রিতান্তর নিসাদল ও সল্ট্ (উক্ত) জলে দ্রব

করিয়া অনন্তর সমুদায় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লিণ্ট বা ফ্লানেল বস্ত্র দ্বারা প্রথমে ছাঁকিয়া পরে ব্লটিং বা ফিলটারিং পেপার, ফ্লনেলে বসাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। উক্ত ঔষধ প্রস্তত করিবার সময় কোন প্রকার ধাতু পাত্র ব্যবহার করা উচিত নহে—কাঁচ বা প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র ব্যবহারই প্রশস্ত। একটি চার আউন্স শিশিতে এই ঔষধ পূর্ণ করিয়া আটটি দাগ কাটিয়া দিবে। পূর্ণ বয়স্কগণ একদাগ ; বালকগণ অর্দ্ধ এবং শিশু-দিগের সিকি দাগ পর্য্যন্ত ব্যবস্থেয়।

ব্যবহার—ম্যালেরিয়া হইতে উৎপন্ন জ্বরে এই ঔষধ দিবসে ৩বার করিয়া জ্বর বিচ্ছেদে প্রয়োগ করা উচিত। জ্বরসত্ত্বে এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও উদরাময় গ্রস্ত রোগীর এই ঔষধ সেবন অবিধেয়।

ক্রিয়া—জ্বরঘ্ন, বিরেচক, পরিবর্ত্তক, উত্তেজক এবং বলকারক।

গার্হস্থ ব্যবহার—এই ঔষধ হইতে সলফেট অব ম্যাগ্নিশিয়া এবং ক্লোরাইড অব এমোনিয়া বাদ দিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং উদরাময় গ্রস্থ রোগীদিগকে ব্যবহার করিতে পারা যায় পরন্তু টিংচার ওপিয়াই ১০।১৫ বিন্দু এবং ভাইনম্ ইপিকাক্ ৫ বিন্দু মিশ্রিত করিয়া উদরাময় গ্রস্ত রোগীকে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব। জ্বরের সহিত কাশি থাকিলে আরও ৫ বিন্দু ভাইনম্ ইপিকাক্ (অভাবে, ভাইনম্ এণ্টিমনি) এবং টিংচার সিলি বা টিংচার সেনেগা ১৫।২০ বিন্দু উক্ত ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

সংক্ষিপ্ত—সমালোচনা।

১। কৃষিক্ষেত্র প্রণেতা শ্রীযুক্তপ্রবোধ চন্দ্র দে প্রণীত "শবজিবাগ" নামক পুস্তক খানি আমরা সমালোচনার্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। শবজি বাগে শাক শবজির চাষ বাসের কথা লিখিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক কেবল যে চাষিদের আবশ্যক, তাহা নহে গৃহস্থদেরও ইহাতে অনেক কাজ দর্শিবে। পুস্তক খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

২। সংসঙ্গ—মাসিকপত্র। পত্রিকা খানি অতি যত্নের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। অনেক প্রবন্ধই সুপাঠ্য।

শৈশব সুহৃদ প্রতি।

আজ কতদিন পরে
এসেছ মোদের ঘরে,
দেখাদিতে এসেছ হেথায়;
কত ভালবাসা স্নেহ,
বিরাজিত অহরহঃ,
আমাদের জীবন উষায়।
তোমায় আমায় সখা,
এ নহে প্রথম দেখা,
এ নহে গো প্রথম মিলন;
দোঁহার হৃদয় মাঝে,
নাজানি কোথায় আছে,
শৈশবের সুদৃঢ় বন্ধন।
সে শৈশব খেলাতে,
ক্ষুদ্রআশা শত শত,
জানকি কোথায় এবে তারা;
তোমারি ত মুখ চেয়ে,
থাকিত তাহারা জীয়ে,
হইত না কভু তোমাহারা।
আর কি তাহারা আছে,
তারা সব মরে গেছে,
তুমি চলে গেছ যদবধি;
হৃদয়ের প্রান্ততলে,
অতীতের ধ্বান্তকোলে,
হইয়াছে তাদের সমাধি।

হের হৃদয়ের মাঝে,
ওই স্মৃতি স্তম্ভ রাজে,
ওই সেই সমাধি মন্দির;
প্রাণের আলোক রেখা,
একবার দিয়ে সখা,
আলো কর নাশিয়া তিমির।
তেমার প্রাণের আলো,
পাইয়া শোভিবে ভাল,
যে অক্ষর উহাতে লিখিত;
শৈশবের যত কথা,
ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র ব্যথা,
আলো পেয়ে হবে প্রস্ফুটিত।
এসোতবে কাছে এস,
হৃদয়ের পাশে বস,
কেন তাহে হও সঙ্কুচিত;
তুমি না দেখিলে সখা,
ম্লান হায়ে যাবে লেখা,
রেখামাত্র রবে না অতিকত।
নামিয়াছ কর্ম্ম ক্ষেত্রে,
উভয়ের কর্ম্ম সূত্রে,
পুনঃযদি হয়েছে মিলন;
তবে কেন আমাদের,
সুখ স্মৃতি শৈশবের,
রবেনা উজ্জ্বল অনুক্ষণ।

শ্রীরসময় লাহা।

চিকিৎসক ও সমালোচক।

মাসিক পত্র

১ম খণ্ড | ভাদ্র ও আশ্বিন, সন ১৩০২ সাল | ৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

আর্য্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

প্রথম কাণ্ড—সেকাল ও একাল।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যদি মল পরিষ্কারের স্বতন্ত্র কোন বন্দোবস্ত বা সময় অবধারণ হইত তাহা হইলে বোধ হয় কোনও সহরে এতদূর রোগের আক্রমণ দেখা যাইত না। পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া সুস্থ শরীরে, সুখ-স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ কাল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিলে, বোধ হয় কাহারও অকাল মৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইতে পারিত না। বিজাতীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশ মধ্যে যতই বিলাতী সভ্যতার বিস্তার হইতেছে, হতভাগ্য ভারতবাসীগণ দিন দিন আত্মহারা হইয়া যতই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন-ম্লেচ্ছের অনুকরণ প্রিয় হইতেছে, মানবপালন (Municipality) আত্ম-শাসন (Self-Government) ইত্যাদি সভা সমিতির যতই ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে, ততই দেশ মধ্যে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, আত্মদ্রোহ, সমাজভঙ্গ, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতির আধিক্য লক্ষিত হইতেছে। ওলাউঠা, ম্যালেরিয় ইত্যাদি নিবারণের জন্য বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যতই উপায়

উদ্ভাবন করা যায়, ততই উহাদের আক্রমণ আরও প্রবল হইতে থাকে। এই সমস্ত অত্যহিতের প্রকৃত কারণ কেহ কি অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? হতভাগ্য ভারতবাসীর জীবিতকাল ক্রমেই যে, নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা কি কেহ মনে করিয়া থাকেন? ধর্ম্ম-কর্ম্ম, স্বাস্থ্য, শান্তি-একতা এই সকলের মধ্যে পরস্পর অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটীতে গোলযোগ উপস্থিত হইলে, সকল গুলিই ক্রমশঃ পণ্ড হইয়া যায়। সুতরাং এতৎসম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে হইলে উচ্চবংশীয়, শিক্ষিত ও বহুদর্শী লোকের হস্তেই তাহার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সমুদয় গুরুতর কার্য্য, কখনও নিম্নশ্রেণীর লোক দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। পুরুষানুক্রমে যাহারা কুৎসিত সংসর্গে বাস করিয়া আসিতেছে—জঘন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহারা যদি ম্লেচ্ছভাষা অধ্যয়ন করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অথবা ম্লেচ্ছ রাজার সমক্ষে সমধিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করে তথাপি জাতিগত সহজ প্রকৃতি কখনও অতিক্রম করিতে পারে না। এই জন্যই পূর্ব্বকালে কোনও সমাজভুক্ত লোকের প্রতি, সমাজ-সংস্কারের ভার অর্পণ করা হইত না এবং কোনও নিকৃষ্ট জাতি রোগ বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করিয়া, ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষের মুলীভূত স্বাস্থ্য, সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। জ্ঞানের সাগর, বুদ্ধির আকর, সমাজ ত্যাগী ঋষিবর্গই তাদৃশ কার্য্যে দীক্ষিত হইতেন।

আজকাল সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই যে, সকল জাতির স্বাস্থ্য সম্পাদনের একমাত্র কারণ তাহা আমরা কখনও অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে যে কতদূর পর্য্যন্ত রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহা প্রকৃত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আর্য্যগণ যে প্রকার নিয়মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোপরিশ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন, যদ্দারা শরীরের, ভিতরে বাহিরে সমান ভাবে পরিষ্কার হইতে থাকে, যাহাতে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, যাহা জীবা-

আরও পবিত্রতা সম্পাদক, সেই প্রকার বিশুদ্ধ পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতার বিষয়ই এই প্রবন্ধে বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিব। কিন্তু প্রথমতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত পরিষ্কার ভাবের কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড তাপে নগ্নদেহে অবস্থিতি করা এক প্রকার কষ্টকর। তাল বৃন্তাদি ব্যজন না করিলে, প্রায়ই থাকিতে পারা যায় না। কিন্তু তাদৃশ অবস্থাতেও বাবুদিগকে, সভ্যতার অনুরোধে স্থূল বনাত বা তৎ সদৃশ কোন বস্ত্র নির্ম্মিত কোট, প্যাণ্টুলেন্ ইত্যাদি পরিধান করিয়া থাকিতে হয়। শরীর হইতে পুনঃপুনঃ ঘর্ম্ম নির্গত ও বিশুষ্ক হইয়া এক প্রকার অভিনব পবিত্রতা সম্পাদন করে। অধুনা আবাল-বৃদ্ধ সকলের সঙ্গেই এক এক খানি রুমাল লক্ষিত হয়। কফ কাসি প্রভৃতি শরীরের মলভাগ মধ্যে মধ্যে তদ্দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া আবার বস্ত্রান্তরালে লুকাইয়া রাখা হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামাজোড়া প্রভৃতি বাহিরে পরিধান করিয়া, পকেটে ক্লেদপূর্ণ রুমাল লুক্কায়িত রাখা যে, কি প্রকার পবিত্র ভাব তাহা আমরা ভাল বুঝিতে পারি না। আর্য্য-দিগেরও গাত্রমার্জ্জনী ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে। তদ্দ্বারাও শরীরের মলাদি পরিষ্কার করিয়া জলপাত্রোপরি বা অন্য কোনও স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহা কখনও বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখা হয় না এবং সেই গাত্র মার্জ্জনী দিনের মধ্যে অন্ততঃ ৩।৪ বার করিয়া ধুইয়া দেওয়া হয়। সাহেবগণ যখন কর্ম্ম মন্দিরে অবস্থিতি করেন, সেই সময় মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিতে হইলে মন্দিরস্থিত কক্ষান্তরে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু জলাভাবে অনেক সময় পকেট স্থিত রুমাল দ্বারাই গুহ্য-দ্বার প্রভৃতি মার্জ্জনা করা হয়। মূত্রত্যাগের সময় যদি কার্য্যানুরোধে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে হয়, তবে পরিধেয় বস্ত্র কখনও শুষ্ক থাকে না, আর বাবুদের মূত্র-ত্যাগান্তে জলগ্রহণ ত আজ কাল একবারেই রহিত হইয়াছে। এই সকল কার্য্য দ্বারা যে শরীর কি প্রকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব? আমাদিগের মতে নূতন বিনামা, পরিষ্কার কাপড়, চাকচিক্যময় জামা ব্যবহার করিয়া সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর দুই চারিটা ফুলের তোড়া

সাজাইয়া বসিলেই, তাহাকে পরিষ্কার ভাব বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন প্রভুর পিপাসা উপস্থিত হইলে, যখন ভৃত্যকে জল আনিবার জন্য আদেশ করা যায় তখন প্রভুভক্ত ভৃত্য, বিশুদ্ধ জল সংগ্রহে কষ্ট বোধ করিয়া আপনার পদ প্রক্ষালন যোগ্য জল দ্বারাও প্রভুর পিপাসা নিবারণ করিয়া থাকেন। আবার যে সকল মহাত্মা, বেতন ভোগী পাচক ব্রাহ্মণের হস্তে আহারাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে যে কত প্রকার কুৎসিত মলসংযুক্ত দ্রব্যই উদরসাৎ করিতে হয় তহা পাচক ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারেন না। ফলতঃ বর্ত্তমান সভ্যতানুরাগী মহাত্মাগণ পরিষ্কার পরিষ্কার বলিয়া যতই চীৎকার করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ততই মলমূত্রাদির মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। আলোক প্রাপ্ত বাবুগণ সভ্যতার অনুরোধে পাণি-গৃহিতা পত্নিদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিয়া যতই অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন ততই তাঁহাদিগকে ভোগাবশেষ ভোগ করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সভ্যতাবরণে সকলের চক্ষুই ক্রমশঃ আবৃত হইতেছে বলিয়া কেহই ইহাতে কিছুমাত্র দোষ মনে করেন না।

সুখের নিধি, সম্পদের আকর সুবিস্তৃত ভারতরাজ্যে; দিন দিন যতই বৈদেশীক শিক্ষার আধিক্য লক্ষিত হইতেছে, হতভাগ্য ভারতবাসীগণ ততই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেছেন। পৃথিবীর অপর প্রান্ত স্থিত আমেরিকাবাসী পণ্ডিতগণ অথবা সদুর পরাহত ইংলণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক-গণ ভারতের নৈসর্গিক অবস্থা এবং তাঁরদোৎপন্ন দ্রব্যাদির গুণাগুণ সম্বন্ধে কতদুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা আমরা কিছুমাত্র বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব দেশের উপযোগী যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া থাকেন,-তৎসমুদায় অবলোকন করিয়া ভারত-বাসী একবারে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া পড়েন। ভারত-ভাণ্ডারে কি আছে না আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিবারও অবসর প্রাপ্ত হয়েন না। সুকুমার মতি বালক বালিকাগণ নিয়ত ম্লেচ্ছ ভাষা অধ্যয়ন করিতে করিতে—ম্লেচ্ছের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সর্ব্বদা ম্লেচ্ছ সহবাসে কালক্ষে-পণ করিতে করিতে, যৌবনে সর্ব্বতোভাবে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া পড়েন।

তখন পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞান—বিজ্ঞানের কথা—অদ্ভুত কীর্ত্তি কলাপের কথা অথবা জন্মভূমির ভূতপূর্ব্ব সুখ সমৃদ্ধির কথা, তাঁহাদিগের কর্ণে বজ্রধ্বনির ন্যায় কর্কশ বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান আর্য্য সন্তানগণ ম্লেচ্ছ জ্ঞানাভিমানে উন্মত্ত হইয়া বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম প্রভৃতি জ্ঞানীগণকে, ব্যাস, বাল্মীকী প্রভৃতি কবিদিগকে এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি নীতি প্রচারকবর্গকে একবারে উপহাসে উড়াইয়া দিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ ম্লেচ্ছজ্ঞানে যাহাই কেন স্থির করুন না, সংস্কৃত ভাষার হৃদয়গ্রাহিণী রচনার সহিত বৈদেশীক ভাষার তুলনা করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায় যে কাহার জ্ঞান—কত অধিক। যাহা হউক এই সকল বিষয় আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে সংক্ষেপতঃ এইমাত্র বলিতেছি যে বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজাধিকৃত বিদ্যালয় সমূহে যে প্রকার ম্লেচ্ছ-জ্ঞানানুমোদিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা হইতেছে, এই-রূপ না হইয়া যদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপনা হইত তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবাসীগণ বাল্যকাল হইতেই বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিত।

এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে প্রকার ব্যবস্থাদি বর্ণিত আছে তাহাই ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

—০০—

প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান।

——**——

আর্য্য।

প্রথমতঃ দেখা যাউক আমরা আর্য্যজাতি কাহাকে বলি? আর্য্যেরা, ভারতের আদিম নিবাসী নহেন। কথিত আছে সুদূর অতিতকালে মধ্য এসিয়ায় আর্য্যজাতি বাস করিতেন। ক্রমে নানা কারণে সেই মূলজাতি পৃথিবীর নানাস্থানে বিস্তৃত হইল। সেই সময়ে এক দল ভারতবর্ষে আগমন

করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের আদিমজাতিকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাবে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করেন এবং দেখিতে দেখিতে সে রাজ্য সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আর্য্যজাতিরা তখন সমসাময়িক অন্যান্য জাতি অপেক্ষা সমধিক সভ্য ছিলেন—তাঁহাদের সভ্যতার সেই তরুণ অরুণাভা দেখিয়া জগতের মুগ্ধ-নয়ন আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বেদে ঔষধের উল্লেখ। যদিও আর্য্যজাতির প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক হইতে আমরা তাঁহাদের তাৎকালিক অবস্থা কতকটা জানিতে পারি। "ঋগ্বেদে" আমরা আর্য্যদিগের ক্রমোন্নতির ইতিহাস কতকটা প্রাপ্ত হই। অতএব আর্য্যদিগের ভেষজ সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত জানিতে হইলে উক্ত পুস্তকের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। "ঋগ্বেদের" শ্লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন সময় রচিত হইয়াছিল। প্রথম শ্লোকগুলি বোধ হয় আর্য্যদিগের ভারতবর্ষ প্রবেশের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই অতীতকালেও "চিকিৎসা বিজ্ঞান" তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

প্রথম ঔষধ ; জল। তাঁহারা জলকেই প্রথমতঃ ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈদিককালে জলের যে প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহারা "উদক চিকিৎসা, (Hydropath) ছিলেন। আর্য্যেরা প্রথমে জলকে যে ঔষধরূপে গণ্য করিতেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছুই নাই। অন্যান্য ঔষধ আবিষ্কারের পূর্ব্বে, যাহা শরীরের উত্তাপ কমাইত, আর্য্যেরা তাহাকেই ঔষধরূপে গণনা করিতেন। সংস্কৃতে "ঔষধির" মেকলি অর্থ উত্তাপ নাশক। জল; জ্বরের অনেকটা উপশম করিত, এবং শরীরের উত্তাপ নাশ পক্ষেও বিশেষ সহায়তা করিত, এই জন্য আদিমকালোজ্ঞান আর্য্যগণ কর্ত্তৃক একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধরূপে বিবেচিত হইত।

সোমরস। তৎপরেই "সোমরস" আর্য্যদিগের একটী প্রধান ঔষধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। "সোমলতা" কি প্রকারের গাছ তাহা এখনও নির্ণীত হয়

নাই। কিন্তু এটা এক প্রকার স্থির যে, "সোমলতা" ভারতের নিজস্ব গাছ নহে। অন্ততঃ পুরাতত্ত্ববিদ্ এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের এইরূপ অভিমত। ইহার রস কিয়ৎ পরিমাণে উত্তেজক এবং মাদক গুণ বিশিষ্ট। উক্তরূপ উত্তেজক রসের প্রয়োজন শীত প্রধান দেশে অত্যন্ত অধিক এবং এই নিমিত্তই আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ইহা একটা বিশেষ উপকারী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইত।

ঋগ্বেদে চিকিৎসা ব্যবসায়ের উল্লেখ। ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের উপনিবেশ স্থাপনের কিয়ৎকাল পরে, "ঋগ্বেদে" আমরা চিকিৎসা ব্যবসায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই আর্য্যদিগের সহিত শত শত বৎসর ব্যাপী অনার্য্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধই, চিকিৎসা উৎপত্তির প্রধান কারণ। এই সময়ে অর্থাৎ বৈদিককালে যোদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন, অথচ এই সময়ে শত শত যোদ্ধা যুদ্ধে আহত হইতেছিল, আর্য্যেরা প্রায় সকলেই যোদ্ধা ছিলেন—তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, এই সকল পীড়া, বেদনা কি কোন প্রকার দ্রব্য প্রয়োগে নিবারিত হয় না। এইরূপ চিন্তার ফলে কতকগুলি উপায় স্থির করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্রেরও সূত্রপাত হইল। সেই সময়ে দুইজন চিকিৎসক দেখা দিলেন, তাঁহাদিগকে অশ্বিনীকুমার বলিত। তাঁহারা উভয়েই যমজ এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারণে সমর্থ ছিলেন। অশ্বিনীকুমারেরা দেব (আর্য্য) চিকিৎসক ছিলেন। ইহার পর এক স্থানে ঋগ্বেদে চিকিৎসা ব্যাবসায়ের উল্লেখ আছে। আমরা দেখিতে পাই তথায় লিখিত আছে "সূত্রধরেরা ভগ্ন বিষয় অনুসন্ধান করেন—তদ্রূপ চিকিৎসকেও পীড়িতের পীড়ার অনুসন্ধান করেন।" সেই শ্লোকেই আর এক স্থানে, "আমি এক জন কবি আমার পিতা চিকিৎসক" এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রকৃত উন্নতি হইতে আরও কিছু দিন লাগিয়াছিল। তৎপরে বিশেষ পরীক্ষা এবং সূক্ষ্ম গবেষণার দ্বারা আর্য্যেরা বহুল দুরূহ রোগের অত্যাশ্চর্য্য ঔষধাবলি নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আয়ুর্ব্বেদ; সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার স্থান, এবং রচনার সময়। আমরা দেখিতে পাইযে যে সময় আর্য্যেরা "চিকিৎসা

বিজ্ঞানের” সূত্রপাত করেন সেই সময় “আয়ুর্ব্বেদ” রচিত হয়। এই পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আর্য্যেরা বিবিধ রোগ, আহাদের উৎপত্তির কারণ, এবং নিবারণোপায় আবিষ্কার করিবার জন্য তাঁহাদের অসীমজ্ঞান নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই সময় আর্য্যদিগের মনে পীড়া সম্বন্ধীয় কুসংস্কারের লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহারা পীড়া শান্তির নিমিত্ত মন্ত্র বা দেবতার, অথবা কোন প্রাকৃতিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। কেবল রোগের নিদান ও তাহার কারণতত্ত্ব স্থির করিয়া ঔষধ প্রভাবে রোগের প্রতিকার সাধন করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের শত শত বৎসরের অসীমযত্নের ফল, “আয়ুর্ব্বেদের” অধিকাংশই কালের তিমির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। “আয়ুর্ব্বেদের” প্রকৃত অর্থ “জৈবিক বিজ্ঞান।” ইহা একটী উপবেদ। সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—বেদ, ব্রাহ্মণও পুরাণ। বৈদিককালে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে ৪ বেদ, ৬ উপবেদ এবং কতকগুলি বেদান্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। “আয়ুর্ব্বেদ” তখন সেই উপবেদ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। অধিকাংশ হিন্দুশাস্ত্রের মতে আয়ুর্ব্বেদ রচয়িতা; স্বয়ং মহাদেব, কিন্তু “ঋগ্বেদে” কোথাও মহাদেবের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হয় নাই। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ রচিত হয়। এবং “মনুসংহিতায়” উপবেদ সমূহ বিশেষতঃ “আয়ুর্ব্বেদের” উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। “মনুসংহিতা” সম্ভবতঃ খৃষ্টের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, “আয়ুর্ব্বেদ” প্রায় খ্রীষ্ট জন্মিবার ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।)

প্রাচীন ভারতে শবচ্ছেদ। বৈদিককালে আর্য্যেরা ভিন্নভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন প্রকার বলি প্রদান করিতেন এবং সেই সকল জীবজন্তুর ভিন্নভিন্নাংশ ভিন্নভিন্ন দেবতাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত সম্যক ছেদিত হইত এবং এই সকল শবচ্ছেদের ফলস্বরূপ তাঁহারা জীবদেহের যকৃৎ, হৃদয়, পাকস্থলী, এবং আভ্যন্তরিক অন্যান্য যন্ত্র সমূহ পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে শবচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। চরক বলিয়া গিয়াছেন যে “চিকিৎসকের দেহান্তর্গত বাহ্যিক এবং আভ্যান্তরিক সর্ব্বাংশ

এবং তাহাদের পরস্পর অবস্থান ও কার্য্য প্রণালী বিশেষরূপ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক"। সুশ্রুতও শবচ্ছেদের বিষয় প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "যেমন বৃক্ষ সকল কর্ত্তন করিলে, তাহার আভ্যন্তরিক অংশ সকল দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ মানবদেহের ভিন্ন ভিন্নাংশ জানিবার জন্য শবচ্ছেদ প্রয়োজন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে শবচ্ছেদ করিলে, চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিতে পারা যায়।" সেই সুদূরাতীত কালে আর্য্যগণ জীবিতদিগের উপকারার্থে মৃত দেহ ছেদ করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ অংশ; শরীরতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই ঘণান্ধকার অতীতকালে, আর্য্যদিগের দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান, শবচ্ছেদ করিয়া "শরীরতত্ত্বে" জ্ঞানার্জ্জন, সর্ব্ববিধ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা, গভীর আলোচনা, এবং রোগ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় সমূহ দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

যখন আর্য্যেরা বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবিধ শস্ত্র সহকারে শবচ্ছেদ করিয়া, শরীরতত্ত্বে জ্ঞানার্জ্জন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিতেছিলেন, তখন জগতের অন্যান্য জাতিদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কি দেখিতে পাই? তখন শব স্পর্শ করিলে "য়ু" দিগকে পতিত হইতে হইত এবং ইজিপ্‌টীয়ানদিগের মধ্যে "শরীর তত্ত্ব" এক প্রকার নীচ, অস্পৃশ্যজাতি মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহারা মৃতদেহ বহু দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিত" এবং তাহা হইতে অন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিয়া দিত। তাহারা স্বজাতীয় কর্ত্তৃক ঈদৃশ নীচ, পতিত এবং ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইত যে, রাজার কিম্বা অন্যান্য সুন্দরী স্ত্রীলোকের শব তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে দেওয়া হইত না। প্রাচীন গ্রীসেও "শরীরতত্ত্ব" বিশেষরূপ উন্নতি করিতে পারে নাই। এথেন্সে মৃতদেহ, শীঘ্র সমাধিস্থ করা একটী পবিত্র কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এথেন্সে এতৎসম্বন্ধে তাৎকালিক প্রচলিত নিয়মও অতিশয় কঠিন ছিল শবদেহ শীঘ্র সমাধিস্থ না করিলে, বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে হইত। আমরা জেনফনের (Xeuophon) ইতিহাস হইতে জানিতে পারি

যে, ছয় জন প্রধান সামরীক কর্ম্মচারী, যুদ্ধে বিশেষরূপ জয়লাভ করিলেও, সমুদ্রবক্ষস্থ ভাসমান মৃত সৈন্যদিগকে শীঘ্র সমাধিস্থ না করার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। "ট্রয় যুদ্ধের" সময়েও পরস্পর বিপক্ষদিগের শব, শীঘ্র সমাধিস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এমিপেডিক্লিস্ (Emepedeclcs) আলমিয়ন্ (Alemeon) ডেমিক্রেটিক্ (Demecrities) এবং হিপক্রেটস্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসকেরা সকলেই নিকৃষ্ট পশুপক্ষীর শবচ্ছেদ করিয়া শরীরতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন *।

এই সকল বিষয় অবধারণ করিলে আমরা আর্য্য ও অন্যান্য জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সম্বন্ধে পার্থক্য, বিশেষরূপ প্রণিধান করিতে পারি।

আর্য্য শরীর তত্ত্ব। প্রাচীন আর্য্য শরীর তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অস্থি এবং উপস্থির সংখ্যা তিন শত এবং অস্থি সংযোগস্থল দুই শত নিরূপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে অস্থি সকল "স্নায়ু" দ্বারা সংযুক্ত। তাঁহারা মানব শরীর ব্যাপি মাংস পেশীর বিষয় ও পরিজ্ঞাত ছিলেন।

তাঁহারা ত্রিবিধ নাড়ীর বিষয় অবগত ছিলেন ;—প্রথম—ধমনী, বায়ু বহন করে, দ্বিতীয়—শিরা, শোণিত বহন করে, তৃতীয় (রক্ত) স্রোত। তাঁহারা, দেহের চর্ম্মের উপর সাতটী স্তর এবং আভ্যন্তরিক নানাবিধ যন্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, তথাপি শরীর তত্ত্বে তাঁহাদের সম্যক জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে পায় নাই। যদিও প্রথমে আর্য্য চিকিৎসকগণের মধ্যে শবচ্ছেদ করিবার প্রথা ছিল, কিন্তু কালে ইহা বিলুপ্ত হয়। সহসা বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিণতি, আর্য্য চিকিৎসকদিগের "শরীর তত্ত্বে" জ্ঞানলাভ করিবার পক্ষে কতকটা প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই "অহিংসা পরমো ধর্ম্মের" দিনে, শবচ্ছেদ করাটাও একটা পাপের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের সময়ে, ভারতের নানাস্থানে পীড়িত এবং দরিদ্রদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপিত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের চিকিৎসা প্রথা নানাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইলেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শবচ্ছেদ করিয়া "শরীর তত্ত্ব" শিক্ষার প্রথা অনেকাংশে হ্রাস হইল এবং আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অঙ্গ চিরকালের মত অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

"চিকিৎসাতত্ত্ব" বলিয়া আর্য্যদিগের কোন একটী বিশেষ গ্রন্থ নাই এবং তাঁহাদিগের চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে "শরীরতত্ত্ব" বিষয়ক জ্ঞানের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়না, তথাপি আমারা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহার বিষয় কতকটা অবগত হইতে পারি। যোগশাস্ত্রে "শরীর-তত্ত্ব" বিষয়ক বহুল প্রমাণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং ইহারই শেষাংশ বাঙ্গালায় তন্ত্র নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। "তন্ত্রশাস্ত্র" আমাদের নিকট অনেকাংশে অপরিজ্ঞাত। এই সকল "তন্ত্রশাস্ত্র" পঠিত হইলে নিশ্চয়ই আর্য্যশরীর তত্ত্বের অনেক গুপ্তাংশ জনসমাজে প্রকাশিত হইবে।

"শিবসংহিতা" হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আর্য্যেরা মস্তিষ্ক এবং "কশেরুকা মজ্জার" বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, স্নায়ু মণ্ডল এক প্রকার শ্বেত এবং ধূসর পদার্থে নির্ম্মিত। তাঁহারা কশেরুকা মজ্জাভ্যন্তরস্থ স্রোত এবং ইহার তৃতীয় ও চতুর্থ কোষের সহিত মস্তকস্থ পার্শ্বিক-কোষের সংযোগ বিষয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থেই স্নায়ুমণ্ডলস্থ কতিপয় স্ফীত স্থান এবং স্নায়ুগুলির বিষয় বর্ণীত আছে। তাঁহাদিগের মতে মস্তিষ্ক অনেকটা অর্দ্ধচন্দ্রাকার।

আর্য্যশরীর বিধান। আর্য্যদেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে পঞ্চভূতে শরীর নির্ম্মিত এবং আত্মা, শকট চালকের ন্যায় মানসিক প্রবৃত্তি সকল শাসন করিয়া থাকে। তাঁহাদিগের মতে বায়ু, পিত্ত, কফ, মানব দেহের প্রধান উপাদান। ইহাদের মধ্যে কোন একটির বিকৃতি রোগোৎপত্তির কারণ। মানবশরীরের যে অংশে কফ, পিত্ত, বায়ু প্রভৃতি কার্য্য করে, তাহা এইরূপভাবে সুশ্রুতে লিখিত হইয়াছে ; "যেমন চন্দ্র শৈত্য প্রদান করে এবং সৌর কিরণ,যাহা জগৎকে উত্তপ্ত এবং সজীবতা প্রদান করে এবং আকর্ষণ করিয়া লয় ও বায়ু যেরূপ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ কফ শৈত্য প্রদান করে এবং পিত্ত ইহাকে স্বীয় উত্তাপের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লয়, আর বায়ু ইহাকে সমস্ত শরীর মধ্যে সঞ্চালিত করে।" চক্র-

কের মতে ইহাদের প্রত্যেকে তিনটী করিয়া কার্য্য করে ;—শারীরিক পরিমাণে হ্রাস, বৃদ্ধি এবং স্থিতি। ইহাদের স্বাভাবিক অবস্থার রক্ষা করার নামই স্বাস্থ্য এবং তাহার বিপরীত ক্রিয়ার নাম পীড়া। ইহারা দেহের ভিন্নভিন্নাংশ অধিকার করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রোগ নামে খ্যাত হয় এবং বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করে।

আর্য্যাদেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, সাতটী প্রধান দ্রব্য দেহযষ্ঠিকে রক্ষা করিয়া থাকে ;—অন্নরস, শোণিত, মেদ, মাংস, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র। ভিন্ন আহারীয় গ্রহণ করিলে ঐ সকল শারীরিক অংশের অল্পাধিক পরিণতি হয়। খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হইলে, অন্নরস উৎপন্ন হইয়া শরীরকে পোষণ করিয়া থাকে। অন্নরস লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়। বায়ু, রক্তকে ঘনীভূত করিয়া মাংসরূপে পরিণত করে। আভ্যন্তরিক অগ্নিপ্রভাবে রক্তাবশিষ্ট পদার্থ মেদ হয়। শোণিত এবং মাংসের শ্রেষ্ঠাংশ সম্মিলিত হইয়া অস্থি হয়, আবার অস্থির শ্রেষ্ঠাংশ মজ্জারূপে পরিণত হয় এবং মজ্জার সহিত শোণিত মিলিত হইয়া শুক্র উৎপন্ন হয়। অন্ততঃ তাহারা এইরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত সাতটী প্রধান দ্রব্যের বিকার আবার পৃথকভূত শারীরিক উপাদানের উৎপত্তি। যেমন অন্নরসের পরিত্যক্তাংশ শ্লেষ্মা ; শোণিতের পরিত্যক্তাংশ পিত্ত এবং মেদের পরিত্যক্তাংশ মেদ ; অস্থির পরিত্যক্তাংশ নখর এবং কেশ। তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত বায়ু পিত্ত, কফের, অল্পাধিক্য বশতই মানব স্বভাব, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এবং সন্তানোৎপত্তির সময় পিতা মাতার দেহে, পূর্ব্বোক্ত বাত, পিত্ত, কফের, মধ্যে যেটী প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদিগের সন্তান ঠিক তদনুযায়ী স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন, তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের উপর রোগের প্রভাব, ভিন্ন প্রকার এবং শরীর হইতে আত্মার তিরোধানই মৃত্যুর কারণ।

ক্রমশঃ।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

মনুষ্য ও মনুষ্যত্ব।

১১৪ পৃষ্ঠার পর।

সম্মুখে—পশ্চাতে,উর্দ্ধে নিম্নে যে দিকে দৃষ্টিনিপেক্ষ করা যায়,সেই—দিকেই বিশ্বপ্রাণের অনুপ্রাণিত পদার্থ নেত্রগোচর হইতে থাকে; কি অতুল সাগরতলে, কি রেণুময় মরুভূমে, কি নিবিড় কাননে, কি সৌরালোকবিভাসিত দিবাভাগে, কি গভীর তিমিরাবৃত দ্বি প্রহর রজনীতে, কি ধূসরাবরণা সন্ধ্যাসমাগমে, কি হাস্যমুখী সিতবসনা উষারচ্ছটায় যখন যেখানে দৃষ্টি পতিত হয়, প্রকৃতি সুন্দরীর আভরণ পদার্থ নয়ন পথে নাচিতে থাকে। লীলা করিতে লীলাময়ের মনোসাধে যখন যাহা ইচ্ছা হইয়াছে ও যাহা ভাল লাগিয়াছে তখন তাহাই সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির অঙ্গলাবণ্য পরিবর্দ্ধিত ও সৌষ্টবপুষ্টি করিয়াছেন। লীলাসাধন ইচ্ছায় প্রকৃতির সৃষ্টি, লীলাঙ্গ পুষ্ট করিতেই প্রকৃতির সজ্জা, প্রকৃতিকে সাজাইবার জন্যই ভৌত্তিক পদার্থ।

বিদ্বন্মণ্ডলী অনুমান করিয়া থাকেন ভৌতিক পদার্থ সংকুলান করিতে, বাঞ্ছা কল্পতরু নিজাঙ্গ হইতে সত্বাদিগুণ তারতম্যে, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের অবতারণা করিয়াছেন; পদার্থ নির্ম্মাণ কৌশল কি কৌতুকপ্রদ,—ভূতনাথ স্বয়ং ভূত সাজিলেন, এবং স্বয়ংই ওঝা হইয়া ভূত নামাইলেন।

সৌখীন পুরুষের সখের ইয়ত্তা নাই, সখের ঘোরে কখন কোন্‌টা প্রীতিকর তাহা বোধগম্য হইবার নহে; এই যাহা অতীব প্রীতিপ্রদ, পরক্ষণেই তাহা অতি কুৎসিৎ, অপ্রিয় পদার্থ বলিয়া ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইল। সৌখীন পুরুষ এই বাবরি করিয়া চুল কাটিলেন, আয়না ধরিয়া এপার্শ্ব ওপার্শ্ব করিয়া, ফিরিয়া ঘুরিয়া, সরল ও বক্রভাবে গ্রীবা হেলাইয়া, দোলাইয়া প্রতিবিম্বে দেখিলেন, ঠিক যেন মদন মোহন স্বত স্বয়ং মদন! পুনর্ব্বার অঙ্গযষ্টি অবলম্বন করিয়া আসিয়া উপস্থিত, মনের আবেগে সৌখীন পুরুষ আত্মহারা হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আর ভাল লাগিল না, সে বেশভূষায় আপনাকে কদাকার দেখিতে লাগিলেন

সুতরাং বাব্‌রি ঘুচায়ে সম্মুখে কিছু লম্বা পশ্চাতে ছোট ইত্যাকার পাঁচ চুল রকমের বিলাতি পেরুর ন্যায় একটা কিম্ভুতকিমাকার সাজিয়া ফেলিলেন; এই বিশাল শ্মশ্রুজাল, প্রাবৃষের ঘননীল—ঘনাকারে বদন সুধাকর কতক আবৃত করিয়া কতই শোভা করিয়াছে, পরক্ষণেই দেখ আর সে বেশ নাই। শ্মশ্রু অগ্রভাগ ছাঁটা হইয়াছে, বদন চন্দ্রিমা যেন ভারতবর্ষের মানচিত্র, শ্মশ্রু অগ্রভাগ কুমারিকা অন্তরীপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বস্ত্রাদির ত কথাই নাই, প্রতি মূহূর্ত্তেই নূতন ভাবের নূতন বেশ; কত ভাবে কত সাজে সাজ খোলেন তাহা গণনায় নির্দ্দেশ করা দুরূহ। আমাদের পরম পিতাও এই সৌখীন দলের একজন; তাঁহারও কিছুতেই সখ মিটে না। তাঁহার অনন্তভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নাই, যখন যাহা ইচ্ছা, যাহা রুচিকর তাহাই লইয়া প্রকৃতির সজ্জায় তৎপর। কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া গেল, তিনি সেই অন্তরালে বসিয়া সাজ প্রস্তুত করিতেছেন ও যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতেছেন ইহাই তাঁহার লীলা, ইহাতেই তাঁহার আনন্দ, ইহাতেই তাঁহার প্রীতি। দিবা নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই নিরন্তর গিরিগুহা নদ নদী তরুলতা কীট পতঙ্গাদি আভরণে প্রকৃতিকে নিত্য নূতন সাজ পরাইয়া দিতেছেন। শিল্পচতুর অগ্রে প্রকৃতি সুন্দরীকে স্থাবরাভরণে সাজাইলেন, ইহাতে স্বভাব সুন্দরী প্রকৃতির কত শোভা হইল; কিন্তু সৌখীনের সখ মিটিল না—আর কি দিয়া সাজাইলে আরও লাবণ্যচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িবে, কোন্ অঙ্গে আর কি অলঙ্কার দিবেন, কোথায় আর কি আভরণ সাজিবে—এই ভাবিতে ভাবিতে অখিলভাবভাবুক আত্মভাবে আত্মহারা হইয়া, জঙ্গমাভরনের নবাবিষ্কার করিলেন; ক্রমে কীট পতঙ্গাদিতে প্রকৃতি অঙ্গে শোভা সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যতই নূতন আভরণ সৃষ্টি করেন যতই নূতন সাজে সজ্জিত করেন আনন্দময়ের আনন্দ বারিধির আনন্দলহরি ততই উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়ে। নিত্য নূতন আভরণের সৃষ্টি করিতে করিতে মানবাভরণ নির্ম্মিত হইল; উপস্থিত এই নবাভরণের পারিপাট্যেই একান্ত তৎপর; ইহার শিল্প-বৈচিত্রে, কারুকার্য্যে—শিল্পিগুরু চরম উৎকর্ষ ও চরম চমৎকারিত্ব

বিধান করিয়াছেন। উপস্থিত প্রকৃতির এই শেষ সজ্জা; আর নূতন ভাবের নূতন আকারের নূতন সাজ এখনও দেখা দেয় নাই। ভগবান বোধ হয় এই অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া কিছু তৃপ্ত হইয়াছেন, তাহাই বসিয়া বসিয়া সুন্দরী প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর আপনার আনন্দে আপনিই বিভোর হইয়া আছেন।

এই অপূর্ব্ব অলঙ্কার কোথা হইতে কি উপাদানে সৃষ্ট হইল, ইহাতে এমন চমৎকারিত্ব কি আছে, ইহাতে প্রকৃতির এতই কি অঙ্গকান্তি পুষ্ট হইয়াছে এ চিন্তা চিন্তাশীল হৃদয়ে স্বতঃ পরতঃ উদয় হয়। বিশ্বরাজের, বিশাল বিশ্বরাজ্যে মনুষ্য এত কি অপূর্ব্ব পদার্থ, কি উৎকর্ষে এত উৎকর্ষবান, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহা হৃদয়ে স্থান না দিয়া অপসারিত করিতে পারেন। মনুষ্য কি পদার্থ এবং ইহার মনুষ্যত্বই বা কিসে সংস্থাপিত হয় তত্ত্বান্বেষী ভাবুকের অন্তরে এই ভাবনা দিবাযামিনী জাগরূক।

শিশু জননী-জঠর হইতে, ভূমিষ্ট হইলে তখন তাহার কোন জ্ঞানই থাকে না, কিন্তু পরক্ষণেই স্তন চিনিতে পারে, দুই এক দিনে দুগ্ধ চিনিতে পারে, ক্রমে দুগ্ধ পাত্র দেখিলে দুগ্ধ মনে হইতে থাকে; দুই চারিমাস অতীত হইতে হইতে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, ঘর-দ্বার, সলিল-অনিল, প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় পদার্থের উপলব্ধি হয়। শিশু, দিন দিন শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে হইতে গো, মেষ, মহিষ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গ্রাম্যজন্তু, নানাবিধ চিত্র বিচিত্রিত বিহঙ্গমকুল, গৃহোদ্যান রোপিত লতিকা নিচয় ও বিটপিরাজির এক এক করিয়া নাম অভ্যাস করিতে করিতে তাহাদের আকার গত বৈচিত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলে; শিশুর এইরূপ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে "মনুষ্য" নাম কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে স্বীয় পিতা মাতার ন্যায় হস্ত পদাদি অবয়ব সম্পন্ন জীব দেখিবা মাত্র তাহাকে মনুষ্য বলিয়া চিনিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের উপকরণ কি? কি বিশিষ্ট গুণ থাকিলে জীব মনুষ্য নামে অভিহিত হইতে পারে? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি ইতর প্রাণী হইতে ইহাদের কি বৈচিত্র দেখিতে পাওয়া

যায়? শিশু যাহাকে মনুষ্য বলে সেই কি প্রকৃত মনুষ্য! মনুষ্যকে সজীব—জীব নিকর হইতে বিশেষ করিবার জন্য, কি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? ইহা এক ঘোর বিকল্পময় সমস্যা। আপতদৃষ্টিতে দেখিতে পাই দুই হস্ত, দুই পদ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমাবলি সম্বলিত কোমল ও মসৃণ ত্বকাবৃত অঙ্গযষ্টি সমন্বিত জীবই মনুষ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মনুষ্য পদদ্বয়ে ভর দিয়া অবলীলা ক্রমে ঋজুভাবে দণ্ডায়মান, ও ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। মনুষ্য ব্যক্তস্বরে মনোভাব প্রকাশ এবং পকান্ন ভোজন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ফলতঃ মনুষ্যের এই সংজ্ঞা। কিন্তু এই কয়েকটী বহির্লক্ষণই কি জীবকে মনুষ্য নামে অভিহিত করিতে যথেষ্ট উপযোগী? প্রকৃত মনুষ্য পদবাচ্য হইতে কি আর অন্য কোন বিশিষ্ট গুণের আবশ্যক হয় না? তবে কি হস্তপদাদি বহিরিন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবই মনুষ্য? তবে কি ব্যক্তভাষভাষী প্রাণীমাত্রেই মনুষ্য সজ্ঞাবাচ্য? এড়ণ্ড প্রভৃতি সামান্য সামান্য উদ্ভিদ এবং বটাশ্বথ-তাল-তমাল-হিন্তাল-শাল-শাল্মলি প্রভৃতি যাবতীয় প্রকাণ্ড-কাণ্ড-পত্রশাখা-সমন্বিত উদ্ভিদশ্রেণী জনসমাজে বিটপি নামে খ্যাত! কিন্তু ইহারা সকলেই কি প্রকৃত বিটপিবাচ্য, না কিছু তারতম্য আছে? সেইরূপ পকান্নভোজী, ব্যক্তভাষ ভাষী জীবমাত্রেই কি মনুষ্য, না কিছু ইতর বিশেষ আছে? চিন্তাশীল হৃদয়ে এ চিন্তা অভিনব নহে; তত্বান্বেষীর—তত্বই মুখ্য লক্ষ্য পদার্থ। এই প্রশ্নের যথাযথ যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত মীমাংসা প্রতিপাদন কল্পে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি মহর্ষিগণ দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। আমরা মহাত্মা আর্য্য ঋষিগণের চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া তদনুসৃত মার্গে অনুসরণ করিয়া, তত্তৎপ্রণীত দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিলে এই আবর্ত্তময় সংশয়—পারাবার পারে উত্তীর্ণ হইতে পারি। ঋষিবাক্য ব্যতীত সদুত্তর লাভের কোন আশা নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

জীবন-তত্ত্ব।

এই দিগন্তবিস্তৃতা অনন্তযৌবনা ধরিত্রীর যে দিকে চাহিবে, সেই দিকেই দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির পদার্থের সমাবেশ দেখিতে পাইবে—এক শ্রেণী জন্মলাভ করে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সন্তান উৎপাদন করে—আবার কালাবসানে বিগতশ্রী—বিগতদেহ হইয়া দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হয়। অপর শ্রেণী সাধারণ দৃষ্টিতে প্রায় অপরিবর্ত্তনীয়—অনাদি—অনন্ত। এই দুই শ্রেণী যথাক্রমে, চেতন-অচেতন, প্রাণী ও জড় বা সজীব—নির্জ্জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জীব-জন্তু, লতা—গুল্ম প্রভৃতি চেতন শ্রেণীর অন্তর্গত; আর তোমার শরতের শশাঙ্ক, লীলাময়ী তটিনী, মেঘস্পর্শী গিরিশৃঙ্গ প্রভৃতি অচেতন মধ্যে পরিগণিত।

কেহ কেহ বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে চেতন পদবী প্রদান করিতে অসম্মত। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহাদেরও চৈতন্য আছে। ইহারাও জীবজন্তুর মত জন্মলাভ করে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—আবার আয়ুশেষে মরিয়া যায়। ইহাদের যে অনুভব শক্তি আছে সে বিষয়েও বড় সন্দেহ নাই। লজ্জাবতী লতার স্পর্শশক্তি সর্ব্বজনবিদিত। তিন্তিড়ীপত্র যে সন্ধ্যাগমে মুদিত হয় আবার নিশি-শেষে বিকাশ পায় তাহাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমেরিকার পতঙ্গভুক্ বৃক্ষের বৃত্তান্ত আরও সন্দেহনিবারক। সুতরাং উদ্ভিদের মধ্যে চৈতন্যশক্তি পরিস্ফুট না হইলেও যে অন্তর্নিহিত, আজ কাল বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে, সে বিষয়ে কোন বিজ্ঞব্যক্তি বোধ হয় সন্দেহ করিতে পারেন না।

এখন, এই দুই সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর পদার্থরাশি মধ্যে পার্থক্যের মূলীভূত কারণ কোথায়? কোন্ অন্তর্নিহিত শক্তি প্রভাবে চেতন বর্দ্ধমান, উৎপাদনক্ষমত্ত পরিবর্ত্তন শীল? কিসের প্রভাবে চেতন, অচেতন হইতে বিভিন্ন? বৈজ্ঞানিকের মতে এই শক্তির নাম জীবনীশক্তি। একের জীবন আছে অপরের নাই—তাই উভয়ে এত প্রভেদ।

জীবদেহ অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিলে দেখা যায় যে, ইহা অস্থি, মাংস, মস্তিষ্ক, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থলী প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত। আবার আরও সূক্ষ্ম বিভাগ করিলে দেখিবে যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশও প্রত্যেক স্নায়ু, পেশী এবং সংযোজক, বহির্ব্বাহক প্রভৃতি নানাবিধ শিরারাশি সমুদ্ভূত। এই শিরা সমষ্টিকে ঝিল্লী (Tissue) কহে। এই ঝিল্লী আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোষাবলী (Cells) বিনির্ম্মিত। সুতরাং জীবদেহ অসংখ্য কোষসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বৃত্তান্ত পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, এই অশেষ কৌশলময় নরদেহেরও আদি কারণ এক ইঞ্চির ১/১২০ অংশ পরিমিত অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কোষমাত্র। বৃক্ষলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ সমূহও, জীবদেহের ন্যায় এইরূপ সূক্ষ্ম কোষরাশির সমষ্টি মাত্র।

সুতরাং জীবনতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে এই কোষসমূহের আকৃতি প্রকৃতি এবং কার্য্যসম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা উচিত। কোষগুলি "জীবাঙ্কুর" সংযুক্ত (Protoplasm) নামক পদার্থ বিশেষে বিনির্ম্মিত। ইহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি—অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। সমস্ত দেহের মধ্যে যে যে পরিবর্ত্তন হয়, ক্ষুদ্রকোষগুলিরও অত্যল্প সময়মধ্যে ঠিক সেই সেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ইহারাও কোষান্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া নূতন কোষ উৎপাদন করিয়া অবশেষে মরিয়া যায়। এক্ষণে দেখিতেহইবে প্রটোপ্লসম্ জিনিসটা কি? প্রটোপ্লাসম্ দেখিতে আঠার মত—কখন বা অর্দ্ধ তরল, কখন বা খুব প্রগাঢ়। জীবিত প্রটোপ্লাসম্ অত্যন্ত অস্থির, ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় গুণযুক্ত, এবং জলের সহিত মিশিতে হয় না।

কারেণ হীটের ১৩০° উত্তাপে ইহা জমিয়া ঘনীভূত হয়—সুতরাং কোন চেতন পদার্থের উত্তাপ ১৩০° ডিগ্রির উর্দ্ধে উঠাইলে আর তাহা জীবিত থাকিতে পারে না। রাসায়ণিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রটোপ্লাসম্ কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং সালাফারের রাসায়ণিক সংযোগে সমুৎপন্ন।

একবার ইউরোপে এই তত্ত্ব লইয়া খুব আন্দোলন উঠিয়াছিল।

টিণ্ডেল্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রটোপ্লাসম্ সৃষ্টি পর্য্যন্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভরসা ছিল প্রটোপ্লাসম্ হইতে ক্রমে প্রাণ পর্য্যন্ত বাহির হইতে পারিবে। তাহা হইলেই এই দুঃখ জর্জ্জরিত—তাপক্লেশ প্রপীড়িত মর্ত্ত্যভূমির অর্দ্ধেক দুঃখ হঠাৎ ঘুচিয়া যাইবে—আর বৃদ্ধা জননীকে "নয়ননন্দন প্রিয়পুত্র শোকাতুরা" হইয়া কাঁদিতে হইবে না—আর পতিবিরহে হিন্দুপত্নীকে অনন্ত কষ্টময় বৈধব্যজীবন বহিতে হইবে না, জ্বালাযন্ত্রণা ফুরাইবে, শোকতাপ ঘুচিবে—জগতে শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, কিন্তু হায় সকল আশায় ছাই পড়িল—প্রটোপ্লাসম্ হইল বটে, কিন্তু জীবন মিলিল না—অনন্ত জ্ঞানীর অপরিমেয় শক্তি ক্ষুদ্র আশালুব্ধ মানবের সংকীর্ণ বুদ্ধিতে ধরা গেল না! প্রটোপ্লাসম্, জীবনসম্বন্ধে কি কি কার্য্য করে তাহা ইহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। সমুদ্রে, পরিষ্কৃত জলে অথবা আর্দ্র মৃত্তিকায় এমিবা (Ameeba) নামে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব আছে। ইহার শরীর একটীমাত্র কোষনির্ম্মিত। সুতরাং প্রটোপ্লাসমের গুণাবলী পরীক্ষা করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। সুতরাং এমিবার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই প্রটোপ্লাসমের প্রধান প্রধান গুণগুলি বেশ বুঝা যাইবে।

১। চলৎশক্তির স্বেচ্ছাধীনতা। শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ সহযোগে "এমিবার" শরীর পরীক্ষা করিলে প্রথমে ইহাকে একখণ্ড বিষমাকৃতি (Protoplasm) বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুই এক মিনিট মনঃসংযোগে করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, ইহার একদিক হইতে একটী শাখার ন্যায় বাহির হইতেছে—ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরটী এই শাখার ভিতর প্রবিষ্ট হয় ক্রমে আবার আর একটী শাখা বাহির হয়, আবার সমস্ত শরীর ইহার ভিতর প্রবেশ করে। এইরূপে সাপ বা কেঁচো যেমন বুকে হাঁটিয়া চলিয়া যায়, এমিবা ও সেইরূপে চলিতে থাকে। মনুষ্যদেহের রক্তকণিকাও এইরূপে চলিয়া বেড়ায়।

২। অনুভব শক্তি এবং প্রতিঘাত ক্ষমতা। এমিবার চলৎশক্তি

ইচ্ছাধীন হইলেও বাহ্যিক শক্তি প্রভাবে তাহার গতি বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হইতে পারে। উত্তাপ কমাইলে সময়ে সময়ে ইহার গতিরোধ হয়, আবার উত্তাপ বৃদ্ধি করিলেই ইহা সজোরে চলিতে থাকে। আবার, বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ, ঈষৎ চাপ, অথবা তাড়িত প্রয়োগেও ইহার চলৎশক্তি উৎপন্ন বা সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, প্রটোপ্লাসমের অনুভবশক্তি আছে এবং এই অনুভব শক্তিই ইহার শরীরের আকুঞ্চন ও প্রসারণে প্রকাশিত হয়।

৩। খাদ্য সংগ্রহ। (Amœba) অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুর চতুস্পার্শে ঘুরিয়া বেড়ায় এইরূপে তাহাদের মধ্য হইতে ইহার শরীরোপযোগী রস বাহির করিয়া লয় পরন্তু অপ্রয়োজনীয় অংশ পড়িয়া থাকে। এই রস হইতে ইহার দেহাংশ নির্ম্মিত হয়। কার্য্য করিতে করিতে (Amœba) র যে শক্তিক্ষয় হয় তাহা সে, এইরূপে পূরণ করিয়া লয়। যত দিন ক্ষয় ও নির্ম্মাণ সমভাবে চলিতে থাকে ততদিন শরীরের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ক্ষয় ও সঞ্চয়াধিক্যে ইহার জীবনী শক্তির যথাক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং কিছুকাল এই রকম চলিলে অবশেষে ইহা মরিয়া যায়।

৪। উৎপাদিকাশক্তি। এমিবার অন্তর্নিহিত প্রটোপ্লাসম্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে এমন অবস্থায় উপনীত হয়, যখন ইহার উৎপাদন করিবার শক্তি জন্মে। এই সময়ে ইহা আপনা হইতে দুই বা তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়। বিভক্ত খণ্ডের প্রত্যেকেই আদিম অংশের মত গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমে তাহারা ও আবার বৃদ্ধি পায় এবং তাহারাও সময়ে আবার অপর এমিবার জন্মদাতা হইয়া উঠে। এইরূপে জীবনীশক্তি চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। বি, এ।

বাঙ্গালীর নাটকত্ব।

বঙ্গদেশে নাটকের অবস্থা কিরূপ? আজ নূন্যাধিক চল্লিশ বৎসরে বাঙ্গালা দেশের নাটকের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং তাহার ক্রম বিকাশ সম্বন্ধে বাধা বিপত্তি উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে নাটকের গুণাগুণ বর্ণনা করিলে, প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করা অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক নাটক কি? নাটক কর্ম্মসমবায়ে গঠিত, কর্ম্মময় কাব্য। কর্ম্ম, বাদ দিলে নাটকত্বের কিছুই থাকে না,—কর্ম্মই নাটকের প্রধান উপাদান। কার্য্যক্ষেত্রের এক একটী ঘটনা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই আলোক ছায়া সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া পাঠকদিগের সম্মুখে ধরাই নাটককারের কার্য্য এবং সমাজের ঘাত প্রতিঘাতেই নাটকের সৃষ্টি এবং বিকাশ। সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টিকরা ব্যতীত নাটকের আরও কার্য্য আছে—সাধারণের মনের উপর নাটকের প্রভাব অত্যন্ত অধিক, প্রকৃত নাটক সমাজ যন্ত্রকে নিয়মিত করিয়া থাকে। নাটকের দ্বারা সমাজ সংস্কার হয়—সঙ্গে সঙ্গে সকলে শিক্ষালাভও করিয়া থাকে। ইহা মানব সমাজের প্রকৃতি, ইহাতে মানব সমাজের দোষ গুণ উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়—পশু প্রকৃতি, এবং মানব প্রকৃতি (মনুষ্যত্ব) তুল্যরূপে মানব সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহাতে যেমন মানবের উচ্চতম স্বর্গীয়ভাব প্রদর্শিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অতি নীচ, কুপ্রকৃতি, নারকীয় ভাবও সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা সমাজের সদ্‌গুণ সমূহ বিকশিত এবং অসদ্‌গুন সমূহ তিরোহিত হয়। নাটক পাঠকগণের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া পাপ পুণ্যের ফলাফল দেখাইয়া দেয়। একদিকে পাপের ভীষণ যন্ত্রণা, নৈরাশ্যের তীব্র ক্লেশ, অনুতাপের বৃশ্চিকদংশন, আর একদিকে পুণ্যের সুরভিপূর্ণ সুখ-মলয়-মারুত, দুঃখের পর আনন্দ, যন্ত্রণার পর শান্তি, সংগ্রামের পর বিরাম। এইরূপে নাটকের দ্বারা নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়া মানবসমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়।

উচ্চশ্রেণীর নাটক সমূহে এই নিমিত্ত আদর্শনীতির প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

তারপর সমাজ সংস্কারের কথা বলিতেছিলাম। নাটক, সমাজের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া তাহাতে তাহার তীব্র শর নিক্ষেপ করে, সমাজের অন্যায় এবং অসদাচরণের বিরুদ্ধে কশাঘাত করিতে থাকে, এইরূপে দূষিত সমাজ সংশোধিত হয়। শুধু নাটক কেন, নবেল ও কবিতাতেও পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ৺ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, (Pope এর Satire) তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ডিকেন্স, ফিলডিং, স্মলেট্, গোল্ডস্মিথ্, রিচাউসন, প্রভৃতি লেখকগণ ইংলণ্ডের নৈতিকসাধনে কিরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা ইংরাজি সাহিত্য—ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু এইরূপ সমাজ সংস্করণে নাটকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আবার নাটক অপেক্ষা প্রহসন সমধিক উপযোগী। নাটক এবং প্রহসন ঠিক সমাজের মর্ম্মস্থলে আঘাত করে—নভেল কিম্বা কাব্য যেখানে চর্ম্মভেদ করিতে পারে না, নাটক সেখানে মেদ-মাংস ভেদ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করে এবং এইরূপে সমাজ সংস্কার সাধিত হয়। নাটক যেরূপ মহৎগুণ সমূহে পরিপূর্ণ, প্রহসনেও তাহার অসদ্ভাব নাই;—সে গুণ সমূহ না থাকিলে, প্রহসন অন্তঃসারবিহীন কেবল কতকগুলি অসংযুক্ত "ভাঁড়ামী" হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার কিছুমাত্র মূল্য থাকে না।' "সধবার একাদশী" "বিবাহ বিভ্রাট্" প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন, তাই উক্ত পুস্তকগুলি উৎকৃষ্ট প্রহসন বলিয়া জন সমাজে পরিচিত।

এতদ্ভিন্ন নাটকের আর একটী গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা চরিত্র সৃষ্টি। যে নাটকে যে পরিমাণে চরিত্র বিকশিত হয়, সেই নাটক সেই পরিমাণে সাহিত্য জগতে শ্রেষ্ঠ। তাই সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের স্থান অত উচ্চে। নাটকের দ্বারা আভ্যন্তরীণ মনুষ্যচরিত্র বিকশিত হইয়া উঠে—এবং তাহাই নাটকের নাটকত্ব। চরিত্র বিকাশ বিহীন নাটকের মধ্যে, আদৌ একটা প্রাণ থাকে না, সে যেন একটা প্রাণশুন্য জড়পদার্থবৎ সাহিত্য জগতে পড়িয়া থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র নাটকে চরিত্র রচনা করিলেই যে তাহা একটী উপাদেয় নাটক হইবে তাহা

নহে—তাহার প্রত্যেক চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, তাহা যেন "শিব গড়িতে বানর" না হইয়া পড়ে। অনেককেই আজ কাল নাটক লিখিতে দেখা যায়—প্রতি বৎসর বিস্তর নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে আদৌ চরিত্রের রচনা চাতুর্য্য দেখিতে পাওয় যায় না। চরিত্র বিন্যাসের ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে, এবং অতি অল্প লোকেই পূর্ব্বোক্ত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

কেবলমাত্র চরিত্র বিকাশ থাকিলেই চলিবে না, তাহার সঙ্গে আবার নাটকে গল্পের বাঁধুনি (Plot) থাকা চাই। গল্পের জমাট্ না থাকিলে সমস্ত নাটকটা যেন "নদ্‌গদ্" করিতে থাকে,—চরিত্র বিকাশই নাটকের প্রাণ, গল্পের বাঁধুনি বা ঘটনা বিন্যাস নাটকের দেহ। আবার কেবলমাত্র ঘটনাসমষ্টি সংযোগে উচ্চাঙ্গের নাটক হইতে পারে না। ঘটনা সমষ্টি নাটককে একটা দেহ দিতে পারে বটে, কিন্তু চরিত্র বিকাশ ব্যতিত কেহ তাহার দেহে প্রাণ এবং সৌন্দর্য্য দিতে পারে না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, উচ্চাঙ্গের নাটকের জন্য ঘটনাসমষ্টি এবং চরিত্রবিকাশ তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়।

নাটক লেখা নিতান্ত সহজ নহে। চরিত্র রচনা ও আগা গোড়া নাটকে ভাবের সামঞ্জস্য রাখা বড় যে সে লেখকের কর্ম্ম নহে। নাট-কের সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া একটী সুন্দর ভাব, একটী সুন্দর ঘটনা-শৃঙ্খলা ও কল্পনার আদ্যন্ত একটী সুমধুর প্রবাহ থাকা আবশ্যক। নাটকের জন্য চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা থাকাও প্রয়োজনীয়। নাটক তাৎকালিক জনসমাজের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ইহার এক একটী চরিত্র সমস্ত জনসমাজের এক এক অঙ্কে "ফটো"। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের নিকট সে চিত্র জীবন্তভাবে দেখা দেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নাটকের আদ্যন্তে একটী সুন্দর ভাব প্রবাহিত থাকা আবশ্যক। সুন্দর সুন্দর নাটক নিচয়ে একটী ঘটনাও বৃথা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার প্রত্যেক কথাই যেন একটী সুন্দর নাট্যরসে অভিসিঞ্চিত। তাহার প্রত্যেক চরিত্র একটী সুন্দর শৃঙ্খলায় বদ্ধ হইয়া এক একটী অঙ্গ

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যেন, তাহা সেই নাটকেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মানবচরিত্র বিন্যাস, সুন্দর চিত্রাঙ্কন, ঘটনাবলীর সংযোজন, অসাধারণ প্রতিভার কার্য্য। এবং তাহাই উচ্চ অঙ্গ নাটক সৃজনের একমাত্র উপাদান।

প্রত্যেক দেশেই সময়ে সময়ে এক একটা যুগ আসে, তা সমাজেরই হউক, ধর্ম্মের হউক, সাহিত্যেরই হউক, এক একটা যুগ আসে। আমাদের দেশে এইরূপ একটা যুগ (?)—স্রোত আসিয়াছিল। আপাততঃ বাঙ্গালায় নাটকীয় স্রোতের কথা বলিতেছিলাম। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এই নাটকের স্রোত একবার তর্ তর্ বেগে বহিয়াছিল—নাটক নাটক করিয়া তুমুল রব উঠিল, নাটকে নাটকে দেশ ছাইয়া ফেলিল। বর্ষে বর্ষে ছাপাখানা ; শত শত নাটক উদ্গীরণ করিতে লাগিল। সকলেই গ্রন্থকার। স্কুলমাষ্টার, কেরাণী হইতে স্কুলবয় ও কোনেবউ পর্য্যন্ত—ক্রমে সকলেই নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। ঈশ্বর গুপ্তের "না টক না মিষ্টি" এবং বঙ্গদর্শনের তীব্র সমালোচনা নাটকের সে খরতর বেগ রোধ করিতে পারিল না—শেষে এমন হইল যে, নাটকের আর নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তার পর হঠাৎ এ স্রোত থামিয়া গেল। তখন লোকে দেখিল যে, ২।৪ জন মাত্র সেস্রোত অতিক্রম করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ লেখকই বন্যার জলে তৃণখণ্ডের ন্যায় সেই স্রোতোবেগে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন। কেহবা কুলকিনারা দেখিতে না পাইয়া সেই স্রোতের জলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

সেই সময় বহুসংখ্যক নাটক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ২।৪ খানি ব্যতিত তাহার অধিকাংশই "রাবিশ মাল"। তাহাতে "হায় হায়!" "মরি মরি!" "প্রাণনাথ" "কোকিলের কুহু কুহু" আছে, "জ্যোৎস্না" আছে! "বিরহ, মিলন" আছে, "দীর্ঘশ্বাস, হাসি" "স্বপ্ন, যুদ্ধ" "ঝড় বৃষ্টি" সবই আছে—নাই কেবল নাটকের যাহা নাটকত্ব, তাহা বাস্তবিকই অতি অপূর্ব্ব জিনীস—তাহা নাটক না মিষ্টি"!

এইরূপে দেখা যায় যে, বহুসংখ্যক নাটককারের মধ্যে অতি অল্প

লোকেই নাটক লিখিয়া জনসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং সেই সকল নাটক লেখকের সংখ্যা এত অল্প য, তাহা হস্তরেখা অতিক্রম করে না। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর ভারতচন্দ্র, বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে "চণ্ডি" নামক নাটক প্রণয়ন করেন, তৎপরে, ১৮৫৪ খৃঃ স্বর্গীয় পণ্ডিত রাম-নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় প্রকৃত বাঙ্গলা নাটকের জন্মদান করেন। তাঁহার "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নাটক। তাহা সংস্কৃত বহুল এবং দুর্ব্বোধ। তাহাতে নাটকীয় গুণের বিকাশও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম নাটক সুতরাং ঈদৃশ সংস্কৃত বহুল এবং দুর্ব্বোধ হওয়া বিচিত্র নহে। তার পর তিনি আরও কয়েকখানি নাটক রচনা করেন; "রত্নাবলী" "রুক্মিণী হরণ" "বেণীসংহার" "নবনাটক" বঙ্গসাহিত্য সংসারে তাঁহার মুখোজ্জল কারী পুত্র। "রত্নাবলী" ও "বেণীসংহার" সংস্কৃতের অনুবাদ মাত্র। কিন্তু তাঁহার "নবনাটক" খানি সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব এবং তাহাতেই তাঁহার রচনানৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি অতিশয় সুরসিক ছিলেন, এবং তাঁহার রচনা সুন্দর ও ব্যাঙ্গরসাত্মক। সাধারণের কাছে তিনি "নাটুকে নারায়ণ" বলিয়াই বিখ্যাত। তাহার পর আর একখানি নাটক প্রকাশিত হয়, তাহার নাম "বিধবা বিবাহ" বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত পূর্ব্বোক্ত নাটকের রচয়িতা, এই গ্রন্থে "বিধবা বিবাহের" পক্ষ সমর্থন চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু গুণপনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই হইতে নাটক লেখা একটা "ফ্যাসন" হইয়া দাঁড়ায়—এবং দোকান দার হইতে উকিল, মোক্তার সকলেই নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তন্মধ্যে প্রতিভাশালী লেখকের সংখ্যা অতি অল্প। তারপর আমাদের দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুসূদন। তাঁহারা যে দিন বাঙ্গালায় নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, সেই দিন হইতে বাঙ্গালায় প্রকৃত নাটকের সৃষ্টি হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত।

*　*　*　*　*　*　*

এই সংখ্যায় গ্রাহকবর্গকে ১ ফর্ম্মা ভৈষজ্য তত্ত্ব উপহার দেওয়া গেল।

হিষ্টিরিয়া।

সমসংজ্ঞা। গুল্ম বায়ু, মূর্চ্ছাগত বায়ু।

রোগ-পরিচয়। স্নায়ু বিধানের ক্রিয়াগত নানাবিধ গোলযোগ হেতু ভাক্ত (মিথ্যা) রোগের স্বরূপ ইহাতে প্রকাশ হয়। ইহ বিধানগত রোগ নহে। ইহা প্রায়ই নিশ্চয় আরোগ্য হয়। তবে ইহার স্থায়িত্বকালের নিশ্চয়তা নাই। আমরা ইহাকে "ব্যাধি মরীচিকা" কিম্বা "ব্যাধি দর্পণ" বলিয়া থাকি; কারণ জগতে যে কোন ব্যাধি আছে তাহাদের প্রায় রোগেরই "অনুকৃতি-স্বরূপ" হিষ্টিরিয়া রোগে দেখা যায়। ঝিঁঝিঁ ধরা, বেদনা, পক্ষাঘাত, আক্ষেপ, কন্ভালশন্, হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন্, প্রস্রাব বন্ধ, এবং অন্যান্য নানাবিধ অসুখভাব এই পীড়ার লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। এই অসুখ যাহার একবার হয় তাহার অনেকবার হইতে দেখা যায়; এই রোগের রোগীকে হিষ্টিরিকেল রোগীবলে। ইহাতে মানসিক গোলযোগ সর্ব্বপ্রধান; অনেক সময় এই রোগ হইতে প্যারালিসিস্ কিংবা আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগিণী ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার প্যারালিসিস্‌যুক্ত অঙ্গ চালনা করিতে পারে না। আবার এই রোগ হঠাৎ বা আস্তে আস্তে আপনি আরোগ্য হইয়া যায়। অনেক সময় গ্যাল্ভেনিক্ ব্যাটারি, নানাবিধ ভয়, রাগ, তাড়না প্রয়োগে ফল পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহা বিশেষ সন্তোষকর নহে। অনেক সময় উপদেশ ও সাহস ইহাতে ফল প্রদ।

গ্রীক মূলক, ইউটেরাস্ (জরায়ু) শব্দ হইতে হিষ্টিরিয়া শব্দের সৃষ্টি। কারণ বিশ্বাস এই যে, জরায়ুর গোলযোগ হেতু হিষ্টিরিয়া রোগ জন্মে। এমন কি পূর্ব্বে লোকের ধারনা ছিল যে, জরায়ু শরীরের স্থানে স্থানে চলিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। যদিচ অনেক সময় পূর্ণ যুবতী ও যৌবনের প্রারম্ভ প্রাপ্তা বালিকাদিগের এই রোগ অধিকতর হইতে দেখা যায় তথাপি ইহা যে সম্পূর্ণ কামেচ্ছা-উদ্ভূত পীড়া তাহা আমরা সকল সময় স্বীকার করিতে পারি না। এই পীড়া যুবক ও পূর্ণ বয়স্ক পুরুষদিগেরও হইতে দেখা যায়। ইহার

নিদান তত্ত্ব এখনও তিমিরাচ্ছন্ন। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে এই রোগ হইলে "ভূতে পাইয়াছে" বলিয়া রোগিনীকে ওঝাগণ অবৈধ কষ্ট দিত ও প্রহারাদি করিত।

কারণতত্ত্ব।—এই পীড়া অধিকাংশ স্থলে ১৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই দেখা যায়। হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ বংশোদ্ভূতা অনেকরই এই পীড়া হইতে দেখা যায়। উন্মাদ ও অত্যন্ত সুরাপায়ীদিগের সন্তান সন্ততিদিগের মধ্যে এই পীড়া জন্মিয়া থাকে। হিষ্টিরিয়া রোগী দর্শন, হিষ্টিরিয়া রোগীর সংসর্গ হেতুও এই রোগ জন্মিতে পারে। সর্ব্বদা সামান্য অসুখেও অতীব সহানুভূতি প্রকাশে রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীচন্দ্রশেখর কালি।
এল, এম, এস।

সংগ্রহ ও মুষ্টিযোগ।

আজ আমরা গুটিকতক পরিচিত মুষ্টিযোগের উল্লেখ করিব, পাঠকগণ তাহা স্ব স্ব গৃহে ব্যবহার করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই ফল প্রাপ্ত হইবেন।

বৃশ্চিকদংশন। আম্রের কশী একপোয়া, একপোয়া জলে কিছু দিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া সেই জল বোতলে পূরিয়া রাখিবে বিছা বোলতা ভিমরুল প্রভৃতি দংশন করিলে ঐ জল দ্রষ্ট স্থানে ১০।২০ ফোঁটা দিলে অচিরাৎ জ্বালা নিবারণ হয়। কিম্বা যখন দেখিবে যে, বৃশ্চিক দংশনে অতিশয় যন্ত্রনা হইতেছে, এবং বেদনা ও যন্ত্রনা ২।৩ দিন পর্য্যন্ত রহিয়াছে তখন "ক্ষুদ্র নুনে" নামক তৃণ, দ্রংষ্ট স্থানে ঘশিয়া দিলে যন্ত্রণা উপশমিত হয়। ক্ষুদ্র নুনে—অতি ক্ষুদ্র জাতীয় শাক, সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং অনেকে পাক করিয়া শাকের ন্যায় আহার করিয়া থাকে।

অতিশার। সজিনার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল অল্প গরম থাকিতে থাকিতে আধপোয়া আন্দাজ প্রত্যহ দুইবার খাইলে আমাশয় আরোগ্য হয়। কাঁচা আম ভাতেও আমাশয়ের পক্ষে উপকারি। কিম্বা রাখাল ছিটকি গাছের পাতা ৫।৬ টা গোলমরিচের সঙ্গে বাটিয়া লৌহ পাত্রে গরম করিয়া সেবন করিলে অচিরে আমাশয় পীড়ার উপশম হয়। সেই সঙ্গে রোগীর পথ্যের সহিত ডালিম পাতা,

ঘৃতে ভাজিয়া খাইতে দিলেও সবিশেষ উপকার দর্শে। বেলপোড়া আমাশয়ের পক্ষে যে কিরূপ উপকারী তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন।

সর্দ্দি কাশী। শুক্না বেলপাতার গুঁড়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার বড়ি তৈয়ার করিয়া প্রত্যহ একটী করিয়া বড়ি মুখে রাখিলে কাশী আরোগ্য হয়। কিম্বা লবঙ্গ, পিপুল জায়ফল, বংশলোচন, গুলঞ্চের সত্ব, যষ্টিমধু, বহেড়া প্রত্যেক এক এক তোলা, কাল মরিচ পাঁচ তোলা, শুণ্ঠী আট তোলা এবং মিছিরি এক পোয়া সমুদায় কুটিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া শিশিতে করিয়া রাখিবে। যে সময়ে কাশির বেগ হইবে সেই সময়ে ৪।৫ রতি এই ঔষধ খাইবে, তাহাতে অনেকটা কাশির শান্তি হয়। প্রথম প্রথম সর্দ্দি হইলে "কুমারীকা" লতার শিকড় ২।৩ টা গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইতে দিলে কিম্বা হরিদ্রা গুঁড়া ও আদা বাটিয়া তাহার বড়ি প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে সেবন করিলে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। জলকাশি হইলে, আদা, গোল গোল করিয়া কাটিয়া সৈন্ধব লবণ মাখাইয়া জলন্ত সলিতায় পুড়াইয়া সেবন করিবে। ২।৩ দিন এরূপ করিলে কাশীর শান্তি হইবে। সর্দ্দিতে গলায় যদি বেদনা হয় তাহা হইলে তাম্বূল পত্রে, সরিষা তৈল গরম করিয়া লাগাইবে। কাশী যদি হাঁপানির মত হয় তবে শ্বেত আকন্দের পাতায় সরিসার তৈল গরম করিয়া রোগীর গলায় মালিস করিবে। শিশুদিগের কাশি হইলে ময়ূরের পুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়াইলে কাশী আরাম হয়। যদি সর্দ্দি গলায় বসিয়া যায় এবং অনেকটা হাঁপানির মতন দেখা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আকন্দ পাতায় তৈল গরম করিয়া গলায় লাগাইয়া দিলে হয়। একটা মাটির গামলায় আগুণ রাখিয়া তাহাতে আকন্দের পাতে তৈল দিয়া রাখিলে তৈল উত্তপ্ত হয়, ঐ গরম তৈল গলায় লাগাইলে বিশেষ আরাম বোধ হয়। এইরূপ কিছুক্ষণ সেঁক দিলে হাঁপানির কষ্ট দূর হয়।

ছুলি। ছুলি এক প্রকার চর্ম্ম রোগ, ইহা শরীরকে বিবর্ণ ও কদাকার করিয়া তুলে। ছুলি হইলে আশশ্যাওড়ার বীজ, জলধার চন্দনের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র ছুলি আরোগ্য হয়। কিম্বা হলুদের ফুলের ভিতর যে এক প্রকার তরল পদার্থ থাকে, উহাতে চন্দন ঘসিয়া ঐ চন্দন গাত্রে লেপন করিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা সংবাদ।

নাসাজ্বর। এই পীড়া ভারৎবর্ষের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়, তবে বাঙ্গালাদেশে ইহার প্রভাবটা কিছু বেশী। এ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ ডাঃ ফার্ণাণ্ডিজ কর্ত্তৃক মেডিক্যাল কংগ্রেসে পঠিত হয়, সম্প্রতি তাহা "মেডিক্যাল রিপোর্টারে" প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন রোগটা এদেশে বড় সাধারণ, অথচ অনেকটা অজ্ঞাত। এদেশের কবিরাজেরা এই জ্বরের সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন, এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও ইহার সবিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ডাক্তারেরা প্রায়ই এই জ্বর সম্বন্ধে ভুল করিয়া থাকেন—তাঁহারা রোগটাই আদপে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন না। নাসিকার অভ্যন্তরে একটী লোহিত গুটিকার ন্যায় দেখা যায় এবং তার সঙ্গে বেশ জ্বর হয়। তাহাতে অনেক ডাক্তারে মনে করেন যে, ইহা বুঝি মস্তকের কোন স্নায়বিক পীড়া হইতে উৎপন্ন। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, মস্তকে শ্লেষ্মা বসিয়া ঐরূপ হয়। জ্বরের সাধারণ লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠে, গলদেশ ও স্কন্ধে বেদনা অনুভূত হয়। মুখমণ্ডল স্বল্প পরিমাণে ভারভার হয়। এই সকল লক্ষণ সচরাচর তিন দিন হইতে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত থাকে, তার পর আপনাপনি কমিয়া আইসে—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নাসাও চুপসাইয়া যায়। কিন্তু কখন কখন বিপরীত ফল দৃষ্টিগোচর হয়—সহসা ফুলাকমিয়া গিয়া জ্বর বেশী হয়, প্রলাপ এবং অপরাপর দুর্লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া মৃত্যু হয়।

লক্ষণ। যদিও নাসিকার ভিতর অল্প স্ফীত হয়, তথাপি তাহাতে বেদনা প্রায়ই থাকে না, সুতরাং রোগীরা চিকিৎসকের কাছে সে বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া, কেবল শিরঃপীড়া, জ্বর, শরীরের বেদনা প্রভৃতির উল্লেখ করে, এবং চিকিৎসকও সামান্য জ্বরের ন্যায় নাসা জ্বরের চিকিৎসা করেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল দেখিয়া, রোগীর নাসিকার ভিতর দৃষ্টিপাত করিলে প্রকৃত রোগ চিনিতে পারা যায়। ইহা স্ত্রী—পুরুষ সকলেরই হইতে পারে—কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের ইহা অতি অল্প পরিমাণে হয় এবং পুরুষদেরও ১৩। ১৪ বৎসরের পূর্ব্বে প্রায়ই হয় না। এবং শিশুদিগের ইহা একেবারেই হয় না। পঞ্চাশ বৎসরের পর এ রোগের আর আশঙ্কা থাকে না। বৈশাখ এবং ভাদ্র মাসে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী এবং শীতকালে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায় না। এই জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বড় মতভেদ দৃষ্টিগোচর হয়।—

কেহ কেহ বলেন, জ্বর হইতেই ইহার উৎপত্তি, কেহ বলেন লিভারের বিকৃতিই ইহার কারণ, আবার কেহ কেহ বলেন ম্যালেরিয়া হইতেই ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এইরূপ স্থির করিয়া ঐ রোগে কুইনাইন প্রদান করেন, কিন্তু উহাতে কোন উপকারই হয় না। অনেকে বলেন, যখন ম্যালেরিয়া—প্রধান স্থানে ইহার উৎপত্তি, তখন ম্যালেরিয়াই ইহার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু ডাঃ ফার্ণা-ণ্ডিজ বলেন যে, এমন অনেক স্থানে ইহা দৃষ্টিগোচর হয়, যেখানে আদৌ ম্যালেরিয়া নাই। আর্সেনিকে এই রোগের কোন উপকারই হয় না।

চিকিৎসা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কুইনাইন কিম্বা আর্সে-নিকে এ রোগের বড় একটা কিছু উপশম হয় না। অহিফেন দ্বারা গলদেশ, পৃষ্ঠ প্রভৃতির বেদনার অনেকটা উপশম হয়। তিনি এই রোগে "টার্টার এমেটিক্" ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। এই রোগের সাধারণ চিকিৎসা—যেমন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে—ছুঁচ দিয়া নাসা গালিয়া দেওয়া, তাহাতে খানিকটা রক্ত পড়িয়া অতি শীঘ্র যন্ত্রণার লাঘব হয় কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করা ভাল নহে, এবং নিরাপদও নহে। আকন্দবৃক্ষের রস নাসিকার শিরায় মর্দ্দন করিলেও বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বলেন নাসারোগে আমার চিকিৎসা—কোন প্রকার বিরেচক ঔষধ প্রদান এবং দিবসে ২।৩ বার করিয়া নাসিকার উপরিভাগে শীতল কিম্বা বরফের জল ইন্‌জেক্ট করা। এইরূপ চিকিৎসায় বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩।৪ দিনের মধ্যে উক্ত রোগ কমিয়া যায়। তিনি বলেন যে তাঁহার অধীনে কয়েকজন রোগীর নাসাজ্বর হইয়া ক্রমে অতি-রিক্ত জ্বর, প্রলাপ এবং বিকার হইয়াছিল।

* * * * *

দংশনে পার্ম্মাংগেনেট অব্ পটাস্ } ক্ষিপ্ত কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি দংশনে "হাইড্রো-ফোবিয়া" হইতে কি করিয়া অব্যাহতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে ডাঃ মরিশন্ "ম্যাডিক্যাল্ রেকর্ড" নামক পত্রিকার একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পার্ম্মাঙ্গেনেট্ অব্ পটাস্ ব্যবহার করিয়া গত সপ্তদশবর্ষ তিনি বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সমীপে যে সকল রোগী আসিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ বিংশজন—৯ জন ক্ষিপ্ত কুক্কুর এবং ১১ জন ক্ষিপ্ত শৃগাল কর্ত্তৃক দংশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রায়

অষ্টাদশ জন রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। সেই সকল মতে পার্মাংগেনেট অব্ পটাস সলিউসন্ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। হাইপোডার্মিক্ রূপে পিচকারী প্রয়োগ করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

আশা।

সাগরের কুলে দুটী আঁখি খুলে
আছিরে বসিয়ে প্রাণে আশা বেঁধে
কত কলস্বিনী করি কল ধ্বনি
প্রাণ শঁপিয়ে হায়! আকুল কেঁদে॥
আকুল তরঙ্গ যেন ছাড়ি সঙ্গ
ডুবিছে অনন্ত সাগর তলে।
সুনীল আকাশে গ্রহতারা ভাষে
হাসিয়া চন্দ্রমা খেলিছে জলে॥
যাহার আশায় এ ভব ভেলায়
ভাষিয়ে ভাষিয়ে উধাও প্রাণ।
কইত এখন না আসে সেজন
কতযুগ গেল নাহিরে সন্ধান॥

কতকাল আর আশায় তাহার
যাপিব গুণিয়া সাগরের ঢেউ।
বল কলস্বিনি। মধুর নাদিনী
ভাষিয়ে এ পথে গিয়েছে কি কেউ?
বল কাদম্বিনি! প্রলয় কারিনী
স্বরগের পথ করেছে সে আলো!
বল সদাগতি! অকপট মতি
বিশ্বমাতা ক্রোড়ে সেত আছে ভাল?
যাও অশ্রুজল! সাগরের তল
যে অনন্ত স্রোতে ভেসে গেছে আশা
গিয়া তার পাশে নয়ন সকাশে
কাঁদিয়ে জানায়োমোর ভালবাসা॥

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ॥

পেটেন্ট ঔষধ।

গ্রীমন্ট সিরাপ্ বা সিরাপ্ অব্ হাইপোফস্ফাইট অব্ লাইম্। (প্রস্তুত প্রণালী, সরল ভৈষজ্য-তত্ত্বের ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) কার্মাইন্ দ্বারা রং করিয়া গ্রিমিল্ট সিরাপ্ বিক্রয় হয়। গ্রিমলট—সিরাপের ক্রিয়াদি ক্যালসিরাই হাইপোফাস্ফিসের ন্যায়। সিরাপ্ ক্যালসিরাই হাইপোফাস্ফিস্ সচরাচর ১ ড্রাম অর্থাৎ ৬০ ফোঁটা মাত্রায় সকালে ও সন্ধ্যার সময় প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি না করিলে পূর্ব্ববৎ উপকার পাওয়া যায় না। অল্প অল্প করিয়া ৪ ড্রাম পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে পারা যায়। সর্দ্দি, কাশিতে গ্রিমন্ট সিরাপ্ ব্যবহৃত হয়। কণ্ঠমূসন রোগে ইহা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার সম্ভব। কাশির উগ্রতা হ্রাস, নিশা ঘর্ম্ম নিবারণ এবং শরীরে বলাধান হয়।

আমাদের নিবেদন.কার্ত্তিকের সমালোচক অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হইবে।

প্রত্যেক সহযোগীর নিকটেই চিকিৎসক ও সমালোচক পূর্ব্বাপর প্রেরিত হইতেছে। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত সমালোচকের সমালোচনা

করেন নাই আশা করি এই সংখ্যা দৃষ্টে তাঁহারা বিনিময়েও কিঞ্চিৎ সমালোচনা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। বিক্রমপুর। লৌহজঙ্গ হইতে এই পত্রিকাখানি সুনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। অনেক নূতন সংবাদও ইহাতে থাকে। সম্প্রতি তত্রত্য কোন ডাক্তার জনৈক স্ত্রীলোককে কক্কুটের জুস্ ঔষধার্থে ব্যবহার করায়, তাহাকে "একঘরে" করা হইয়াছে। আমরা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখীত হইলাম যে, বিক্রমপুর বাসীগণ বিনাদোষে ১জন নীরিহ ব্যক্তিকে একঘরে করিয়াছেন। আশা করি "ঔষধার্থে সুরা পান কথাটা স্মরণ করিয়া বিক্রমপুর বাসী গণ স্ব স্ব ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক চিকিৎসক মহাশয়কে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করিবেন।

২। আমরা সন্তুষ্ট হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে ১৭ নং হরি মোহন বসুর লেনে একটী সার্ব্বজনিক বিবাহ সংস্থাপন ও পারিবারিক বৃত্তি ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর ১৩ জন মেম্বর ভাণ্ডার হইতে বিশেষ সাহার্য্য পাইয়াছেন, ক্রমশঃ এই ভাণ্ডারের উন্নতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

৩। এডুকেশন্ গেজেট্—হুগলী হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা খানি শিক্ষা, কৃষি, ও সাহিত্যাদি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ সহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ২। ১ টি প্রবন্ধ দেখিতে পাই কিন্তু তাহা বিশেষ যুক্তি ও শিক্ষা প্রদ নহে।

৪। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ। চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা খানি ক্রমোন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কর্ত্তৃক প্রণীত ও তৎ কর্ত্তৃক জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকার বহুল গ্রন্থালোচনা করিয়া যে, এই সারবান গ্রন্থখানী প্রণয়ণ করিয়াছেন এরূপ নহে—ইহাতে তাঁহার অনেক বহুদর্শীতার বিষয়ও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ ধাত্রী বিদ্যা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহা সাধারণের অনেকউপকারেআসিবে

১ম খণ্ড } কার্ত্তিক, ১৩০২ সাল। { ১০ম সংখ্যা

প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আর্য্য ভৈষজ্য তত্ত্ব। আদিম কালের জাতি মাত্রেই সহজ লভ্য পদার্থ ঔষধ রূপে নির্ব্বাচিত করিতেন, আর্য্যেরাও তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহারা জলকেই সর্ব্বপ্রথমে ঔষধ রূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা তরু লতার অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তরুলতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি বিস্তৃত ছিল—এক সুশ্রুতই ৭৫০ প্রকার বিভিন্ন জাতীয় তরুলতার গুণাবলী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা ঐ সকল তরুলতার গুণ কতক শুনিয়া, কতক বা স্বচক্ষে দেখিয়া নির্দ্ধারিত করিতেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "চিকিৎসকেরা ভেষজ তরুলতার গুণ অবগত হইবার জন্য, অত্যুন্নত শৈল শিখরে আরোহণ করিয়া, শৈলবাসীর সংস্পর্শে থাকিয়া, অথবা বনে বনে স্বয়ং ভেষজ তরু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং কাঠুরিয়া, শিকারী, রাখাল, প্রভৃতির নিকট অজ্ঞাত তরুলতা ও উপকারী ওষধির গুণ শিক্ষা করিয়া স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করিবেন"

তাঁহারা জীবজন্তুর দেহ হইতেও ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানিতেন এবং স্নায়বিক পীড়ায়, অস্থিভস্ম এবং মজ্জা হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

"আর্য্য ভৈষজ্যতত্ত্বে" ধাতব ঔষধেরও অভাব নাই। এল্‌ফিনষ্টোন্ বলেন যে, "জগতের মধ্যে আর্য্যরাই সর্ব্ব প্রথমে ঔষধের জন্য ধাতুর ব্যবহার করেন"।

আর্য্য রসায়ণ। আর্য্যদিগের "রসায়ণ" একটী বিভিন্ন শাস্ত্র বলিয়া কখনও আলোচিত হয় নাই। ইহা তখন ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্যই শিক্ষিত হইত। তাঁহারা নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, এই জগৎ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূতের সমষ্টি। এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এই পাঞ্চভৌতিক তত্ত্ব, "এরিষ্টটেলের দর্শন" নামে খ্যাত। কিন্তু এরিষ্টেটল, চারিটী মাত্র ভূতের বিষয় অবগত ছিলেন, অপর একটী তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল!

রস্কো এবং স্কার্লেমায়ের মতে প্রাচীন আর্য্যরাই সর্ব্বপ্রথম স্বুবর্ণ সংস্কারক এবং জগতের অন্যান্য প্রাচীনজাতি আর্য্যদিগের নিকট হইতে ইহা এবং অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যান্য জাতীয় ভাষায় সুবর্ণের যে সকল পর্য্যায় শব্দ আছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রতি শব্দের অর্থ, "জ্যোতি"। এই সুবর্ণের জ্যোতি দর্শনে আর্য্যেরাই সর্ব্ব প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলেন।

এলিফিনষ্টোন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, আর্য্যেরা সালফিউরিক এসিড্, নাইট্রিক এসিড্, অক্সাইড্ অব্ কপার্, অক্সাইড্ অব্ আয়রণ, অক্সাইড্ অব্ লেড্ ও জিন্‌ক্ (Zinc) সালফেট্ অব্ আয়রণ, সল্‌ফেট অব্ কপার্, সাল্‌ফেট্ অব্ মারকারি, সাল্‌ফেট্ অব্ এণ্টিমনি, সালফেট্ অব্ আর্সেনিক্; সল্‌ফাইড্ অব্ কপার্, সল্‌ফাইড্ অব্ জিন্‌ক্ (Zinc) সল্‌ফাইড্ অব্ আয়রণ্ এবং কারবনেট্ অব লেড্, কারবনেট্ অব্ আয়রণ প্রস্তুত করিতে জানিতেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমূহ অত্যাশ্চর্য্য রূপে প্রস্তুত করিতেন।

ধাতবজ্ঞান অনেকটা "রসায়ণ" বিদ্যার উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য প্রাচীন জাতি আর্য্যদিগের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। রস্কো এবং স্কার্লেমায়ের মতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আর্য্যদিগের নিকট খনি হইতে লৌহ বাহির করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যেমন লৌহকে সংস্কৃতে "অয়স", তেমনই ইংরাজীতে "আয়রণ" বলে। স্কাণ্ডিনেভিয়ায়, "ইসেন্" প্রভৃতি নাম করণের অতি সামিপ্য দেখা যায়। কুতুবের নিকট ৬০ ফিট দৈর্ঘ্য যে, প্রকাণ্ড লৌহময় স্তম্ভ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই জানা যায় যে, আর্য্যেরা লৌহ শিল্পে বিশেষ রূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভটী ভূমি হইতে ত্রিশ ফুট এবং ইহার উপরি ভাগ লৌহ পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত তাহাতে যে, সংস্কৃত শ্লোক সমূহ লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাহা চতুর্থ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রস্কো এবং স্কার্লেমার বলেন যে, এরূপ বৃহৎ একটা স্তম্ভ, বড় বড় ষ্টিম্-এঞ্জিনের দ্বারাও প্রস্তুত করা যায় কি না সন্দেহ আর্য্যেরা কি করিয়া হাতে পিটিয়া এই প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মাণে সন্দেহ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

লৌহ ব্যতীত আর্য্যেরাই সর্ব্ব প্রথমে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য ধাতু প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এইরূপ ধাতব জ্ঞান যে, রসায়ণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাহা একরূপ বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত সমূহ হইতে একরূপ প্রতিপন্ন করা যায় যে, আর্য্যেরাই রসায়ন শাস্ত্রের প্রণেতা। আর্য্যদিগের নিকট হইতে আরব এবং আরবদিগের নিকট হইতে অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতি ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের "রসায়ণ" শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বারুদের আবিষ্কারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পূর্ব্বে আর্য্যজাতিরা আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার জানিতেন কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব বিদ্ ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র এবং মান্দ্রাজের ডাঃ অরার্ট্ যে দুই খানি হস্ত লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, আর্য্যেরা পূর্ব্বে

আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার জানিতেন! সুতরাং তাঁহারা যে বারুদের প্রস্তুত ও প্রণালী ব্যবহার জানিতেন, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ।

কেহ কেহ বলেন যে, সামান্য ধাতুকে বহুমূল্য ধাতুরূপে পরিণত করিবার প্রথা (alchmy) সর্ব্বপ্রথমে ইজিপ্টে আবিষ্কৃত হয় কিন্তু আমরা বলিয়াছি যে, এই প্রথা বেদের সময় হইতে আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। "এরিষ্টেটলের" যে দর্শন শাস্ত্র গ্রীসের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য, তাহারও উৎপত্তি বৈদিক কালে আর্য্যদিগের প্রাচীন মত হইতে। ভারত হইতেই আর্য্যদিগের দার্শনিক এবং অন্যান্য মত গ্রীস এবং মিসরে বিস্তৃত হইয়াছিল।

একণে দেখা যাউক যে, "রসায়ণ" শাস্ত্র কোন জাতি সর্ব্ব প্রথমে প্রণয়ণ করিয়াছিল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আরবীয়েরাই এই শাস্ত্রের এবং অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রের প্রণেতা। কিন্তু তাঁহাদিগের এইরূপ ভ্রান্তমত অবলম্বনের কারণ এই যে, আরব্যেরাই ইউরোপের সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সময়ে জ্যোতিষ, পাটীগণিত, বীজগণিত, রসায়ন, এবং চিকিৎসা প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রের বিষয় একপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, "স্পেনস্থ এরেবিয়ন" বিদ্যালয় সমূহে ইউরোপের সর্ব্বাংশ হইতে বিস্তর ছাত্র অধ্যয়নার্থ সমবেত হইত এবং ইহাতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আরবেরাই সর্ব্ববিধ প্রাচীন শাস্ত্রের প্রণেতা, কিন্তু ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে আরবেরা সর্ব্ব প্রথমে আর্য্যদিগের নিকট হইতে গণিত এবং বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়াছিল সুতরাং আর্য্যেরাই সর্ব্ব প্রথম রসায়ন ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রণেতা।

অস্ত্র চিকিৎসা এবং ধন্বন্তরি। মহাদেবের পর, অস্ত্র চিকিৎসায় ধন্বন্তরির নাম দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, তিনি সমুদ্র মন্থন করিবার সময় অমৃত ভাণ্ড হস্তে উত্থিত হন এবং তাঁহারই প্রদত্ত অমৃত পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছিলেন।

ধন্বন্তরির এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, আর্য্য ও অনার্য্যের ভীষণ যুদ্ধের সময় ধন্বন্তরি আবির্ভূত হয়েন। তখন

আর্য্যেরা পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়া, ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন এবং অনার্য্যদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ হওয়ায় অস্ত্রচিকিৎসার উন্নতি হইতে লাগিল।

যখন আর্য্যেরা দেখিলেন যে, অনার্য্যদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক লোক নিহত এবং সুচিকিৎসার গুণে তাঁহাদের (আর্য্যদিগের) মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা অত্যল্প পরিমাণে হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা আপনাদিগকে অমর বলিতে লাগিলেন এবং সেই প্রতিভাশালী বিজ্ঞ চিকিৎসককে তাঁহাদিগের অমরত্বের কারণ প্রদান করিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য ধন্বন্তরি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা, তাঁহাকে অস্ত্র চিকিৎসার বিষয় উপদেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন, কেননা তাঁহারাও ভবিষ্যতে দেব (আর্য্য) গণের চিকিৎসক হইবার আশা করিতে ছিলেন এবং অস্ত্র চিকিৎসাই তখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া ছিল। তিনি ইহাতে সম্মত হইয়া তাঁহার জনৈক ছাত্র—সুশ্রুতের উপর তাঁহার উপদেশাবলী লিখিবার ভার প্রদান করেন। এইজন্য সুশ্রুতও তাঁহার অধ্যাপকের গুণোল্লেখ কালে বলিয়াছিলেন যে, "সল্য" অর্থাৎ অস্ত্র চিকিৎসা, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য চিকিৎসার ন্যায় ইহাতে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প এবং ইহা অতি বিশুদ্ধ চিকিৎসা-মানবগণের বিশেষ উপকারী এবং ইহা স্বর্গীয় বিদ্যা ও যশার্জ্জন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।"

সুশ্রুতের গ্রন্থাবলী ছয় ভাগে বিভক্তঃ—যথা, ১ম, অস্ত্র চিকিৎসা, ২য়, আময়িক বিধান অথবা নিদান, ৩য়, শরীরতত্ব, ৪র্থ, ঔষধ ব্যবহার বিদ্যা, ৫ম, বিষ বিজ্ঞান, এবং ৬ষ্ঠ, সাধারণ রোগের চিকিৎসা।

সুশ্রুতের গ্রন্থাবলী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অস্ত্রচিকিৎসকগণ কিরূপ নির্ভীক এবং অস্ত্র চিকিৎসায় কিরূপ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। হাণ্টার সাহেব বলেন "যে, আর্য্যেরা অঙ্গচ্ছেদ, অশ্মোচ্ছেদ, করিতে পারিতেন, তাঁহারা গর্ভাশয়ে এবং উদরাভ্যন্তরে অস্ত্রপ্রয়োগ ও অস্থিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা গর্ভাশয়স্থ ভ্রূণ বৃত্তান্ত,

অন্ত্রবৃদ্ধি, নালীঘাত অর্শরোগ, অস্থিভঙ্গাদি আরোগ্য করিতে পারিতেন এবং অতি আশ্চর্য্য উপায়ে চক্ষুর ছানি আরোগ্য করিতে পারিতেন।

আর্য্যদিগের অস্ত্র করিবার জন্য প্রায় ১২০ প্রকার অস্ত্র ছিল। ইহাতেই সহজে বুঝা যায় যে, তাঁহরা অস্ত্র চিকিৎসায় কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অস্ত্র সকল বিশুদ্ধ ইস্পাতে নির্ম্মিত হইত এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহারের জন্য তাঁহাদের চতুর্দ্দশ প্রকার বন্ধনীর (ব্যাণ্ডেজ্) ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন আর্য্য অস্ত্র চিকিৎসকেরা রক্তস্রাব রোধ আবিষ্কার এবং রক্ত মোক্ষণ করিতে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন।

আর্য্য স্বাস্থ্য রক্ষা। হিন্দু ভৈষজ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিত দিগের মতে বায়ু পিত্ত, কফের বিকৃতিই রোগোৎপত্তির কারণ এবং তন্মধ্যে যেটির আধিক্য দৃষ্ট হইত, তাঁহারা তদনুসারে রোগ বিভাগ করিতেন। যথা; পৈত্তিক, স্নায়বিক শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন রোগের আর একটী বিভাগ ছিল, যেমন পৈতৃক রোগ। কিন্তু চরকেরমতে রোগ চারিপ্রকার যথা;—

(১) দৈবপীড়া। অর্থাৎ কতকগুলি রোগ যাহা বিষ প্রভৃতি সেবন উৎপন্ন হয়।

(২) শারীরিক পীড়া। অর্থাৎ কতকগুলি পীড়া যাহা আহার এবং পান দোষে উৎপন্ন হয়।

(৩) মানসিক পীড়া। মনের বিকার হইতে যে পীড়া উৎপন্ন হয়।

(৪) ভৌতিক পীড়া। স্বাভাবিক অর্থাৎ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মৃত্যু।

এই সকল পীড়ার লক্ষণাদি অতি সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক রোগের কারণ কি? কেনই বা তাহা উৎপন্ন হয়, রোগের মূলিভূত কারণই বা কি তাহা সুন্দররূপে বর্ণীত হইয়াছে। রোগের প্রকৃতি, রোগীর মুখ এবং জিহ্বা দেখিয়া, নাড়ী এবং গাত্রের উত্তাপ এবং যন্ত্রণার বিবরণ ও তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কারণ জানিয়া তবে তাহার প্রতিকার করিবার ব্যবস্থা আছে।

আর্য্য চিকিৎসকেরা নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অনেক রোগ বুঝিতে পারিতেন। তাঁহাদের মতে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধ অবস্থা জানি-

বার জন্য চিকিৎসক, তিনটী অঙ্গুলির দ্বারা নাড়ী দেখিবেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীনশাস্ত্রে, প্রস্রাব দেখিয়া রোগের ঔষধ নির্ণয় করিবারও ব্যবস্থা ছিল। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে চিকিৎসকদিগকে স্বচক্ষে রোগ দেখিয়া, তাহার ঔষধ শিক্ষা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সুশ্রুত বলেন যে, "যে চিকিৎসক কেবল পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসার্থ আহূত হন, তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রস্থিত ভীরু সৈন্যের মত ভীত এবং চকিত হন। যে চিকিৎসক সম্পূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া সহসা চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি মানব জাতির হেয়, এবং রাজদণ্ড ভোগ করিবার সম্যক উপযুক্ত। আর যাঁহাদের মনুষ্য দেহ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, অথচ চিকিৎসা করিতে থাকেন, তাঁহারা এক প্রকার নরহন্তা। পক্ষান্তরে যিনি প্রকৃত শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগ দর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই কেবল দ্বিচক্র শকটের ন্যায় উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকেন।

আর্য্য চিকিৎসকগণের রোগ সম্বন্ধে ভাবী ফল তত্ত্বও একটু বিশেষ রকমের। তাঁহাদিগের মতে প্রত্যেক পীড়ার শেষাংশ নানাপ্রকার অবস্থার উপর নির্ভর করে। যেমন কোন তরুর পুষ্পের দ্বারা ভাবি ফলের কতকটা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ রোগের ভাবি অবস্থা বর্ত্তমান লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। তাঁহারা বহুদর্শিতার প্রভাবে কঠিন রোগের পরিণাম কিরূপ হইবে তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিতেন এবং আজও অনেক চিকিৎসক রোগ দেখিয়া তাহার পরিণাম অনেকটা বলিতে পারেন। তাঁহারা পীড়া শান্তির পূর্ব্বে, বিশেষ চিন্তা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচিত করিতেন, এবং রোগীর বাটী ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা করিতেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, যদিও এক্ষণে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর অনাবিষ্কৃত একটী বৈজ্ঞানিক বিষয়ও আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান হইতে শিক্ষা করিতে পারি না এবং চরক, সুশ্রুত ও ধন্বন্তরির আবিষ্কৃত ঔষধাবলী এক্ষণে পুনরায় আবিষ্কৃত এবং শরীর বিধান, রসায়ণ প্রভৃতি সকল বিষয়ই আজ কাল প্রভূত পরিমাণে উন্নতি সাধন

করিয়াছে। বলিয়া আস্ফালন করি তথাপি সেই প্রাচীনকালের অনন্তজ্ঞান রাশী অধ্যয়ন করিলে আমরা অনেক বিষয় জানিতে পারি একথা কে অস্বীকার করিবে।

সেই অতীতকালে—সেই বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, কুহেলিকাবৃত ম্লন তমসাচ্ছন্ন অতীতকালে, ভারতে চিকিৎসা শাস্ত্র বড় কম উন্নতি লাভ করে নাই; আমরা অতীত কালের কথা বলিতেছি না—যখন হিন্দু-চিকিৎসকেরা বোগ্‌দাদের রাজ-সভা অলঙ্কৃত করিতেন, যখন মাসিতোনাধিপতি তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসায় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন—আমরা তখনকার কথা বলিতেছি না। সেদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জাতিরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে বিস্তর ভেষজলতা শিক্ষা করিয়াছেন, এল্‌ফিলোষ্টন্ সাহেব বলেন "সে দিন পর্য্যন্ত আমরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে হাঁপানিকাশিতে ধুঁতুরা (Datura) র ধুম্র লইতে শিক্ষা করিয়াছি। কৃত্রিম নাসিকা প্রস্তুত করণ (Rhino plastic operation) বিদ্যার জন্য আজি ও জগৎ আর্য্যদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, এবং আর্য্যদিগের নিকট রোগ দর্শন ও তাহার প্রতিকার এখনও বিষয়ে যে আমরা অনেকটা সাহায্য পাইতে পারি তাহাই বলিতেছিলাম।

আর্য্যদিগের টীকা দিবার প্রণালী। আর্য্যদিগের টিকা দিবার প্রণালী ছিল কি না? তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। আমরা নিম্নে এসিয়াটিক জর্ণাল হইতে দুইটী রচনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।) কিন্তু তাহা টিকা দিবার প্রণালীর স্থায়িত্ব প্রমাণের পক্ষে প্রচুর নহে।

বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যদিগের মধ্যে পূর্ব্বে গো বীজের টিকা প্রদান করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্র রচয়িতাও ইহা সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, ইহা অতি পুরাতন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নবম প্রকার বসন্তের বিবরণ বর্ণীত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিন প্রকার দুরারোগ্য। গ্রন্থকার একস্থানে টিকা দিবার বিষয় লিখিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল;—

"ধেনুস্তন্য মাশুচি বা নরাণাঞ্চ মসিচিকা,
তাজ্জলম বাহুমূলাচ্চ শাস্ত্র তেন গৃহীতবান্।

বাহুমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তি কয়েরঃ চ,
তাজ্জলম রক্ত মিশিতেব ফোটকজ্বরঃ সম্ভবেৎ।"

• গরুর বাঁট হইতে কিম্বা মনুষ্যের স্কন্ধ হইতে কফোনি পর্য্যন্ত, কোন বসন্ত হইতে, ছুরিকা করিয়া বীজ গ্রহণ পূর্ব্বক, অস্ত্র দ্বারা স্কন্ধ হইতে কফোনির যে কোন স্থানে একটু বিদ্ধ করিয়া দিলে রক্ত বাহির হইবে, তার পর তৎস্থানে সেই বসন্তের বীজ প্রয়োগ করিলে জ্বর উৎপন্ন হইবে। তারপর স্থানান্তরে "সেই বীজ প্রয়োগে গাত্রে স্বাভাবিক বসন্তের ন্যায় বসন্ত উৎপন্ন হইবে কিন্তু জ্বর হইবে না সুতরাং কোন প্রকার ঔষধেরও আবশ্যক নাই এবং রোগীর ইচ্ছানুরূপ পথ্যও প্রদান করা যাইতে পারে। সেই সকল বসন্ত এক প্রকার তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে, এবং চতুর্দ্দিকে রক্তিম রেখার দ্বারা বেষ্টিত। একবার পূর্ব্বোক্তরূপ টিকা প্রদান করিলে, সমস্ত জীবনে আর বসন্ত হইবার ভয় নাই। টিকা দিবার পর কাহারও কাহারও ২।৩ দিন ধরিয়া অল্প জ্বর হয়, সঙ্গে সঙ্গে টীকাস্থান ফুলিয়া উঠে এবং বসন্তের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। সমস্ত উপসর্গ প্রায় ৩।৪ দিনের মধ্যেই অদৃশ্য হয়।" * কল্ডিভিরাম বন্ ২রা জানুয়ারি ১৮১৯। একটী উড়িষ্যাপত্রে অনুবাদিত হইয়াছে যে, ভিজিঙ্গ পট্টনের উত্তর এবং গাঞ্জামের দক্ষিণদেশ বাসী ব্রাহ্মণেরা কিরূপে "চিকাকোল" জেলার লোকদিগকে টিকা প্রদান করিতেন তদ্বিষয় এস্থলে বর্ণীত হইল।

থানিকটা তুলা ভাল বসন্ত রোগীর পুজে মিশ্রিত করা হইত। তারপর তাহার সহিত কিয়ৎপরিমাণে চাউল ভিজান হইত। চাউল নরম হইলে, সেই তুলা ৬।৭ গ্রেণ পরিমাণে "মাসেরির" সাহত মিশ্রিত করিয়া শুভ বৃহস্পতিবার এবং রবিবারে সমাগত ২।৪ শত লোকের হস্তে, অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহা প্রদান করত সেই ক্ষতস্থান পূর্ব্বোক্ত তুলার দ্বারা আবৃত করিতে হইত পরিশেষে তাহারা নদী কিম্বা পুষ্করিণীতে

* (Asiatic Journal, VOL. viii. July to December, 1819.)

স্নান করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে "টারবানি" অর্থাৎ ঘোলের সহিত অন্ন প্রদান করা হইত ও তৎপরে প্রতিদিন পাঁচবার করিয়া স্নান করিয়া তাহাদিগের তিনদিনের দিন জ্বর এবং গাত্রে বসন্তও দৃষ্ট হইত। তাহারা তখন "গ্রাসালু" অর্থাৎ ঘোলের সহিত মিশাইয়া যথেচ্ছা অন্ন আহার করিত, তারপর বসন্ত বেশ পক্ক হইলে, চারিদিন পরে তৈল ও হরিদ্রা মাখিয়া স্নান করিত। *

এই পত্র ভারতে ইংরাজী টিকা প্রচলনের বহুপূর্ব্বে চিকাকোল কালেক্টর এনড্রু স্কট্ কর্তৃক মান্দ্রাজে প্রেরিত হইয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইলেও উপরিউক্ত দুইটী ঘটনা দ্বারা আর্য্যদিগের ক দিবার প্রণালী ছিল কি না, তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজেরা আর্য্যদিগের টিকা দিবার প্রণালী সম্বন্ধে যদি কেহ কিছু অবগত থাকেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

জীবনতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কিন্তু এমিবা অপেক্ষা উচ্চতর জীবের কোষাবলীর জন্ম, বৃদ্ধি এবং উৎপাদন কার্য্য যে আরও শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয় তাহা স্থির। উচ্চতর জীবদেহে অনবরত ক্ষয় এবং পূরণ, ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। কাজেই এক শ্রেণীর প্রটোপ্লাসম্ গতায়ু হইতে না হইতেই, অপর শ্রেণীদ্বারা তাহাদের স্থান অধিকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং সেখানে প্রটোপ্লাসমের কার্য্য খুব শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইবারই কথা।

কিন্তু এই উৎপাদন কার্য্য ঠিক কিরূপে সম্পাদিত হয় এই বিষয় লইয়া বহুকাল হইতে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে।

---

* Asiatic Journal, xxiv July to December, 1827.

একটী কোষের যে, কোষান্তর হই'ত উৎপত্তি হয়, তাহা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে এই কার্য্য নিম্নলিখিত দুই উপায়ে সাধিত হয়।

(১) মুকুলপ্রণালী। একটী কোষ ক্রমে মুকুলিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই মুকুল ঝরিয়া আদিম কোষ হইতে পৃথক হয় কিন্তু এই প্রণালী উচ্চতর জীবে দেখা যায় না। সুতরাং ইহা তত প্রয়োজনীয় নহে।

(২) বিভাগ প্রণালী। এই প্রণালীর দ্বারা একটী কোষ ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া নূতন কোষাবলী সৃষ্টি করে। অনেক জীবের রক্ত কণিকা পরীক্ষা করিলে এই বিষয়ের উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথমে ভ্রূণাবস্থায় একটী কোষ থাকে। ক্রমে এই কোষ লম্বাকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং প্রটোপ্লাসমের মধ্য বিন্দু দুইভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়, ক্রমে একটী কোষ দুইটী স্বতন্ত্র কোষে পরিণত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য কোষাবলী জন্ম লাভ করিয়া এমিবার দেহনির্ম্মাণ করে।

প্রাণী হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লও, জড় পদার্থের সঙ্গে তাহার আর কোন প্রভেদ থাকিবে না। গতজীব প্রাণী ও বিনষ্ট প্রাণ তরু-লতার মধ্যে চেতনের কোন লক্ষণ দেখিতে পাও?

এই যে জীবনীশক্তি, যাহার প্রভাবে চেতন, চেতন নামের অধি-কারী, যাহার অদ্ভুত ক্ষমতাবলে এত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাও, তাহার প্রকৃতি ও অবস্থানের কথা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সেই অনন্ত নিয়ন্তার অননুভবনীয় শক্তি-পুঞ্জের এই অদ্ভুত বিকাশের কথা ভাবিতে ভাবিতে কে না আত্মহারা হইতে চায়?

জীবনের প্রকৃতি কি? এবং ইহা কোথায় অবস্থিত, এই কথা লইয়া বহুকাল হইতে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। কত লোকে যে কত প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন তার সংখ্যা নাই। পূজনীয় আর্য্য-ঋষিগণ ইহাকে বায়ু মধ্যে স্থান দিয়াছেন—তাঁহাদের মতে প্রাণ, বায়ু—ইহা শ্বাসযন্ত্রে অবস্থিত, তার পর সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দাও, কেহ বা ইহাকে গলদেশে, কেহ বা বক্ষদেশে, কেহ বা উদরদেশে স্থান দান করিয়াছেন। প্রাণটা যে একটা কোন স্পর্শোপযোগী কোমল

পদার্থ বিশেষ, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। "ডাইনেরা" আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণ লইয়া কচুর পাতের" মধ্যে রাখিয়া দেয়, আবার উপযুক্ত ওঝার হ'তে পড়িলে, যে তাহার তাড়না জন্য উহাকে পুনরায় শরীর সংলগ্ন করে—এমন বিশ্বাস আজও পল্লীগ্রামবাসী ইতর লোকের মধ্যে দেখা যায়।

কিন্তু যে বিজ্ঞান, আমাদের এত সাধের "চাঁদা মামাকে" জড়ত্বে পরিণত করিয়াছে,—পূজনীয় পবনদেবের দেবত্ব ঘুচাইয়াছে—সেই কঠোর বিজ্ঞান এই প্রিয়তম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতেও ত্রুটি করে নাই। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী—ইহার অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আমরা আপাততঃ তাহারি বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

কিন্তু উচ্চতর জীব সমূহের উৎপত্তি প্রণালী ঠিক এমিবার উৎপত্তির অনুরূপ নহে,—একটী এমিবা অপর এমিবা হইতে সমুৎপন্ন হয়, এবং ইহার জন্মদাতার সমস্ত গুণ লাভ করে। এইরূপে একটা এমিবা হইতে বহু সংখ্যক এমিবা জন্মলাভ করে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাকে পরিণতি বা পুষ্টি বলা যায় না। উচ্চতর জীবের পরিণতি ইহা হইতে স্বতন্ত্র। উচ্চতর জীবের ভ্রূণ ও কোষ একটী বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কোষ বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহে পরিণত হয় না, একটী কোষ ক্রমশঃ বহু সংখ্যক কোষ সৃষ্টি করিয়া আপন দেহবর্দ্ধিত করিতে থাকে।

ক্রমে এই কোষরাশী দুই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশঃ কোন শ্রেণী হইতে চর্ম্ম, কোন শ্রেণী হইতে মাংস এবং কোন শ্রেণী হইতে শিরারাশি সমুদ্ভূত হইয়া পূর্ণাকৃতি জীবদেহ বিনির্ম্মিত হয় ও তার পর পৃথক পৃথক অংশের পৃথক পৃথক কার্য্য বিভাগ আসে। কেহ বা স্পর্শেন্দ্রিয়, কেহ বা পরিপাক যন্ত্র আবার কেহ বা রক্তসঞ্চালন যন্ত্রে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে এইরূপ অপার সৌন্দর্য্যময় জীবদেহ বা নয়ন মনোহর পাদপশ্রেণী সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং জীবনের আদি উপাদান এই নয়নের অগোচর আণু-বীক্ষণিক প্রোটোপ্লাজম্। অতএব জীবনের যদি কোন আধার থাকে

তবে সেস্থান ইহারই প্রাপ্য। যাঁহারা ক্ষুদ্র বটবীজ হইতে প্রকাণ্ড ঘন প্লাবিত আতপতাপ নিবারক বটবৃক্ষের উৎপত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন, তাঁহারা এই আণুবীক্ষণিক প্রটোপ্লাসম্ হইতে এই অপূর্ব্ব কৌশলময় জীব বা উদ্ভিদ দেহের পরিণতি দেখিয়া তদপেক্ষাও বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার গুণে আমরা জীবনাধারের সন্ধান পাইয়াছি বটে, কিন্তু জীবন কি তাহা আজও বুঝিতে পারি নাই। জীবন একটা শক্তিবিশেষ সে বিষয়ে সন্দেহ করি না, কিন্তু এই অপূর্ব্ব শক্তি কেমন করিয়া জীবদেহে সঞ্চারিত হয়,—কি অনন্তময় কৌশল বলে সেই বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহার অপরিসীম শক্তির কণামাত্র প্রেরণ করিয়া জড়পদার্থ চেতনে পরিণত করেন, তাহা আজও বুঝা যায় নাই এবং কখনও যাইবে কি না জানি না। আমরা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল মানব! আমাদের কণা পরিমিত বিদ্যা—বুদ্ধি লইয়া সাহঙ্কারে সকল কথা বুঝিতে যাই—ভ্রমেও ভাবিয়া উঠিতে পারি না, সে অনন্তজ্ঞানের তুলনায়—আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার, পর্ব্বতের তুলনায় রেণুকণা অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর!! আমাদের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি দয়া করিয়া যাহা আমাদের বুঝাইয়া দেন, তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। যদি জীবনতত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরাই আবার ক্ষীণ দেহ ও ক্ষীণ বুদ্ধি লইয়া এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। বি, এ।

হিষ্টিরিয়া।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বৈরক্তি হেতুই হিষ্টিরিয়ার ফিট্ [হঠাৎ আক্রমণ] উপস্থিত হইতে পারে। সংসার চিন্তা, বৈষয়িক চিন্তা, শোক, কলহ, মতের অনৈক্য, ভালবাসা বা প্রেমের মধ্যে বিঘ্ন জন্মান ইত্যাদি নানা কারণে মানসিক উত্তেজনা হইয়া হিষ্টিরিয়ার ফিট হইয়া থাকে। আঘাতাদি লাগিয়াও এই জাতীয় নানা পীড়া

হয় ; উদরে আঘাত লাগিয়া গ্যাষ্ট্রেলজিয়া ; বাহুতে আঘাত লাগিয়া প্যারালিসিস বা স্প্যাজম্ হয় এবংসাধারণ কোন একটী পীড়া হইতে নানাবিধ পীড়া দেখা যায়। গলার অভ্যন্তরে সর্দ্দি হইয়া স্বরবন্ধ বা বাক্‌রোধ হইতে পারে। স্নায়ুর পীড়া বা স্থানচ্যুতি, ওভেরির (জরায়ু) প্রদাহাদি হইতে হিষ্টিরিয়া রোগ জন্মে ; কারণ অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, ঐ সমস্ত পীড়া আরোগ্য হওয়ায় হিষ্টিরিয়া আরোগ্য হইয়া গিয়াছে ; কিংবা কখন ইরিটেশন যুক্ত ওভেরির উপর অঙ্গুলি সঞ্চাপনে হিষ্টিরিয়ার ফিট্ ভাল হইয়া গিয়াছে।

লক্ষণতত্ত্ব—১। মনের আবেগ—এই রোগ উপস্থিত হইলে মনের যে কোন আবেগ হয় তাহা আর সংবরণ করিতে পারে না ; কারণ অনুতাপ, আহ্লাদ, হাস্য, ক্রন্দন ইত্যাদি যে কোন একটী মনে উপস্থিত হয় তখনই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে ; তাই এই রোগীর কখনও বা হাসি, কখন বা কান্না দেখা যায়। রোগী যাহা করে তাহা সে বুঝিতে পারে। আত্মীয় স্বজন সকলে তাহার সহানুভূতি করুক এই তাহার নিতান্ত ইচ্ছা। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তাহার এমন হয় যে, যে রোগের মূর্ত্তি তাহার শরীরে বা মনে দেখা দিয়াছে তাহা উৎকট গুরুতর ভাব ধারণ করে এবং বহুকাল থাকিয়া আত্মীয় স্বজনদিগকে ব্যতিব্যস্ত করে। এমন কি এতাদৃশ স্থলে চিকিৎসক পর্য্যন্ত, অনেক সময় গুরুতর রোগ স্বীকার না করিয়া পারেন না। সহানুভূতি প্রাপ্তির আশায় রোগিণী নাইট্রিক-এসিড্ বা কোন প্রকার উত্তেজক পদার্থ গাত্রে চুপে চুপে লাগাইয়া নানাবিধ চর্ম্ম রোগ দেখায় ; যোনি কিংবা গুহ্যদ্বার মধ্যে কিছু প্রবেশ করাইয়া দিয়া সেই স্থানের টিউমার দেখায় ; কোন রোগিণী বহু পরিমাণে অঙ্গার, কড়ি ও চুল ইত্যাদি বমন করে (অবশ্য পূর্ব্বে উহা সে খাইয়াছিল)। কুড়িগ্রামের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ দত্ত মহাশয়ের একটি রোগিণী বিষ্ঠা বমন করিত, পরে এক দিন দেখা গেল যে, ঐ রোগিণী নির্জ্জনে মল ত্যাগ করিয়া ঐ মল আহার করিতেছে। উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের আর একটী রোগিণী হঠাৎ কোথায়

চলিয়া গেল-তাহা গ্রামস্থ কোন লোকই জানিতে পারিল না। পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, রোগিণী ঘোরারণ্য মধ্যে একটী আম্রবৃক্ষের উপর বসিয়া আছে। হিষ্টিরিয়া রোগী মনের আবেগে কখন কে কি করিতে পারে তাহা বুঝা অসাধ্য।

২। বোধেন্দ্রিয় গত লক্ষণচয়—কখনও বোধ শক্তির আধিক্য হইয়া উঠে; শব্দ, আলোক কিম্বা স্পর্শ অসহ্য বোধ হয়; সামান্য স্পর্শে ভয়ানক কষ্টবোধ করে, সামান্য শব্দে নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়ে কিম্বা জানালা একটু খোলা থাকিলে তাহা তখনই বন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। মেরুদণ্ডে, ওভেরিঃস্থানে, স্তনের নিম্নভাগে এবং ব্রহ্মতালুতে সামান্য স্পর্শেও কষ্ট হয়। কখনও বা এই সমস্ত স্থানের কোন এক স্থান সজোরে চাপিয়া ধরিলে, বেদনা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তলপেট হইতে যেন একটী গোলার ন্যায় পদার্থ বক্ষের দিকে ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, ইহাকে "গ্লোবাস্ হিষ্টিরিকাস্" বলে। কখনও বা এতৎসঙ্গেই কনুভাল্‌শনের ফিট্ উপস্থিত হইতে দেখা যায়; এই সমস্ত বেদনাশীল স্থানকে "হিষ্টেরোজেনিক স্পট্" অর্থাৎ হিষ্টিরিয়াজনক ক্ষেত্র বলে। কখনও বা ঝিঁঝি ধরা, হুল ফোটা ইত্যাদি কষ্টানুভব হয়। কখনও বা কোন এক স্থানে বা অঙ্গের অর্দ্ধভাগে বোধ শক্তির লোপ হইয়া যায়, তাহাকে "হিষ্টেরিক্যাল্ হেমিয়্যানিস্থেসিয়া" বলে; ঐ স্থানে সূচিকা বিদ্ধ করিলেও সে তাহা জানিতে পারে না; এতৎসঙ্গে ঐ অঙ্গের দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ ইত্যাদি শক্তির গোলযোগ হইয়া পড়ে।

৩। গত্যুৎপাদকশক্তিগত লক্ষণচয়—(১) প্যারালিসিস্—হিষ্টিরিয়া জনিত বাক্‌রোধ অনেক সময় দেখা যায়, লেরিংসের মাংসপেশীচয়ের প্যারালিসিস্‌ই ইহার কারণ। এতাদৃশ কারণে বিপৎকর দমবন্ধ (শ্বাসরোধ) উপস্থিত হইতে পারে, চক্ষুর পাতা একটি কিম্বা দুইটী অসাড় ভাবে ঝুলিয়া পড়িতে পারে। প্যারাপ্লেজিয়া কিম্বা হেমিপ্লেজিয়া ঘটিতে পারে; এই সমস্ত রোগীতে প্যারালিসিস্ ঠিক্ সম্পূর্ণ রূপে হইতে দেখা যায় না; রোগী একদিগে কোন অঙ্গ

চালনা করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার বিপরীত দিকের মাংসপেশী সঙ্কোচিত হইতে থাকে। কোন হাতের প্যারালিসিস্ হইলে সেই হাত যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই হাত উঠান ভাবে থাকিবে— কিম্বা অল্প ভীবে খানিকটা নামিয়া থাকিবে, একেবারে ঝটিতি পড়িয়া যাইবে না—আধভাবে ঝুলিয়া থাকিবে। ইহাতে মাংসপেশীচয়ের ক্ষমতা নষ্ট হয় না, ইহাই প্রমাণ করে; যদি চতুরতা সহ গল্পাদি দ্বারা রোগীর মন বিষয়ান্তরে লিপ্ত করিতে পারা যায় তবে দেখিবে ঐ প্যারালিসিস্ যুক্ত অঙ্গ স্বাভাবিক ভাকে কার্য্যক্ষম রহিয়াছে। প্যারালিসিস্যুক্ত অঙ্গের মাংসপেশীনিচয় স্বাভাবিক ভাবে পরিপুষ্ট বলিয়া বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কথনও শুষ্ক বলিয়া বোধ হয় না। এই রোগের প্যারাপ্লেজিয়াতে রোগীণী বিছানায় শুইয়া কর সঞ্চালন করিতে পারে, কিন্তু দণ্ডায়মান হইতে পারে না; এই রোগে মল মূত্র কখনই অসাড়ে হয় না। হেমিপ্লিজিয়া হইলে, মুখমণ্ডল এবং জিহ্বার মাংসপেশীর ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে কিন্তু এই জাতীয় প্যারালিসিসের সঙ্গে এনিস্থেসিয়া দৃষ্টীগোচর হয়।

টনিক্ কনট্রাকশন অর্থাৎ বিরতি-বিহীন আড়ষ্টাবস্থা। এতাদৃশ আড়ষ্টাবস্থা সহ পর্য্যায়ক্রমে শিথিলাবস্থা হয় না, তবে সঙ্কুচিত হইয়া যে পর্য্যন্ত থাকিবার সম্ভব সে পর্য্যন্ত থাকিয়া, পরে স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন হয়, ইহাকে টনিক্ কনট্রাক্শন বলা যায়। হিষ্টিরিয়া ফিটের পর মানসিক উত্তেজনা বা আঘাত লাগিয়া ওএতাদৃশ কনট্রাক্শন উপস্থিত হয়। সম্মুখ বাহুটি কনুই গ্রন্থির উপর আড়ষ্ট হইয়া বক্ষঃপার্শ্বে সংলগ্ন থাকে এবং পদদ্বয় আড়ষ্ট হইয়া প্রসারিতাবস্থায় থাকে। বল প্রয়োগ করিয়া এই আড়ষ্টাবস্থা দূর করা কঠিন, বরং বল প্রয়োগে অধিকতর আড়ষ্ট হইয়া উঠে। নিদ্রাতে এই আড়ষ্টাবস্থা দূর হয় না। তবে ক্লোরোফরম্ প্রয়োগে সম্পূর্ণ অচৈতন্যাবস্থা হইলে এই আড়ষ্টাবস্থা শিথিল হইতে পারে। উভয়দিকের অঙ্গে এইআড়ষ্টতা একত্রে ও এক সময়ে দৃষ্ট হয় না। দন্তমাঢ়ী আড়ষ্ট হইয়া মাঢ়ীতে-মাঢ়ীতে লাগিয়া থাকাকে "ট্রিস্মাস্ বা হনুস্তম্ভ" বলে,

ইহাতে মুখ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের ধামরাই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, শ্রদ্ধাস্পদ ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শ্যালক * * * * মহাশয়ের কন্যার এই হিষ্টিরিয়া জনিত ট্রিস্মাস্ হইয়াছিল; তাহাতে ব্যাটারী আদি নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া কোন ফল হয় নাই; এই রোগিণীর কথা, পশ্চাৎ চিকিৎসার সময় সবিস্তার উল্লিখিত হইবে। এই সমস্ত আড়ষ্টাবস্থা বহুদিন—বহুমাস অথবা বহুবৎসরাবধি থাকিয়া পরে হঠাৎ আপনা হইতে শিথিল হইয়া আরোগ্য হইয়া যায় কিংবা ঔষধাদি প্রয়োগেও ভাল হইয়া থাকে।

ক্লনিক্ কন্ট্রাক্শন্ অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে আড়ষ্ট এবং শিথিলাবস্থা—ইহাতে হস্ত পদাদি কম্পিত হয়; বাহু কিম্বা গ্রীবাদি পর্য্যায়ক্রমে আড়ষ্ট এবং শিথিল ও অঙ্গাদি কোরিয়া রোগের মত সঞ্চালিত হইতে থাকে। ইহাকে অনেক সময় "হিষ্টেরিকেল কোরিয়া" বলে।

৪। হিষ্টেরিকেল্ ফিট্—ইহা সাধারণতঃ মানসিক উত্তেজনা হেতুই উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগিণীর বোধ হয়; যেন তলপেট হইতে একটা গোলা, গলার দিকে উঠিতেছে, এবং তাহাতে যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে; (ইহাকে গ্লোবাস হিষ্টেরিকস্ বলে) এতৎসহ মাথাঘোরা, হৃৎপিণ্ডের প্যাল্পিটেশন্ বা ধড়ফড়ী, উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন কিম্বা অট্টহাস্য করিয়া রোগিণী ভূমিতে কিম্বা যাহার উপর থাকে তাহার উপরই পড়িয়া যায় এবং কন্ভাল্শন্ আরম্ভ হয়।

ক্রমশঃ।

ডাক্তার শ্রীচন্দ্রশেখর কালী। এল, এম, এস।

মনুষ্য ও মনুষ্যত্ব।

২১৪ পৃষ্ঠার পর।

বিশ্বেশ্বর বিশ্বরাজ্য সংস্থাপন করিতে, অভিনব পদার্থের অভিনব বৈচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। বৃক্ষ লতাদি স্থাবরাত্মক সৃষ্টি বিধানে বিধাতা কেবল স্বীয় সচ্ছক্তির কণাংশমাত্র প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; কিন্তু জীবনিকর সৃষ্টি করিতে আরও একটু কারুকার্য্য দেখাইলেন;—সচ্ছক্তির সঙ্গে সঙ্গে অণুপরিমাণে চৈতন্য প্রদান করিয়া এক অভিনব যুগান্তর ঘটাইয়াছেন। (এই স্থানে দর্শনকারদিগের মত বিভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে)। কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "স্থাবর পদার্থেও চিচ্ছক্তি বিদ্যমান আছে, তবে জঙ্গমপদার্থের ন্যায় বিস্পষ্টভাবে না থাকিয়া বিলীনভাবে অভ্যন্তরে লীন রহিয়াছে"; সেই জন্যই বৃক্ষাদিতে চিতের কার্য্য পরিদৃষ্ট হয় না। যিনি যাহাই প্রতিপাদন করুন্ না কেন, পরিণামে কিন্তু সেই একই সিদ্ধান্ত—কীটাণু নিচয়ই চিচ্ছক্তির প্রথমাবির্ভাবে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইয়াছে এবং কীটাণু হইতে যতই উৎকৃষ্ট জীব সৃষ্ট হইল চিতের ততই সুস্পষ্ট বিকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে জীব মানব আকারে পর্য্যবসিত হইলে চৈতন্যের সম্যক্ বিকাশ সংসাধিত হইল। (কিন্তু মনুষ্যের চৈতন্যও নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য নহে, উহাও জীবাত্মক বলিয়া জীবচৈতন্য বা প্রকৃত চৈতন্যআখ্যায় আখ্যায়িত করা যায়।

লীলাকুশল ভগবানের এ সমস্তই লীলাঙ্গ, অভিনব পদার্থে তাঁহার পরম প্রীতি; ঐকান্তিকতা সহকারে জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শিল্পচতুর এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড শিল্পে, কোন দুই পদার্থই সমভাবান্বিত করেন নাই, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থেই বিস্পষ্ট বৈচিত্র বিরাজ করিতেছে।

কীট পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে উৎকৃষ্ট মনুষ্য পর্য্যন্ত যাবতীয় চেতন পদার্থে একমাত্র চৈতন্য প্রদান করিয়া, তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই;

জীবহৃদয়ে "আহার-নিদ্রা-ভয় ও মৈথুন" এই সামান্য বৃত্তি চতুষ্টয়ের অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন। সামান্য ইতর প্রাণীর ন্যায় মনুষ্য আদৌ এই পঞ্চ লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত ; কিন্তু বৃত্তি চতুষ্টয় সঞ্চালন কার্য্যে বিশেষ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট জীববৃন্দ হইতে মানবের উৎকৃষ্ট সাধন বিধায়ে তিনি মানবহৃদয়ে "ধৃতি ক্ষমাদি" আরও দশটী অসামান্য উচ্চবৃত্তির বীজ বপন করিয়াছেন ; কিন্তু সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উষাকালে সত্বাদি গুণ-বিকাশ-তারতম্যোৎপন্ন মানবহৃদয়, সত্বাদিগুণ বৈলক্ষণ্যে সমভাবে উর্ব্বরাশক্তিসম্পন্ন নহে, সুতরাং সকলের হৃদয়ে উক্ত বীজ সমভাবে, সমতেজে, অঙ্কুরিত বা পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্টাবয়ব হইতে পারে না ; এতাদৃশ হৃদয়ও অনেক আছে যাহাতে ঐ বীজ আদৌ অঙ্কুরিত হয় না, প্রত্যুত উৎপাদিকাশক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্ব জিজ্ঞাসু এই মাত্র পর্য্যালোচন, করিলেই বুঝিতে পারেন যে, যখন যাবতীয় মানব হৃদয়েই উচ্চবৃত্তি, দর্শকের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি জন্মে না (যে বৃত্তি দশকই মনুষ্যের একমাত্র পরিচায়ক) তখন কেবল আকৃতিগত বাহ্য লক্ষণে সমলক্ষণাক্রান্ত হইলেও, সকলেই মনুষ্যবাচ্য হইতে পারে না। মনুষ্যকে প্রকৃত মনুষ্য হইতে হইলে, আভ্যন্তরীণ লক্ষণ নিচয়ের সর্ব্বথা পরিপোষণ করিতে হয়। এই বৃত্তি দশকের যথাযথ অনুশীলনই মনুষ্যের, মনুষ্য-নাম-যোগ্যতালাভের অদ্বিতীয় উপায়, এই দশটীকে শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মলক্ষণ অভিধায়ে অভিহিত করিয়াছেন, উহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যধর্ম্ম সম্যক্-সংরক্ষিত হইয়া থাকে।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। বি, এ।

নূতন ঔষধ।

(TRIONAL) ট্রিওন্যাল।

জলে অল্প দ্রব হয়— ক্রিয়া— নিদ্রাকারক। ক্লোরাল্ এবং সলকোনাল নামক ঔষধঅপেক্ষা উপকারী। ইহা সেবনে কখন কখন (Giddiness) হইতে দেখা গিয়াছে। মাত্রা।— ১৫ গ্রেণ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেন ৪৫ কিম্বা ৬০ গ্রেণের বেশী না হয়।

পূর্ব্ববারের ন্যায় এই সংখ্যায় সমালোচকের গ্রাহক বর্গকে এক ফর্ম্মা "ভৈষজ্য তত্ত্ব" উপহার প্রদত্ত হইল। বারান্তর হইতে গ্রাহক বর্গকে "ওলাউঠা ও বসন্ত চিকিৎসা" পুস্তক উপহার প্রদত্ত হইবে।

কে তুমি ?

শারদ পূর্ণিমা একি ? কে তুমি ললনে
হৃদয় কন্দরে ঢালি বিমল কিরণ-
শতধারে উজলিছ সুধা বরিষণে।
বন তুলসীর বাস বিতরি পবন
বিকাসিয়ে স্তরে স্তরে কুসুম কলিকা
বিভোর করেছে প্রাণ, এ বুঝি তোমারি
কর সঞ্চালন সখি ! শান্তি প্রদায়িকা।
মাধব মঞ্জুল স্নিগ্ধ শ্যামল মাধুরী
নিভৃত হৃদয়কক্ষে তোমারি রচনা !
তুমি কি গাহিছ সখি বসি কুঞ্জদ্বারে
মধুর রাগিণী মরি ঝঙ্কারিয়ে বীণা ?
সঙ্গীত লহরী শান্ত নিশীথ অম্বরে
ছুটিছে ; দিগন্তে ভাসে ম্লান প্রতিধ্বনি।
প্রেমময়ি ! তুমি কিগো জীবন সঙ্গিনী ?
মোহিনী প্রতিমা ফুল্ল আনন বিমল
ফলিত রজত স্বচ্ছ মানস সরসে
চিকণ চিকুর চারু অলক চঞ্চল
জলদ সজ্জিত নভে সুধাংশু বিকাশে।
ললিত অধরে স্থির সৌদামিনী তায় ;
কুঞ্চিত কপোল দ্বয় গোলাপ যুগল
আধ বিকসিত যেন গোলাপী উষায়।
আধ নিমীলিত নীল নয়ন কমল
সুখ স্বপ্ন স্মৃতিরাগে রঞ্জিত অঞ্জন।
সুকুমার ভুজবল্লী ; অঞ্চল ঝলসে
বামে হেমকান্তি ! একি প্রেম প্রস্রবণ
ছুটাও——মানস স্নিগ্ধ মৃদুল পরশে
স্বর্গীয় প্রেমের ধারা শান্তি সুখবারি।
তুমি কি এ জীবনের চির সহচরী ?

শ্রীরসময় লাহা।

পেটেণ্ট্ ঔষধ।

ডাক্তার রায়ের কৃত ক্লোরোডাইন্।

এক্সট্রা (Extra) এবং স্কয়্যার ও অন্যান্য কতিপয় মেটিরিয়া মেডিকায়লাইকর ক্লোরোমর্ফি” নামক ঔষধকে ক্লোরোডাইন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। “ক্লোরোডাইন্’ একটি পেটেণ্ট ঔষধ। ভৈষজ্য তত্ত্বে বর্ণিত টিংচর ক্লোরোফমাই এট্ মার্ফিনি ও ক্লোরোডাইনের সমতুল্য ঔষধ। আমরা স্বয়ং উক্ত কএকটি ঔষধ হইতে নির্ব্বাচন করিয়া যে ক্লোরোডাইন্ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তদ্দারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হই, এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমরা পরীক্ষার্থ বিলাতী ও দেশী এই দুইটি ঔষধের প্রভেদ পরীক্ষার্থে ২ শিশি বিলাতি * “ক্লোরোডাইন্” ক্রয় করিয়া আনিয়া প্রথম মাত্রায় বিলাতী ও পর মাত্রায় মৎকৃত ক্লোরোডাইন্ বিবিধ প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবহার করিয়া তুল্য উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম—এক্ষণে মৎকৃত ক্লোরাডাইনের প্রস্তুত প্রণালী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, আশা করি প্রত্যক্ষ ফল প্রার্থীগণ ইহা প্রস্তুত করিয়া একবার মাত্র ব্যবহার করিবেন।

ক্লোরোডাইনের ক্রিয়া—ঘর্ম্মকারক, বেদনা নিবারক, নিদ্রাকারক, অবসাদক, সঙ্কোচক, আক্ষেপ ও বেদনা নিবারক ইত্যাদি।

মাত্রা=৫ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত। ২।৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা বিধেয়। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, শীঘ্র উপকার হইবে বলিয়া, “সওদা করিয়া ফাউ লওয়ার ন্যায়” একবারে ২০ ফোঁটার জায়গায় ৪০ ফোঁটা; অথবা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহারের স্থলে, আধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ ইহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইবার সম্ভব। কারণ “ক্লোরোডাইনের” উপাদানের অধিকাংশ দ্রব্যই “বিষ” সুতরাং সকলে বিশেষ সতর্কের সহিত ইহা সেবন করিবেন।

ব্যবহার———কঞ্জমশন্; এজমা, (শ্বাসকাস) ব্রঙ্কাইটিস্ (শ্বাসনালী প্রদাহ) স্নায়ুশূল, অনিদ্রা, উদরাময়, ও বিসূচিকা রোগের প্রথমাবস্থায় ক্লোরোডাইন প্রয়োগ করা যায়। উদরাময় ও বিসূচিকা রোগে কর্পূরের জলের সহিত, ক্লোরোডাইন প্রয়োগ করিলে অধিক ফল দর্শে। এগিউ বা কম্পজ্বরে সার উইলিয়ম্ মুর ইহা ব্যবস্থা দেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সর্দ্দি রোগেও নাকি ইহা উপকার করে।

* ১ শিশি বিখ্যাত ফলিস্, ব্রাউন্ ও ১ শিশি কিম্যান্স্ কৃত।

বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি ক্লরোফর্ম, ১ আউন্স; টিংচর্ ক্যাপসিসাই, ১ আউন্স; শোধিত স্থিরা, ১ আউন্স; একষ্ট্রাক্ট্ ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (গাঁজার সার) ২ ড্রাম; এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ লিকরিস্ লিকুইড, ১½ আউন্স; হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ মর্ফিয়া, ৪০ গ্রেণ; সল্‌ফেট্ অব্ এট্রোপিয়া, ১ গ্রেণ; ইথর্ (বা স্পিরিট্ ইথর্ সলফ, ১ আউন্স; পিপারমিণ্ট অয়েল, ৮ বিন্দু; ডাইলিউটেড্ হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্, ১৬০ বিন্দু; ট্রাগাকান্থ্ চূর্ণ, ২০ গ্রেণ; সিরাপ জিঞ্জর; হইলে ভাল হয়) ১০ আউন্স পূর্ণার্থে যথা প্রয়োজন।

প্রস্তুত প্রণালী—মর্ফিয়া ও এট্রোপিয়া একটি কাঁচের খলে উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া, পরে ট্রাগাকান্থ চূর্ণে, কিঞ্চিৎ (২০ বিন্দু) ডিষ্টিল অর্থাৎ পরিশ্রুত জল মিশ্রিত করিয়া, উহার সহিত যষ্টিমধুর তরল সার এবং মর্ফিয়া ও এট্রোপিয়া চূর্ণ ৫ মিনিট কাল মাড়িয়া, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া একটা বোতল মধ্যে রাখিবে, অনন্তর অত্যল্প (৪ ড্রাম সুরায়, গাঁজার সার দ্রব করিয়া, বক্রি সুরায় পিপারমিণ্ট তৈল দ্রবান্তর ক্লোরোফম্ ও লঙ্কামরিচের অরিষ্ট একত্র মিশ্রিত করিয়া বোতলস্থ মর্ফিয়া ও এট্রোপিয়া দ্রবের সহিত ধীরে ধীরে মিশ্রিতান্তে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশাইয়া লইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। ক্লোরোডাইন্ প্রস্তুত করিয়া কাঁচের ছিপিযুক্ত শিশিতে নাতিশীতোষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিলে, বহুকাল পর্য্যন্ত উহা নষ্ট হয় না। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে শিশিটি একবার উত্তমরূপে নাড়িয়া লইবে; কারণ তাহা হইলে ক্লোরোডাইনস্থ সমুদায় দ্রব্য উত্তম মিশ্রিত হইয়া যাইবে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১ প্রভা। মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনা। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও নিলা হইতে শ্রীঅধরচন্দ্র মিদ্যা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৲ একটাকা মাত্র। আজ কাল মাসিক পত্রিকার নাম শুনিলেই আমাদের আতঙ্ক হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবাদপত্র প্লাবিত দেশে, "প্রভা" কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার ক্ষুদ্র প্রাণ যে, ভীষণ জীবনসংগ্রামের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না। আমরা "জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের"

সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে নিম্ন লিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। "হিন্দুর বিবাহ সংস্কার" নামক একটী ক্রমাগত প্রবন্ধের অংশ মাত্র। "কাঙ্গাল" একটী চলন সই কবিতা। "কর্ত্তব্যের আবাহন", একটী চিন্তাশীল সুললিত প্রবন্ধ। "শিক্ষিত সতীশ বাবুর পরিণাম" — পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিঘূর্ণিত মস্তক একটী উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গীয় যুবকের নক্সা। "অতীতের ভালবাসা" পদ্যটীর আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এতদ্ভিন্ন আর উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ নাই। যাহা হউক "প্রভা" পড়িয়া আমরা মোটের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। আশা করি ভবিষ্যতে ইহা সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিবে। ইহার সুনিয়মিত প্রকাশ প্রার্থনীয়।

(২) ধরণী। মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনা। শ্রীইন্দ্রনারয়ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং শাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মলুটী রাজবাটী হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১।০। ইহাতে অনেকগুলিই সুললিত প্রবন্ধ। "অভিজ্ঞান সকুন্তলের" ক্রমাগত অংশগুলি সুন্দর লিখিত হইতেছে। লেখক, শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,। "শাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের অভাব ইত্যাদির কথা" সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত। বেশ লিখিত হইতেছে, আমরা ইহা আর একটু বেশী বেশী প্রার্থনা করি। ধরনীর "ভাদ্র" সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। ইহা সম্যক প্রকারে সাহিত্য সংসারে উন্নতি লাভ করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক বাসনা — সম্পাদক কতকগুলি অভদ্র গ্রাহকের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেশে ইহা নূতন নহে বাস্তবিক ইহ দেশের সবিশেষ লজ্জার কথা।

(৩)। ৫। ১ নং কৈলাস দাসের ষ্ট্রীটস্থ দেশ বিখ্যাত কালি ও সৌগন্ধি বিক্রেতা মেঃ পি, এম. বাকচি কৃত "সুবাসিনী তৈল ও এসেন্স অব্ হ্যাণ্ডকারচিফ্" প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। মেঃ পি, এম, বাকচির কৃত সমুদায় দ্রব্যই যে, অত্যুৎকৃষ্ট "সুবর্ণ পদক ও বহুল প্রশংসা পত্রই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত।" "সুবাসিনী তৈলের" সৌগন্ধ ছাড়া শিরঃপীড়ারও উপকার হয়। "এসেন্স অব্ হ্যাংকার চিফ্". বিলাতী এসেন্সের সঙ্গে টেক্কাদিতে পারিবে, কেননা ইহার মূল্য অতি অল্প, অথচ গন্ধে বিলাতী অপেক্ষা, নিকৃষ্ট নহে। যাঁহারা এসেন্স ব্যবহার করেন তাঁহারা ঘরের কড়ি পরকে না দিয়া, একবার না হয় মেঃ বাকচির কৃত এসেন্স ব্যবহার করিয়া দেখুন।

সমালোচক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী।

প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হইবে কিন্তু প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত বা প্রবন্ধের মতামতের জন্য দায়ি নহি। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত পত্রিকা প্রেরিত হয় না। কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য ষ্ট্যাম্প বা রিপ্লাই কার্ড আবশ্যক—বেয়ারিং পত্রাদি লইনা। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম প্রতি-ছত্র ।০ আনা, প্রতি পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা, ৪র্থবার হইতে অর্দ্ধমূল্য।

চিকিৎসক ও সমালোচক।

মাসিক পত্র

১ম খণ্ড } অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩০২ { ১১শ, ১২শ সংখ্যা

প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রচীনকালে আর্য্যেরা চিকিৎসকদিগের গুণাগুণ-সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন *। তাঁহারা "হাতুড়ে" চিকিৎসকদিগকে কিরূপ ঘৃণা করিতেন তাহা হইতেই বেশ বুঝা যায়। আর্য্য আয়ুর্বিজ্ঞান, ভেষজ সংগ্রহে যে নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহাদিগকে

---

* ভেষজং কেবলং কর্ত্তুং যো জানাতি ন চাময়ম্।
বৈদ্য কর্ম্ম স চেৎ কুর্য্যাদ্ বধমর্হতি রাজতঃ॥
যস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞো ভেষজে যম বিচক্ষণঃ।
তং বৈদ্যং প্রাপ্য রোগী স্যাদ্ যথা নৌকা যকং বিনা॥
যস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়া স্বকুশলো ভিষক।
স মুহ্যত্যাতুরং প্রাপ্য-প্রাপ্য ভীরুরিবাহবম্
যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাচ্ছাস্ত্র বহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাংনাপ্নোতি বধ- চার্হতি রাজতঃ॥
ছেদ্যাদিষনভিজ্ঞো য স্নেহাদিষু ত কর্ম্মসু।
সনিহন্তি জনং লোভাৎ কুবৈদ্যানৃপ দোষতঃ॥
যস্তু উভয়জ্ঞো মতিমান স সমর্থোঽর্থ সাধনে।
আহার কর্ম্ম নির্ব্বোঢ়ুং দ্বিচক্রঃ স্যন্দনো যথা॥

* Sir william O' shau Ghacssy, M. D, F, R, S. &c.

শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। পৃথিবীতে এমন দ্রব্য নাই, যাহা হইতে তাঁহারা ঔষধ সংগ্রহ করেন নাই; যে কোন চিকিৎসা, আজ বাহ্যসৌন্দর্য্য বিস্তার করুক না কেন, আর্য্য "আয়ুর্ব্বেদ" যে, সকলের মূলভিত্তি, তাহা কোনমতে অস্বীকার করা যায় না। আর্য্য মুনিগণ. নিষ্ঠাবান এবং পরম শুচি প্রিয় হইলেও বৈজ্ঞানিক উদারতায় প্রাণ্যঙ্গ, রেতঃ, মূত্র, বিষ্ঠাদি হইতে ঔষধ সংগ্রহ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহারা "এলোপ্যাথির" ন্যায়, হোমিওপ্যাথি মতের দ্বেষ্টা ছিলেন না এবং হোমিওপ্যাথির ন্যায় এলোপ্যাথি মতের প্রতিও ঘৃণা করিতেন না। তাঁহারা চিকিৎসার প্রধান সূত্রে উভয় মতই সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন:—

"হেতুর্ব্যাধি বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থ কারিণাম্,

ঔষধান্ন বিহারাণামুপযোগ সুখাবহং, বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ"—

"কারণের বিপরীতই ব্যাধির বিপরীত, কারণও ব্যাধির বিপরীত, অথবা কারণের ব্যাধির, বা কারণও ব্যাধির বিপরীত না হইয়া অর্থাৎ সমধর্ম্মী হইয়াও বিপরীত কার্য্যকারী যে সুখাবহ উপযোগ, তাহারই নাম ব্যাধির উপশয়"। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, সেই প্রাচীন কালে আর্য্যেরা দ্রব্যগুণের বিষয়ে যেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, অন্য কোন জাতিই তত নহে। তাঁহাদের ভেষজ তরুলতা, প্রাণীদেহ, ধাতু হইতে এবং রসায়ণিক সংযোগে বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী দেখিলে, তাঁহারা ভৈষজ্য-তত্ত্বে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা সম্যক অনুভব করা যাইতে পারে এবং তাঁহাদের পারদাদি অন্যান্য ধাতুর শোধন প্রণালী দেখিলে তাঁহারা রসায়ণ শাস্ত্রে যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না।

অস্ত্র চিকিৎসা এবং ধন্বন্তরী। (২)।—আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আর্য্য অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে মোটামুটি একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু তাহা এত সংক্ষিপ্ত যে, তাঁহার দ্বারা তাঁহাদিগের অসাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা এবং তাহার সুন্দর প্রণালী কিছুমাত্র আয়ত্ত করা যায় না। অতএব বাধ্য হইয়া আমাদের পুনরায় এই প্রবন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, আর্য্যেরা কি প্রকারের অস্ত্র ব্যবহার করিতেন, পরে আমরা তাঁহাদের সুন্দর অস্ত্র প্রয়োগ বিধি দেখিব। আর্য্যেরা প্রায় তিনশত প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিতেন—তন্মধ্যে, মণ্ডলাগ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, মুদ্রিকা ও উৎপল পত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সবিশেষ প্রয়োজনীয়। তাঁহাদের মতে, শস্ত্র সকল উৎকৃষ্ট লৌহনির্ম্মিত, অতিশয় তীক্ষ্ণ, সুরূপ সম্পন্ন, সুগ্রহনীয়, মসৃণ ও সুচারু-মুখাগ্রযুক্ত হওয়া সবিশেষ প্রয়োজনীয়। বক্রতা, কুণ্ঠতা, খণ্ডত্ব, খরধার বিশিষ্টতা, অতিস্থূলতা ও অতিসূক্ষ্মতা, অধিকদীর্ঘতা ও অতিহ্রস্বতা অস্ত্রের দোষ রূপে পরিগণিত। এইসকল দোষহীন শস্ত্র ব্যবহারোপযোগী। তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট শস্ত্র দূষনীয় হইলেও, করপত্র অর্থাৎ করাতের পক্ষে উহা দোষ বলিয়া গণ্য নহে। করপত্রের (করাতের) দ্বারা অস্থিছেদন করা যায়, সুতরাং উহা তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট হওয়াই আবশ্যক। শস্ত্রে ক্ষার, জল ও তৈল এই তিন দ্রব্য মাখাইতে হয়। শরশল্য ও অস্থিছেদন বিষয়ে ক্ষার; মাংসের ছেদন, ভেদন, ও পাটন বিষয়ে জল এবং শিরা বাধন ও স্নায়ুছেদন বিষয়ে তৈল ম্রক্ষণ কর্ত্তব্য। শস্ত্রে শান দিবার জন্য মাষ-কলাইএর ন্যায় বর্ণযুক্ত মসৃণ শিলা ও ধারা সংস্থাপনের নিমিত্ত শাল্মলী-ফলক ব্যবহৃত হয়। উত্তমরূপে শাণিত, রোমছেদি, সুসংস্থিত ও যথাযথ গৃহীত শস্ত্র কর্ম্মোপযোগী। শস্ত্রক্রিয়া তিন প্রকার। যথা—পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধান কর্ম্ম, ও পশ্চাৎ কর্ম্ম এবং ইহা আটভাগে বিভক্ত যথা;-ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য, বেধ্য, এষ্য, আহর্য্য, বিস্রাব্য ও সীব্য। ছেদ ক্রিয়ার অর্থ কাটিয়া ফেলা। ভেদন-বিদারণ করা। লেখন অর্থে,-চাঁচিয়া লওয়া। বেধন-বেঁধা, এষণশোষ (নালী) প্রভৃতির সীমা অন্বেষণ। আহরণ, দেহ হইতে শল্য বহিষ্করণ। বিস্রাবণ, পূষরক্তাদির নিঃসরণ এবং সীবন অর্থাৎ সেলাই করা। এই আট প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে, কোন ক্রিয়া সম্পাদন করিবার পূর্ব্বে, নিম্নলিখিত বস্তুসকল আহরণ করা আবশ্যক। যথা, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নি, শৃঙ্গ, জোঁক, শলাকা, লাউ, তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সূতা, মধু, ঘৃত, বশা, দুগ্ধ, তৈল, তর্পণ দ্রব্য, উপযুক্ত কষায়, আলেপণ কল্ক, (Lint) পাখা, শান্ত শীতল জল, উষ্ণজল, কড়া ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য এবং

বলশালী, প্রকৃতি ও নম্র পরিচারক উপস্থিত রাখিয়া পরে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে, রোগীকে পূর্ব্বাহ্ণে লঘুভোজন করাইয়া পূর্ব্বমুখে বসাইয়া, চিকিৎসক পশ্চিমমুখ হইয়া শস্ত্র প্রয়োগ করিবেন। শস্ত্রপাতকালে মর্ম্মস্থান, শিরা, স্নায়ু, সন্ধিস্থানের অস্থি ও ধমনী, এই সকলে যেন আঘাত না লাগে তদ্বিষয়ে চিকিৎসকের পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া আবশ্যক। অস্ত্রপ্রয়োগ, অনুলোম ভাবে এবং একবারেই কার্য্য সিদ্ধিকর হয় এইরূপ করিয়া করিতে হইবে। অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যদি পুঁষ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার আশু উদ্ধার করিয়া লইবে। মহৎপাকেও দুই বা তিন অঙ্গুলি পর্য্যন্ত অস্ত্র প্রয়োগের সীমা জানিবে। অস্ত্রপাত জনিতক্ষত প্রকৃত সময়ে কৃত, আয়ত, বিশাল ও উপযুক্ত বিভাগযুক্ত হইলে এবং নিকটবর্ত্তী অন্য স্থান আক্রমণ না করিলে, তাহা কষ্টদায়ক হয় না। একবার অস্ত্রঘাত করিয়া যদি পুঁযাদি সম্যক নিঃসৃত না হয়, তাহা হইলে যথা যোগ্য স্থানে, পুনর্ব্বার অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। যতদুর পর্য্যন্ত শোষ দেখিবে এবং যে যে স্থানে কোটরবৎ দৃষ্ট হইবে, সেই সেই স্থান পর্য্যন্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ দূষিত পদার্থ সম্যক নিঃসৃত না হইলে কোন প্রকারেই ক্ষতারোগ্যের সম্ভাবনা নাই। পুঁষ—রক্তাদি অবশিষ্ট থাকিলে ক্ষত ক্রমশঃ দেহের গভীরতম প্রদেশ ও নিকটবর্ত্তী বাহ্যাংশ আক্রমণ করিয়া, অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং দুরারোগ্য হইয়া উঠে।

ভ্রু, গণ্ড, শঙ্খ, ললাট, নেত্রপুট, ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, কক্ষ, কুক্ষি, ও বঙ্ক্ষণ প্রদেশে তির্য্যক ভাবে ছেদ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। হস্ত ও পদে চন্দ্রমণ্ডলাকৃতি এবং গুহ্যদেশে ও মেঢ্রে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে ছেদ করিবে। নচেৎ শিরা ও স্নায়ু ছিন্ন হইবার সম্ভব. অধিকন্তু অতিশয় বেদনা ও মাংসকন্দের উৎপত্তি হইয়া ক্ষত শুকাইতে বিলম্ব হয়। মূঢ়গর্ভ, অর্শঃ, আশ্মরী, ভগন্দর ও মুখ রোগে শস্ত্রক্রিয়া করিতে হইলে, রোগীকে আহার না করাইয়া কার্য্য সম্পাদন করা বিধেয়। শস্ত্রোপচারান্তে রোগীর মুখ ও চক্ষু প্রভৃতিতে শীতল জলসেক ও অঙ্গুলির দ্বারা শোথ পরিপীড়ন করিয়া উহা হইতে ক্লেদ নিঃসারণ করিয়া দিবে। তৎপরে বস্ত্র

খণ্ড জলসিক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা ক্ষত প্রক্ষালন পূর্ব্বক উহার অভ্যন্তরে তিলকল্ক, মধু ও ঘৃতসিক্ত ঔষধবর্ত্তি প্রনিহিত করিবে। এইরূপ করিয়া উপযুক্ত কল্ক দ্বারা ক্ষতের উপরিভাগ আচ্ছাদন ও শুভ্রবস্ত্র খণ্ড দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরে গুগ্‌গুল, অগরু, ধুনা, বচ, শ্বেতশর্ষপ, লবণ, নিম্বপত্র ও ঘৃত এই সমুদায় একত্র করিয়া তাহার ধুম প্রদান করিবে।

এই সমুদায় কার্য্য সমাপনান্তে রোগীকে গৃহ প্রবেশ করাইয়া যথাযথ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। তৃতীয় দিবসে পটি খুলিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিধি অনুসারে পটি বন্ধন করিবে। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় দিবসে পটি খুলিলে ক্ষত গ্রন্থিযুক্ত ও যাতনা বৃদ্ধি হয় এবং শীঘ্র শুষ্ক হয় না।

তৎপরে দেশ, কাল ও বল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত মত কষায় প্রলেপ, বন্ধন, আহার ও আচারাদি ব্যবস্থা করিবে। অভ্যন্তরে দোষ থাকিলে কদাপি ব্রণ রোপণের চেষ্টা করিও না, কারণ ঐ অবশিষ্ট দোষ গভীরতম প্রদেশ আক্রমণ করিয়া, বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। অতএব অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ হইলে ব্রণ রোপণ করিবে। ক্ষত পুরিলেও, যতদিন না সম্যক স্থৈর্য্য উপস্থিত হয়, ততদিন ব্যায়াম, হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। হেমন্ত, শীত, ও বসন্ত ঋতুতে তিনদিন অন্তর এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে দুইদিন অন্তর পটি প্রভৃতি খুলিয়া পুনর্ব্বার ব্রণসজ্জা করিয়া দেওয়া বিধেয়। প্রাণ সংশয় স্থলে এই নিয়ম প্রতিপালন করা অনাবশ্যক পরন্তু পুয দ্বারা বস্ত্র বা পটি ভিজিয়া গেলে প্রত্যহ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। তখন অগ্নি প্রদীপ্ত গৃহের ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র প্রতীকার করিবে। শস্ত্রাঘাতজনিত বেদনা, যষ্টিমধু সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ ঘৃত সেবনে প্রশমিত হয়।

এই প্রকার অষ্টবিধ শস্ত্র কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন স্থল প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা ভগন্দর, শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি, তিলকালক, ব্রণ, বর্ত্ম রোগ, অর্ব্বুদ, অর্শঃ, চর্ম্ম কীলক, অস্থিমাংস প্রভৃতি স্থানে শল্য, জতুমণি, মাংস সংহতি, গলশুণ্ডিকা, স্নায়ু, মাংস ও শিরার পচন, বল্মীক, শত পৌনক, অধ্রুষ, উপদংশ, মাংসকন্দ, ও অধিমাংস, এই সকল স্থানে ছেদন ক্রিয়া বিধেয়। সান্নিপাতিক ভিন্ন, অন্য সকল প্রকার বিদ্রধি, বাতিক, পৈত্তিক ও

শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি, বিসর্প, বৃদ্ধি, বিদারিকা, প্রমেহ পীড়ন, শোথ, স্তনরোগ, অবমন্থক, কচ্ছপিকা, অনুশয়ী, নাড়ী ব্রণ, বৃন্দ, পুষ্করিকা, অলজী, প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষুদ্ররোগে এবং তালুপুপ্পুট, দন্তপুপ্পুট, তুণ্ডিকেরী, শিলায়ু, যাহারা অগ্রে দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া, পরে প্রকাশ পায়, সেই সকল শোথ, অশ্মরী, সমাক্রান্ত বস্তি ও মেদজ রোগ সমূহে ভেদন ক্রিয়াই প্রশস্ত। চারি প্রকার রোহিণী, কিলাস, উপজিহ্বা, মেদ সম্ভূত দন্ত বৈদর্ভ, গ্রন্থি, বর্ত্ম রোগ, অধিজিহ্বা, অর্শঃ, মণ্ডল, মাংসকন্দ ও মাংসোন্নতি প্রভৃতি রোগ সমূহে, লেখন করা কর্ত্তব্য। নাড়ি ব্রণ, সংশল্য, ও উন্মার্গগামী ব্রণ, এষণ করিবে। তিন প্রকার শার্করা, দন্তমল, কর্ণমল, অশ্মরী, শল্য, মূঢ়গর্ভ, ও গুহ্য সঞ্চিত কঠিনীভূত পুরীষ সমূহ, আহরণ করা কর্ত্তব্য। সান্নিপাতিক ভিন্ন অপর পাঁচ প্রকার বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বেদনাযুক্ত বাত রোগ, এক দেশোৎপন্ন শোথ, কর্ণপালীর পীড়া, শ্লীপদ, বিষদুষ্ট রক্ত, অর্ব্বুদ, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক, এই তিন প্রকার বীসর্প, এবং উপদংশ, স্তন রোগ, বিদারিকা, শৌষির, গলশালুক, কণ্ঠক, ক্রিমিদন্তক, দন্তবেষ্ট রোগ, উপকুস, শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, পিত্ত-রক্ত-শ্লেষ্ম জন্য ওষ্ঠরোগ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রোগে, স্রাবণ ক্রিয়া সম্যক প্রয়োজ্য। মেদ জাত ব্রণ, বিদারিত স্থান, যাহাতে লেখন ক্রিয়া করা হইয়াছে, সদ্যোব্রণ, চলিষ্ণু; সন্ধির উপরিজাত ব্রণ, এই সমুদায় সীবন (সেলাই) করা বিধেয়। কিন্তু ব্রণ ক্ষত্র বা অগ্নিসংযোগ জন্য হইলে এবং বিষদূষিত বা বায়ুবাহী হইলে অথবা উহার অভ্যন্তরে রক্ত পুঁজাদি শল্য থাকিলে তাহা অগ্রে সম্যক বিশোধন করা কর্ত্তব্য। যদি ব্রণ মধ্যে ধুলি, রোম, নখ ও ভগ্ন অস্থি খণ্ড থাকে, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথমে উহাদিগকে উদ্ধৃত করিয়া ফেলিয়া দেওয়া বিধেয়।) কারণ উহারা ব্রণের অভ্যন্তরে থাকিলে অতিরিক্ত পচন উপস্থিত হইয়া বিশেষ অনিষ্ট জনক হইয়া থাকে। এইরূপে সম্যক্ শোধন ও শল্য নির্হরণ করিয়া, সূক্ষ্ম সূত্র, অশ্মন্তক বৃক্ষের বল্কল সূত্র, শণসূত্র; রেশম-স্নায়ু, কেশ, (বালমচি) গুলঞ্চের সূত্র অথবা দূর্ব্বাসূত্র দ্বারা ক্ষতের ওষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিয়া সেলাই করিবে। স্থান ও ক্ষত বিশেষে গোফনিকা, তুন্নসেবনী অথবা ঋজুগ্রন্থি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ সেলাই

করিবে। অল্প মাংস বিশিষ্ট স্থানে দুই আঙ্গুলি আয়ত গোলাকার সূচ, মাংসল স্থানে তিন অঙ্গুলি আয়ত ত্রিকোণ সূচি, এবং মর্ম্মস্থান, অণ্ড-কোষ, ও উদরের উপরে ধনুকের ন্যায় বক্রসূচি ব্যবহার্য্য। এই তিন প্রকারের সূচি তীক্ষ্ণাগ্র ও সুগঠিত হওয়া আবশ্যক। ইহাদের বেষ্টন পরিমাণ মালতী পুষ্পের বৃন্তের অগ্র ভাগের ন্যায় করিবে। ক্ষত স্থানের অধিকদূর বা অতি নিকট হইতে সীবণ করা অবিধেয়। অধিক দূর সেলাই করিলে অতিশয় যাতনা হয়, এবং নিতান্ত নিকট হইতে সেলাই করিলে তাহা খুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপে সেলাই করিয়া পট্ট বস্ত্রখণ্ড ও তুলার দ্বারা আচ্ছাদন এবং প্রিয়ঙ্গু, সুর্ম্মা যষ্টীমধু, লোধ ও সল্লকীরাল প্রভৃতির চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। তারপর নিয়মিতরূপে ব্রণ বন্ধন করিয়া রোগীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। এই অষ্ট প্রকার শস্ত্র ক্রিয়ার হীনতা, অতিরিক্ততা, তির্য্যকচ্ছেদ ও শস্ত্র প্রয়োজয়িতার গাত্রচ্ছেদন এই চারি প্রকার বিপদের সম্ভাবনা। অতএব এই চারি প্রকার দোষের কোনরূপ দোষ না ঘটে তজ্জন্য পূর্ব্বাহ্নে চিকিৎসকের সাবধান হওয়া আবশ্যক।

অজ্ঞান, লোভ, অহিত বাক্যযোগ, ভয় ও প্রমোহ অথবা অন্যান্য কারণ বশতঃ চিকিৎসক কুশস্ত্র প্রয়োগ করিলে, বিবিধ বিকৃতি উপ-স্থিত হয়। যে চিকিৎসক অযৌক্তিক রূপে ক্ষার, শস্ত্র, অগ্নি ও ঔষধ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করেন, জীবন প্রার্থীব্যক্তি তাহাকে দূরে পরিহার করিবেন। মর্ম্ম ও সন্ধিস্থান অতিক্রম করিয়া অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিলে শিরা, স্নায়ু ও অস্থি পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়া রোগীর জীবন নাশ হই-বার সম্ভাবনা। পঞ্চ মর্ম্মস্থান ক্ষত হইলে; ভ্রম, প্রলাপ, পতন, অচৈতন্যা-বস্থা, ইতস্ততঃ গাত্র-বিক্ষেপ, দেহের উষ্ণতা, শৈথিল্য, মূর্চ্ছা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, বিবিধ তীব্র বাত-বেদনা, মাংস ধাবন জল সদৃশ রক্ত-স্রাব, ও সমুদায় ইন্দ্রিয় শক্তির লোপ হয়। শিরা ও ধমনী ছিন্ন হইলে, ক্ষত হইতে প্রভূত পরিমাণে রক্ত ও বায়ু নির্গত হইয়া নানা প্রকার বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্নায়ু বিদ্ধ হইলে, শরীরে কুব্জতা, অবসাদ, সকল কার্য্যে অশক্তি ও অত্যন্ত যাতনা হইতে থাকে এবং ক্ষত দুরারোগ্য হইয়া

উঠে। সন্ধিস্থান ক্ষত হইলে, শোথের অতিবৃদ্ধি, প্রবল যাতনা, দৌর্ব্বল্য, জ্বরবৎ বেদনা এবং শোথ ও আত্মচালনা বিষয়ে অক্ষমতা দৃষ্ট হয়। অস্থি বিদ্ধ হইলে; দিবারাত্র ঘোরতর যন্ত্রণা, তৃষ্ণা, অঙ্গের অনবরতা শোষ ও বেদনা উপস্থিত হয়। অস্থিবিদ্ধ ব্যক্তি, কোন অবস্থাতেই আরাম অনুভব করিতে পারে না। মাংস কিম্বা মর্ম্ম আহত হইলে, স্পর্শ জ্ঞানের অভাব ও শরীর ম্লান হইয়া যায়। যে কুবৈদ্য শস্ত্রক্রিয়া কালে আপনার অঙ্গচ্ছেদন করিয়া ফেলে, তাহার দ্বারা কদাচ অস্ত্র চিকিৎসা করাইবে না। তির্য্যকভাবে শস্ত্র প্রনিহিত হইলে যে দোষ উপস্থিত হয়, পূর্ব্বেই তাহা একপ্রকার উক্ত হইয়াছে, উল্লিখিত দোষ সমূহ যাহাতে না ঘটে, সেইরূপ সাবধান হইয়া শস্ত্রপাত করা কর্ত্তব্য।

আমরা আর্য্য অস্ত্রচিকিৎসার কথঞ্চিৎ মত বর্ণনা করিলাম, এতভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অস্ত্রবিধি, সুশ্রুষা, রোগীর চিকিৎসা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় বিষদরূপে বর্ণিত আছে; অস্ত্র করিবার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, তাহার প্রস্তুতোপায়, তাহা কি করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, তৎসমুদায়ও সুন্দর ভাবে আর্য্য ঋষিগণ কর্তৃক সম্যক প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব এবং আমাদের তাহা উদ্দেশ্যও নহে। আমরা কেবল মাত্র তাঁহাদের "শস্ত্র বিধির" উল্লেখ করিলাম, পাঠকগণ ইহা দ্বারা সেই অতীত কালের অসামান্য ধীশক্তি ও প্রতিভা সম্পন্ন আর্য্যজাতির অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা আর্য্যদিগের অস্ত্র চিকিৎসা আদৌ ছিল না বলিয়া আস্ফালন করেন, তাঁহাদের ইহার পর আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

আর্য্যশরীর বিধান। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আর্য্যশরীর বিধান একরূপ বলিয়াছি। কিন্তু তাহা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক। একটু প্রনিধান করিয়া দেখিলেই আমরা পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহিত আর্য্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলাগত পার্থক্য বুঝিতে পারি। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান শারীরিক যন্ত্রের উপর লক্ষ্য করিয়া রোগের নিদান তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, আর আর্য্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান, নিদান তত্ত্ব বুঝাই-

য়াছেন যান্ত্রিক ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য রাখিয়া। সেই যান্ত্রিক ক্রিয়া বুঝাইবার জন্যই বায়ু, পিত্ত, কফের অবতারণা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আর্য্যচিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে বায়ু পিত্ত, কফই রোগমাত্রের কারণ-:—"সর্ব্বষামেব রোগানাং নিদানং কুপিতামলাঃ।" এবং তাহারা দোষ নামে অভিহিত। আয়ুর্ব্বেদের মতে রোগ কাহাকে বলে? "রোগস্তু দোষ বৈষম্যম"। দোষের বায়ু পিত্ত, বা কফের—বিষমতার নামই রোগ। অতএব আর্য্যশরীর বিধান অবগত হইতে হইলে, রোগের মূলীভূত কারণ স্বরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফের গুণাগুণ অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১। বায়ু। দোষের মধ্যে বায়ুই প্রধান। পিত্ত, শ্লেষ্মা, মল বা ধাতু সমস্তই অচল, বায়ু তাহাদিগকে যথা-স্থানে লইয়া যায়. এবং তথায় তাহারা কার্য্য করে। যেমন মেঘ বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বায়ুর, শারীরিক সকল যন্ত্রের--সকল স্থানেই সমান কর্তৃত্ব। বায়ু, রুক্ষ, শীতল, লঘু সুক্ষ্ম, চঞ্চল, নির্ম্মল ও খরগুণ বিশিষ্ট। কটি, উরু, কর্ণ, অস্থি, ত্বক, বিশেষতঃ পক্কাশয়েই তাহার স্থান। আয়ুর্ব্বেদের মতে বায়ুই-আয়ু, বায়ুই-বল, বায়ুই-শরীরের ধাতু, এই বিশ্ব বায়ুময় জগতে বায়ুই প্রভু। যেমন রাজা বহির্জগতের কর্ত্তা, অন্তর্জগতে তেমনি বায়ুই প্রধান। সেই বায়ু আবার প্রাণাদি ভেদে পাঁচ প্রকার। যথা;—

হৃদয়ে, প্রাণবায়ু; গুহ্যদেশে, অপানবায়ু; নাভি মধ্যে, সমান বায়ু; কণ্ঠদেশে, উদান-বায়ু; এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান্-বায়ু অবস্থান করে। যে বায়ু রক্ত-সঞ্চালনকারী, সেই বায়ু প্রাণ নামে আখ্যাত, সেই বায়ুই দেহকে ধারণ করে। সেই বায়ুই ভুক্তদ্রব্যকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় এবং বল রক্ষা করে। বায়ু কুপিত হইলে; হিক্কা, শ্বাষমান প্রভৃতি রোগ জন্মায়। উদান বায়ু, উর্দ্ধে অর্থাৎ কণ্ঠদেশে বাস করে, তদ্দারাই বাক্য ও গীতাদির প্রবর্ত্তন হয়; উদান বায়ু কুপিত হইলে, যকৃতের (Liver) রোগ জন্মে। সমানবায়ু অগ্নি ও পক্কাশয়ে থাকে। সেই বায়ুই অগ্নির সাহায্যকারী, সেই বায়ুই ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক এবং

রস, মল, ও মূত্রাদির পূরণ করে। সেই বায়ু কুপিত হইলে গুল্ম অগ্নিমান্দ্য ও অতিসারাদি রোগ জন্মে। অপান বায়ু পাকাশয়ে অবস্থান করে এবং সেই বায়ুই যথাকালে মূত্র, পুরীষ, শুক্র, প্রভৃতি অধোদেশে লইয়া যায়। সেই বায়ু কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্যাশয়ের কঠিন রোগ জন্মে। ব্যান বায়ু দেহের সর্ব্বস্থানেই অবস্থান করে; ইহার দ্বারাই রস প্রবাহিত হয়, এবং স্বেদ ও অসৃক স্রাব হয় এবং পঞ্চপ্রকার বেষ্টন-কার্য্য সম্পন্ন হয়। ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব্ব দেহে রোগ উৎপন্ন করে। শুক্র দোষ ও প্রমেহ, ব্যান ও অপান বায়ু প্রকোপের ফল। ইহারা এককালীন কুপিত হইলে নিশ্চয়ই দেহ নষ্ট করে!

২। পিত্ত। প্রধানতঃ পিত্ত, স্থানভেদে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক, ও ভ্রাজক এই পাঁচভাগে বিভক্ত। পাচক পিত্ত অন্নাশয়ে, রঞ্জকপিত্ত যকৃত ও প্লীহায়, সাধকপিত্ত হৃদয়ে, আলোচকপিত্ত লোচনদ্বয়ে ও ভ্রাজকপিত্ত সর্ব্বশরীরের ও ত্বকে অবস্থিতি করে। পাচকপিত্ত আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে থাকিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, মহাভূত গত অগ্নি ও বল বর্দ্ধন করে এবং রস, মূত্র ও পুরীষকে পৃথক করিয়া নিত্য বিরেচন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। রঞ্জকপিত্ত যকৃত ও প্লীহাতে অবস্থিতি করিয়া রসকে রঞ্জিত করতঃ রক্ত উৎপাদন করে। সাধকপিত্ত হৃদয়ে থাকিয়া বুদ্ধি ধৃতি ও স্মৃতি শক্তি উৎপাদন করে। আলোচকপিত্ত চক্ষুতে অবস্থিতি করিয়া দৃষ্টিশক্তি প্রদান করে এবং ভ্রাজকপিত্ত ত্বকে অবস্থিতি করিয়া ও অভ্যঙ্গাদির (তৈল মাখা) দীপ্তি উৎপাদন এবং লেপ করে।

৩। শ্লেষ্মা। শ্লেষ্মা; গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ মধুর স্থির ও পিচ্ছিল। শ্লেষ্মাও স্থানভেদে অবলম্বক, ক্লেদক, শ্লেষক, বোধক ও তর্পক এই পাঁচভাগে বিভক্ত। অবলম্বক নামক শ্লেষ্মা বক্ষে থাকিয়া গ্রীবাস্কন্ধ প্রভৃতিকে অবলম্বন করে। যে শ্লেষ্মা আমাশয়ে থাকিয়া অন্নকে ক্লিন্ন করে, তাহার নাম ক্লেদক। সন্ধিস্থানে যে শ্লেষ্মা অবস্থিতি করে, তাহার নাম শ্লেষক। সন্ধিশ্লেষ করায় বলিয়া ইহা পূর্ব্বোক্ত নামে আখ্যাত। রসবোধ করায় বলিয়া যে শ্লেষ্মা রসনায় অবস্থিতি করে

তাহার নাম বোধক। যে শ্লেষ্মা মস্তকে থাকিয়া নেত্রের তর্পণ করে তাহার নাম তর্পক।

বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার সংযোগে স্বরূপ ও স্থান এবং কার্য্য লিখিত হইল। ইহাতে শরীরতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, শারীরিক ক্রিয়ার প্রধান শক্তি এই তিন দোষ। ইহাই আর্য্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এর মূলভিত্তি এবং এই নিমিত্তই আমরা ইহাদের বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম।

স্বাস্থ্য চিকিৎসা। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত দ্রব্য সমূহের গুণ এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যাবিৎ মহাশয়েরাও বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন, এমন কি তাঁহারা নিজে ব্যবহার পর্য্যন্ত করিতেছেন। সম্প্রতি ভারতীয় গাছগাছড়া অনুসন্ধান এবং গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক কমিসন বসাইতেছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাক্তার ওসানেসি স্বীয় পুস্তকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত বহুবিধ দ্রব্যের গুণবিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন এবং স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এই সকল দ্রব্য ইংরাজী ঔষধের পরিবর্ত্তে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তিনি বেঙ্গল ফার্ম্মাকোপিয়া নামক পুস্তকের সূচনায় লিখিয়াছেন যে, "যখন ঔষধালয়ে কোন একটী ইংরাজী ঔষধ নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন অনেক স্থলে বাজারের দ্রব্য দ্বারা তাহাদের কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। যথা—কুইনাইন এবং পিরুবিয়ান্ বার্কের পরিবর্ত্তে "এনারকোটীন্" (অহিফেনজ দ্রব্য বিশেষ), গুলঞ্চ, রসোৎ (দারুহরিদ্রা হইতে নিঃসৃত পদার্থ বিশেষ) বণ্ডুকসীড (নাটাকরঞ্জার বীজ) এবং অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। জোলাপের পরিবর্ত্তে, কালাদানা ব্যবহার করা যাইতে পারে। মুর্দ্দা, টার্টার্ এমেটিক প্রস্তুত করিবার প্রধান উপাদান। কুচ্‌লের ছাল ষ্ট্রীকনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়। আকন্দ মূলের ছাল ইপেকাকুয়ানার কার্য্য এবং অনন্ত মূলে, সার্সাপেরিলার কার্য্য, অতি উত্তমরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে।" আজ আমরা কুইনাইনের অমোঘ জ্বরঘ্ন শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু সেই প্রাচীন কালের আর্য্য আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছিলঃ—

"তিক্তঃ রসঃ নিসর্গতেব অরুম্ব
তিক্তঃ রসয়ো বিষ্ণুর্ রুচিং কৃমি তৃড়্ বিষঃ,
কুষ্ঠ মূর্চ্ছা জ্বরোৎ ক্লেদ দাহ পিত্ত কফান্।"

"তিক্তরস স্বভাবতঃই অরুম্ব, তিক্তরস স্বয়ং রুচিপ্রদ নহে; কিন্তু অরুচি, কৃমি, তৃষ্ণা, বিষদোষ, কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা, জ্বর, উৎক্লেদ, দাহ, পিত্ত ও কফ নষ্ট করে।"

অধিকন্তু বাগভটে লিখিত আছেঃ—

"তিক্তঃ পিত্তে বিশেষেণ প্রযোজ্য।"

আর না, আর আমরা বলিতে চাহি না। পাঠকেরা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতেই কতকটা বুঝিতে পারিবেন যে, আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিঘূর্ণিত মস্তক ডাক্তার বাবুদের হেয় হইলেও কত মহান্, আর এই চিকিৎসা বিজ্ঞান যাঁহাদের মস্তিক হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল তাঁহারা কত মহান, তোমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক বলিতে চাও বল, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রসায়ণ (Chemistry) নাই বলিবে বল, কিন্তু পরিশেষে আমাদের বিনীত অনুরোধ, সেই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী ঋষিদের মানস পুত্র, আয়ুর্ব্বেদের মুখ পানে চাহিও; সে সময়ে অনেক সাহায্য করিতে পারে।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

—•—

আর্য্য-স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

প্রথম তত্ত্ব।

ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামরোগ্য মূল মুত্তমম্।
রোগস্তস্যা পহর্ত্তারঃ শ্রেয়শো জীবিতস্য চ॥

সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে সকলেরই স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। শরীরের স্বাস্থ্য সম্পাদক, মনের তৃপ্তি জনক এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সমুত্তেজক আহার বিহার করিলে সহসা কাহারও কোন প্রকার অত্যাহিত সংঘটিত হইতে পারে না। যদি দেহ

ও মন সর্ব্বতোভাবে সুস্থ থাকে, ক্ষণকালের জন্যও কোন প্রকার গ্লানি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে আবাল-বৃদ্ধ সকলের অন্তঃকরণেই উন্নতির আশা বলবতী হইয়া উঠে। এই নিত্য নূতন উন্নতির আশাকে কাম শব্দে অভিহিত করা যায়। মনো মধ্যে কাম বা কামনার উদ্রেক না হইলে কখনও অর্থ সঞ্চিত হইতে পারে না। এই অর্থই আবার ধর্ম্ম সংস্থিতির সোপান। ধার্ম্মিকগণই সর্ব্বদা শান্তিময় মোক্ষপদের অধিকারী হইয়া থাকেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে, আরোগ্যই ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষের একমাত্র কারণ। এবম্ভূত মহোপকারী আরোগ্য যাহাতে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে স্বাস্থ্যাপহর্ত্তা রোগ সকল সহসা প্রাদুর্ভূত হইয়া জীবিতকালকে সঙ্কুচিত করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপণ মানব জীবনের একটী অত্যাবশ্যকীয় প্রধান কর্ম্ম। আমরা ভূমণ্ডল সহ অনন্ত বায়ু-সমুদ্রে প্রতিনিয়ত ভাসিয়া বেড়াইতেছি। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতিও তদ্বৎ ভাসমান রহিয়াছে। চন্দ্র-সূর্য্য সমুদ্ভূত কিরণ রাশী, অনন্ত বায়ু-রাশী ভেদ করিয়া পৃথিবীতে নিপতিত হইতেছে। কিন্তু এই কিরণ রাশী সর্ব্বদা সমান ভাবে সর্ব্বত্র পতিত হয় না। এই প্রকার কিরণ-বৈষম্য এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থিতি বৈষম্য বশতঃ মধ্যে মধ্যে সেই অনন্তবায়ু এবং তন্মধ্যস্থিত ভূমণ্ডলের অবস্থান্তর হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয় ঋতু চর্য্যাতত্ত্বে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে কেবল এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, আয়ুস্কামী সভ্য মানব দিগের পক্ষে ঋত্যনুযায়ী আহার বিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। আবার আরও সূক্ষ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয় জানিতে পারা যায় যে, গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জ ও চন্দ্রমণ্ডলের স্থিতিবৈষম্য জন্য পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় চেতনাচেতন পদার্থ সমূহেরও অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রকার অবস্থান্তর হয় বলিয়াই সভ্য সমাজে ঋিত্যনুযায়ী আহার বিহার প্রচলিত হইয়াছে। কে সভ্য, কে অসভ্য এবং সভ্যতাই বা কাহাকে বলে? এই সমুদায় নিরূপণ করা আজ কাল বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। স্থূল পরিস্কার বস্ত্রাদি দ্বারা পদহইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া সর্ব্বদা উচ্চমঞ্চে * বসিয়া থাকিলেই যে প্রকৃত সভ্যপদে উন্নীত হওয়া যায়, এমন

* Chair, Couch &c.

++
++

নহে। জ্ঞান প্রভায় যাঁহাদিগের বাহ্যাভ্যন্তর সর্ব্বতোভাবে প্রভাসিত হই-য়াছে, সেই সকল ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মাগণই প্রকৃত পক্ষে সভ্যপদ বাচ্য। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে, লোকের তদ্রূপ অভাব ছিল না, এক সময় ভারত-বাসী মহাত্মাগণ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও শিল্পনৈপুণ্যাদি একবিংশতি বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্টতা লাভ করিয়াছিলেন। অধুনা অরতমতার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। তাই বহুকালের সঞ্চিত জ্ঞানরাশী পরপদস্খলিত ধূলিরাশী দ্বারা দিন দিন আচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান সময়ের বৈদেশীক পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা কিন্তু আর্য্যশাস্ত্রাদিরই প্রশংসা করিব। ফলতঃ পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিগণ আহার বিহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বৈদেশীক পণ্ডিতগণ সহস্র বৎসরেও তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। কিঞ্চিৎ ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আরও জানিতে পারা যায় যে, ভূমণ্ডলস্থ প্রত্যেক দেশের পক্ষে এবং প্রত্যেক সমাজভুক্ত মানবমণ্ডলীর পক্ষে, সকল সময় কখনও একই প্রকার আহার বিহার সম্যক্ উপযোগী হইতে পারেনা। বর্ত্তমান সময়ে বৈদেশীক শাসনে, ভার-তের সমাজ বা জাতীয় বন্ধন একবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির দৃঢ়তা লক্ষিত হয় না। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই এক্ষণে শূদ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। আবার ভাগ্যদোষে কতকগুলি ধনবান ব্যক্তি এতদূর অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন যে, ভ্রমক্রমেও তাঁহাদিগকে কখন কোন প্রকার জাতি বা সমাজভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না। এই সমস্ত কারণে জাতিভেদে স্বাস্থ্যরক্ষার যে সামান্য প্রভেদ, প্রাচীন শাস্ত্রে তাহা বর্ণিত আছে, এস্থলে তৎসমুদায়ের বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। সদাচারী হিন্দুগণ স্বয়ংই উহা অবগত আছেন। এস্থলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাধারণের পক্ষে যে সকল নিয়ম একান্ত স্বাস্থ্যপ্রদ তাহাই ক্রমশঃ বর্ণনা করা যাইতেছে! আয়ুর্ব্বেদ মতে মানবদিগের বাসোপযোগী দেশ সমূহ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত, যথা—আনূপ, জাঙ্গল এবং মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত (১) প্রথমতঃ এই তিন প্রকার দেশের লক্ষণ এবং কে দেশে, যে প্রাকর দোষ স্বভাব সিদ্ধ, তাহাই বলা যাইতেছে।

(১) ভূমিদেশস্ত্রিধানূপো জাঙ্গলো মিশ্র লক্ষণঃ॥

বহু নদ নদী সমন্বিত পর্ব্বত ও পবন বিরাজিত প্রদেশকে আনূপদেশ কহে। যে প্রদেশের সরোবর সমূহে প্রস্ফুটিত কমল এবং হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ নিয়ত বিচরণ করে, যে স্থানে শশক, বরাহ, মহিষ, রুরু, রোহিত প্রভৃতি অরণ্য জন্তুগণ অকুতোভয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করে, যে সকল প্রদেশস্থিত তরুরাজি ফলপুষ্প ভারে দর্শকের তৃপ্তি সম্পাদন করে এবং যে সকল দেশস্থিত ক্ষেত্রসমূহ নীল, শস্য, শালিধান্য, কদলী ও ইক্ষু প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমানে উৎপন্ন হয়, সেই সকল দেশকেই আনূপদেশ কহে। এই আনূপদেশ অত্যন্ত বাতশ্লেষ্মা বর্দ্ধক। (১) সুতরাং এই দেশেবাসী মানব দিগের প্রকৃতিও স্বভাবতঃ বাত-শ্লেষ্মা প্রধান। কোন প্রকার পীড়া উপস্থিত হইলেও এই দুইটী দোষের আধিক্য লক্ষিত হয়। আনূপদেশবাসী মানব দিগের পক্ষে সকল প্রকার বাতশ্লেষ্মাবর্দ্ধক অহার-বিহার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যে সকল দেশে আকাশ অপেক্ষাকৃত শুভ্র ও উচ্চ বলিয়া বোধহয় এবং জলাশয় ও বৃক্ষ সমূহ নিতান্ত বিরল, কেবল স্থানে স্থানে শমী, বংশ, বিল্ব, অর্ক, পিলু ও কর্কন্ধু (আমড়া গাছ) প্রভৃতি বাহুল্য পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, হরিণ এণ, ঝক্ষ, গোকর্ণ, পৃষৎ ও খর নামক জন্তু সকল বিচরণ করে এবং সর্ব্বদা নানা প্রকার সুস্বাদু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে জাঙ্গল দেশ কহে। এই জাঙ্গল দেশ অত্যন্ত বাত প্রধান। আবার কেহ কেহ বলেন এই সকল দেশবাসী ব্যক্তিগণ প্রায়শঃ বাত-পিত্ত-রক্ত দোষ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে (২)।

---

(১) নদীপল্বল শৈলাঢ্যঃ ফুল্লোৎপল কুলৈর্য্যুতঃ। হংস সারস কারণ্ড চক্রবাকাদি সেবিতঃ। শশ বরাহ মহিষ রুরু রোহিকুলাকুলঃ প্রভূতদ্রুম পুষ্পাঢ্যো নীল-শস্য-কলান্বিতঃ॥ অনেক শালিকেদার কদলীক্ষু বিভূষিতঃ। আনূপদেশো জ্ঞাতব্যো বাতশ্লেষ্ম ময়ার্ত্তিমান॥

তন্ত্রান্তরেতু।

বহূদক নগোঽনূপঃ কফমারুত রোগবান্॥

(২) আকাশ শুভ্র উচ্চশ্চ স্বল্পপানীয় পাদপঃ। শমীকরীর বিল্বার্ক পীলু কর্কন্ধু-সঙ্কুলঃ॥ হরিণৈণর্ক্ষ পৃষত-গোকর্ণ-খর সঙ্কুলঃ। সুস্বাদু ফলবান দেশো বাতলো জাঙ্গলঃ স্মৃতঃ॥ (তন্ত্রান্তরেতু) জাঙ্গলোঽল্পাম্বু শাখী চ পিত্তাসৃঙ্মারুতোত্তরঃ॥

(ভাব প্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড)

সংসৃষ্ট লক্ষণযুক্ত দেশকে মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত বা সাধারণ দেশ কহে। এই সকল সাধারণ দেশে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বসন্ত এই ঋতু চতুষ্টয়ের সমতা প্রযুক্ত দোষেরও সমতা লক্ষিত হয়। সুতরাং মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত বা সাধারণ দেশ গুলিই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যকর (১)। কচিৎ কোন কোন স্থানে, কোন কোন ঋতুর আধিক্য লক্ষিত হইলেও ভারতবর্ষকে একটি মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত দেশ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু কর্ম্মদোষে হতভাগ্য ভারতবাসীগণ দিন দিন ক্ষীণ মস্তিষ্ক, রোগাক্রান্ত এবং যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ইহাপেক্ষা বিস্ময় ও দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, যে দেশে যাহাদিগের জন্ম অথবা যে দেশীয় জলবায়ু দ্বার যাহাদিগের শরীর পরিবর্দ্ধিত, সেই দেশীয় আহার বিহার এবং তদ্দেশজাত ঔষধই তাহাদিগের পক্ষে একান্ত হিতকর। যদি কার্য্যানুরোধে কিছুকালের জন্য, কাহাকেও ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত দূরদেশে বাস করিতে হয়, তথাপি স্বদেশীয় নিয়মানুসারে আহার বিহার এবং স্বদেশজাত ঔষধাদি দ্বারা রোগ প্রতিকার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কখনও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। (২)। যাহারা নিয়ত দূরদেশে কালাতিপাত করে, তাহাদিগের স্বদেশীয় প্রকৃতি সহসা পরিবর্ত্তিত হয় না। তবে দীর্ঘকাল বাস করিতে করিতে এক সময় পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, দেশান্তরে বাস করিয়াও স্বদেশীয় নীতি উল্লঙ্ঘন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে—ইহাই প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়। কিন্তু হতভাগ্য ভারতবাসীগণ, দিন দিন ইহার বিপরীত আচরণ করিতেছে। দেশান্তরের কথা দূরে থাকুক, স্বদেশ বসিয়া আজ

---

(১) সংসৃষ্ট লক্ষণোপেতো দেশঃ সাধারণো মতঃ। সমাঃ সাধারণা যস্মাচ্ছীতবর্ষোষ্ণমারুতাঃ। সমতা তেন দোষাণাং তস্মাৎ সাধারণো বরঃ॥ (সুশ্রুতাৎ)

(২) যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্। দেশাদন্যত্র বসত স্তত্তুল্যগুণমেব যৎ॥ স্বদেশে নিচিতা দোষা অন্যস্মিন্ কোপমাগতাঃ। বলবন্তস্তথা ন স্যুর্জলজাঃ স্থলজাস্তথা॥ (বাগ ভটাৎ)

কাল ভারতবাসীগণ প্রতিনিয়ত যে সকল শাস্ত্রবিগর্হিত কদর্য্য আহার বিহারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাঁহা শ্রবণ করিলে একবারে কর্ণে অঙ্গুলিপ্রদান করিতে হয়। তাহার পর আবার বিনা কারণে বা সামান্য কারণে সকলেই বিজাতীয় ঔষধ সর্ব্বদা গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইবে কেন? যাহা হউক, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দিনচর্য্যা রাত্রিচর্য্যা এবং ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি যে প্রকার ভাবে বর্ণিত আছে, এক্ষণে তাহাই ক্রমশঃ উল্লেখ করা যাইতেছে। আয়ুষ্কামী সুস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বদা এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

দিনচর্য্যা।

সূর্য্যোদয়ের দুইদণ্ড পূর্ব্ববর্ত্তী অপর দুইদণ্ডকে ব্রাহ্মমূহূর্ত্ত কহে। স্বাস্থ্যরক্ষার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে সেই সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে কখনও এই নিয়ম প্রতিপালনীয় নহে। অনন্তর পাপ শান্তির জন্য বিশ্বনিয়ন্তা মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া দধি, ঘৃত, আদর্শ (আয়সী) বট, বিল্ব, গোরোচনা অথবা সুগন্ধি পুষ্প ও পুষ্পমাল্যাদি দর্শন এবং স্পর্শ করিবে, ইহাতে শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়। অতি প্রত্যূষে মল মূত্রাদি বিসর্জ্জন একান্ত আয়ুস্কর। এরূপ করিলে অন্ত্রকূজন, উদরাধ্মান এবং উদরের গুরুত্বাদি জন্মিতে পারে না (১) প্রাতঃকালে মল মূত্রাদির বেগধারণ করিলে কোষ্ঠবদ্ধ, আটোপ, শূল এবং গুহ্যদেশে পরিকর্ত্তন বৎ পীড়া জন্মে অথবা মুহুর্ম্মুহুঃ উদ্গার ও বায়ু নিঃসরণ হইতে থাকে (২)। যদি বায়ু নিগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে আবার বাত, মূত্র ও পুরীষের নিরোধ, উদরাধ্মান, ক্লান্তি প্রভৃতি নানা প্রকার বাতজ পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। মূত্র নিগ্রহ করিলে, বস্তি

(১) ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্বাস্থ্যে রক্ষার্থমায়ুষঃ। তত্র সর্ব্বার্থ শান্ত্যর্থং স্মরেচ্চ মধুসূদনম্॥ দধ্যাজ্যাদর্শ সিদ্ধার্থ বিল্বগোরোচনা স্রজাম্। দর্শনং স্পর্শনং কার্য্যংপ্রবুদ্ধেন শুভাবহম্॥ আয়ুষ্যমুষসি প্রোক্তং মলাদীনাং বিসর্জ্জনম্। তদন্ত্রকূজনাধ্মানোদর গৌরব বারণম্॥

(২) আটোপ শূলৌ পরিকর্ত্তিকা চ সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ। পুরীষমার্গাদথবা নিরেতি পুরীষ বেগেঽভিহতে নরস্য॥

ও মেঢ্রশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃপীড়া, শরীরের নম্রতা এবং বঙ্ক্ষণের আনাহ প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল কথায় স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ কোনমতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। কিন্তু কাম, ক্রোধ, ভয়, শোক এবং মনোবেগাদি যত্ন পূর্ব্বক ধারণ করা কর্ত্তব্য। গুহ্যাদি মলমার্গ শুচি থাকিলে, শরীর কান্তিযুক্ত বলিষ্ঠ ও পবিত্র থাকে। তাহাতে অয়ুর্বৃদ্ধি এবং অলক্ষ্মী দূরিভূত হয়। মলত্যাগান্তে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করা একান্ত স্বাস্থ্য জনক। তাহাতে শরীর শুদ্ধ, নেত্র নির্ম্মল এবং শ্রান্তি দূর হয় (১)। এতদ্ভিন্ন মনের প্রফুল্লতা ও রজোগুণ প্রবৃত্তির হ্রাস হইয়া থাকে।

এক্ষণে দন্তধাবন বিধি কথিত হইতেছে। যথা সময়ে মল-মূত্রত্যাগ ও হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা উচিত। দ্বাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, সরল, গ্রন্থিশূন্য ও অক্ষত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা বিধি (২)। দোষ, কাল এবং প্রকৃতি অনুসারে যে স্থলে যে রূপ রসবীর্য্য যুক্ত দন্তকাষ্ঠ উপযুক্ত হয়, তৎস্থানে তাহাই দন্তধাবনার্থ ব্যবস্থেয় (৩)। সাধারণতঃ মধুর, কটু, তিক্ত এবং কষায় রসবিশিষ্ট দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা যায়। মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মৌল, কটুর মধ্যে করঞ্জ, তিক্তের মধ্যে নিম্ব এবং কষায়ের মধ্যে খদির কাষ্ঠই শ্রেষ্ঠ (৪)। অধিকাংশ লোকেই এই কয়েক জাতীয় কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিয়া থাকে। এই সমস্ত বৃক্ষ অত্যন্ত সঙ্কোচক, কফ-পিত্ত

---

(১) বাতমূত্র পুরীষাণাং সঙ্গোহধ্মানং ক্লমোরুজা। জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্বাত নিগ্রহাৎ॥ বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্র কৃচ্ছ্রং শিরোরুজ। বিনামো বঙ্ক্ষ-ণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে॥ ন বেগি তোঽন্য কার্য্যঃ স্যান্ন বেগান্নীরয়েদ্বলাৎ। কাম শোক ভয়ক্রোধান্মনোবেগান্ বিধারয়েৎ॥ গুদাদি মল মার্গাণাং শৌচং কান্তি-বলপ্রদম্। পবিত্রকর মায়ুষ্যমলক্ষ্মী কলি পাপহৃৎ। প্রক্ষালনং মতঃ পাণ্যোঃ পদয়োঃ শুদ্ধিকারণম্॥ মলশ্রমহরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং রাক্ষসাপহম্॥

(২) তক্ষয়েদ্দন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্। কনিষ্ঠিকাগ্রবৎ স্থূলং ঋজ্বগ্রন্থি তথা-ব্রণম্॥

(৩) সময়ঞ্চ সমালোক্য দোষঞ্চ প্রকৃতিং তথা॥ যথোচিতৈঃ রসৈর্বীর্য্যৈ র্যুক্তং কাষ্ঠং প্রয়োজয়েৎ॥ (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড)

(৪) মধুকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা। নিম্বঃ স্যাৎ তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদির স্তথা॥

প্রশমক, অগ্নিদীপ্তি কারক, রুচিকর, মুখের দুর্গন্ধ নাশক এবং দন্তমাংসের দৃঢ়তা সম্পাদক। এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় দন্তকাষ্ঠের গুণ কথিত হইতেছে। আকন্দবৃক্ষে দন্তধাবন করিলে বল, বটবৃক্ষে দীপ্তি, করঞ্জ বৃক্ষে বিজয়, প্লক্ষে (পাকুড়) অর্থ সম্পত্তি, বদরীতে মধুরধ্বনি, খদিরে মুখসৌগন্ধ, বিল্বে বিপুল ধন, যজ্ঞ ডুমুরে বাকসিদ্ধি, আম্রে আরোগ্য, কদম্বে মেধা ও বুদ্ধি, চম্পকে দৃঢ়মতি, শিরীষবৃক্ষে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য, আয়ুর্বৃদ্ধি ও আরোগ্যলাভ, অপামার্গে ধৃতি, মেধা, প্রজ্ঞাশক্তি ও সুস্বর, দাড়িম, অর্জ্জুন ও কুড়চিবৃক্ষে সুন্দর আকার এবং জাতি তগর ও মন্দারবৃক্ষে দন্তধাবন করিলে সুখে নিদ্রা হয় (১)। প্রথমতঃ দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ চর্ব্বণ করিয়া লইবে। অনন্তর সেই চর্ব্বিত অংশ দ্বারা এক একটী করিয়া সমস্ত গুলি দন্তমার্জ্জন করিবে। দন্তমার্জ্জন সময়ে অধিক বল প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাতে দন্ত মাড়ি ক্ষত বিক্ষত হইবার সম্ভাবনা। আবার কেহ কেহ বলেন কোমল কূর্চ্চক (২) দ্বারা দন্তশোধন চূর্ণ ঘর্ষণ করিলেও বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে। এক্ষণে দন্ত শোধন চূর্ণের কথা বলা যাইতেছে। মধু, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই কয়েকটী দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া লইবে। তৈল ও সৈন্ধব লবণ অথবা কেবল তেজবল চূর্ণকেও দন্ত শোধন চূর্ণ বলা যায় (৩)। এই নিয়মানুসারে প্রত্যহ দন্তধাবন করিলে দন্ত, জিহ্বা ও মুখে কোন প্রকার পীড়া এবং মুখে বিকৃত আস্বাদ উৎপন্ন হইতে পারে না। সর্ব্বদা মুখ পরিষ্কৃত

---

(১) অর্কেবীর্য্যং বটে দীপ্তিঃ করঞ্জে বিজয়ো ভবেৎ। প্লক্ষেচৈবার্থ সম্পত্তির্ব্বদর্য্যাং মধুর ধ্বনিঃ॥ খদিরে মুখসৌগন্ধ্যং বিল্বেতু বিপুলং ধনম্। উডুম্বরে তু বাক সিদ্ধিরাম্রে ত্বারোগ্যমেবচ॥ কদম্বে তু ধৃতির্ম্মেধা চম্পকে চ দৃঢ়মতিঃ। শিরীষে কীর্ত্তি সৌভাগ্য মায়ুরারোগ্যমেবচ অপামার্গে ধৃতির্ম্মেধা প্রজ্ঞাশক্তি স্তথা ধ্বনিঃ। দাড়িম্যাং সুন্দরাকারঃ ককুভে কুটজে তথা। জাতী তগর মান্দারৈ দুঃস্বপ্নঞ্চ বিনশ্যতি

(২) বর্ত্তমান ব্রসের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ পূর্ব্বকালে ব্যবহৃত হইত তাহাকে কূর্চ্চক বলা যায়। একৈকং ঘর্ষয়েদ্দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেন তু। দন্ত শোধন চূর্ণেন দন্তমাংসান্যবাধয়ন্॥

(৩) ক্ষৌদ্র ত্রিকটুকাক্তেন তৈলসিন্ধুভবেন বা। চূর্ণেনতেজোবত্যাশ্চ দন্তান্ নিত্যং বিশোধয়েৎ॥　(ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্ব খণ্ড)

তেজবতী-কফশ্বাস কাসাদ্যাময় বাহ্নৎ। পারনাক্ষা কটুস্তিক্তা রুচি বহ্নি প্রদীপনী।
(রাজবল্লভকৃত দ্রব্যগুণ)

ও লঘুভাবাপন্ন হইয়া থাকে (৪)। একনিষিদ্ধ দন্তকাষ্ঠের কথা বলা যাইতেছে। সুপারী, তাল, হিন্তাল, কেতক, বাঁশ, খর্জ্জুর এবং নারিকেল, এই সাতটীকে তৃণরাজক কহে। তৃণরাজক দ্বারা কখনও দন্তধাবন করা উচিত নহে (২)। তদ্দ্বারা কণ্ঠ, তালু ও দন্তমাংস প্রভৃতি ক্ষত বিক্ষত হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এই সকল বৃক্ষ, অত্যন্ত বাতশ্লেষ্মা বর্দ্ধক ও রক্তদূষক, সুতরাং এতদ্দ্বারা নানাপ্রকার মুখরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কণ্ঠ-তালু-ওষ্ঠ-জিহ্বা-দন্ত-দেশ জাত নানাপ্রকার রোগ, মুখপাক, মুখশোষ, শ্বাস, কাস ও বমি প্রভৃতি রোগ, বিদ্যমান থাকিলে কাহারও দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বল, অজীর্ণভুক্ত, শিরঃপীড়া গ্রস্থ, তৃষিত, ক্লান্ত, পথশ্রান্ত পক্ষাঘাত রোগ গ্রস্থ, কর্ণশূলী, নেত্ররোগী, নবজ্বরী, হৃদ্রোগী, হিক্কা ও মূর্চ্ছারোগগ্রস্থ এবং মদান্বিত ব্যক্তিদিগের পক্ষেও দন্তধাবন করা নিতান্ত অন্যায় (৩)। কেন না দন্তধাবন দ্বারা ঐ সকল রোগের বেগ বৃদ্ধি এবং আরও অনেক প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

যথা রীতি দন্তশোধন সমাধা হইলে, দশাঙ্গুল পরিমিত কোন দন্তকাষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র নির্ম্মিত জিহ্বা নির্লেখন দ্বারাও জিহ্বা পরিষ্কার করা যায়। প্রত্যহ জিহ্বা পরিষ্কার করিলে, জিহ্বার মল, বিরসভাব, দুর্গন্ধ ও জড়তা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে। (৪)। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

---

(১) তেনাস্য মুখবৈরস্য দন্তাজিহ্বাস্যজন্ম। গদাঃ। রুচিবৈশদ্য লঘুতা ন ভবন্তি-ভবন্তি চ।

(২) গুবাক স্তাল হিন্তালৌ কেতকশ্চ বৃহত্তৃণং। খর্জ্জুরঃ নারিকেলশ্চ সপ্তৈতে তৃণরাজকাং। তৃণরাজ সমুৎপন্নং যঃ কুর্য্যাদ্দন্ত ধাবনম্। ন . . চ . . . . যাবৎ গঙ্গাং ন পশ্যতি॥

(৩) ন খাদেদ্গল তাল্বোষ্ঠ জিহ্বান্ত গদেষু তৎ। মুখস্য পাকে শোথে চ শ্বাসকাস বমী যু চ॥ দুর্ব্বলোহজীর্ণ ভুক্তশ্চ হিক্কামূর্চ্ছা মদান্বিতঃ। শিরোরুজার্ত্ত স্তৃষিতঃ শ্রান্তো পানক্লমন্বিতাঃ। অর্দ্দিতং কর্ণশূলীনেত্ররোগী—নবজ্বরী। বর্জ্জয়েদ্দন্ত দা . . হৃদ্রোগ যুচ॥

(৪) পাটিতং মৃদু তৎকাষ্ঠং মৃদূপত্রময়ং তথা। দশাঙ্গুলং . . . . তেন জিহ্বাং লিখেৎ সুখম্॥ জিহ্বা নির্লেখনং হৈমং রাজতং তাম্রজঞ্চ বা . . । . জিহ্বা মল বৈরস্য দুর্গন্ধ জড়তা হরম্॥

ক্রোধোৎপত্তি।

পৃথিবীতে মানব মাত্রেই ক্রোধ বিরহিত নহেন। তবে কেহ তাহা সংযম করিতে সমর্থ, কেহবা সম্পূর্ণরূপে তাহারই বশীভূত। ক্রোধ এক প্রকার মানসিক ভাব। কি কারণে এই ভাব উত্তেজিত হয় দেখা যাউক। কেহ কেহ বলেন, কোন প্রকার ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিলেই স্বতই ক্রোধের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, পশুপক্ষী, নিকৃষ্ট প্রাণী, অসভ্য মানব প্রভৃতি সকলেই ক্রোধের বশীভূত, অথচ ন্যায় তাহাদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কিম্বা প্রতিবন্ধকে কোন প্রকার কার্য্য করিলেই ক্রোধ উত্তেজিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিবন্ধক কারণ যদি অদম্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আর ক্রোধ উত্তেজিত হয় না। কখনও কখনও স্নেহ, দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তির গুণেও ক্রোধ সংযমিত হইয়া থাকে। উদাহরণ দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হকরা যাইতে পারে, আমার পীড়া হউক ইহা অবশ্য আমার ইচ্ছা নহে, অথচ আমার পীড়া হইল, এস্থলে আমার ক্রোধ উত্তেজিত হইল না, যেহেতু পীড়ার কারণের উপর আমার কোন প্রকার আধিপত্য নাই। আমার ইচ্ছা; পৃথিবী হইতে দুঃখ, কষ্ট দূরীভূত হউক, কিন্তু তাহা হইতেছে না বলিয়া আমার ক্রোধের আবির্ভাব হয় না, যেহেতু যে কারণে আজ দুঃখ, কষ্ট, সংসারে বিরাজ করিতেছে, সে কারণের উপর আমার কোন প্রকার প্রভুত্ব নাই। পক্ষান্তরে আমার ভৃত্য, আমার ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা করিলে, আমার আর ক্রোধের সীমা থাকে না। কিম্বা অল্পশক্তি সম্পন্ন কোন এক ব্যক্তি আমাদিগের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে, আমারা তাহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া থাকি।

আর একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, ক্রোধ উত্তেজিত হইলেই তাহার বিকাশ হয়। বিকাশ কিরূপে হয় এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। ক্রোধ উত্তেজিত হইবা মাত্র মস্তিষ্কে অধিক পরি-

মাণে রক্ত সঞ্চিত হয়। মস্তিষ্কে এইরূপ রক্তের গতি হওয়াতে, স্নায়বিক শক্তি অধিক পরিমাণে নির্ম্মুক্ত হইয়া, স্নায়ুকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং তথা হইতে বিভিন্ন পথে, পেশী সমূহে গমন করিয়া, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।

শক্তি একবার নির্ম্মুক্ত হইলে, তাহা কোন প্রকার কার্য্য না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না। সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত শক্তি কখন কখন মস্তিষ্কের মাংসপেশীর উপর কার্য্য করিয়া রূঢ় ও কর্কশ বাক্য বাহির করে। উচ্চ বাক্যে বায়ুবিন্দু কম্পিত হয়, এইরূপে সেই স্নায়বীয় শক্তি বায়ু সাগর কম্পিত করিয়া, অবশেষে তন্মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। কখনও বা হস্ত পেশীর উপর কার্য্য করিয়া আশ্চর্য্য অঙ্গভঙ্গি উৎপন্ন করে, এই অঙ্গভঙ্গি যখন কোন প্রকার জীব-জন্তুর শরীরে অবতরণ করে, তখন সেই জন্তুর স্নায়ুসূত্র কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া অবশেষে তাহার মস্তিষ্কে যাইয়া পর্য্যবশিত হয় এবং এইরূপে বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অঙ্গভঙ্গিতে বায়ুসাগর কথঞ্চিৎ আলোড়িত হইয়া স্নায়বীয় শক্তির শেষ হয়। যদি পায়ের পেশী উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে লাথির আকারে জন্তু শরীরে কিম্বা নির্জ্জীব ইষ্টক বা কাষ্ঠে অবতরণ করে, অথবা বায়ুসাগরেই তাহার সমাপ্তি হয়। ক্রোধজনিত স্নায়বীয় শক্তির এইরূপ বহির্ব্বিকাশ হইয়া থাকে, ইহার বিপর্য্যয় ঘটিলে, অন্তর্ব্বিকাশ সাধিত হয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত বিপজ্জনক। কারণ যে শক্তি একবার মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হয়, তাহা পুনরায় মস্তিষ্কে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, সুতরাং তাহা শরীরস্থ ফুস্ ফুস্, হৃদয় প্রভৃতি যন্ত্রে আগমন করিয়া কঠিন রোগের সঞ্চার করিয়া থাকে। কখনও কখনও ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়াতে মূর্চ্ছা এবং ফুসফুসান্তর্গত রক্তাধার ফাটিয়া যাইতে শুনা যায়। তাহা হইলে ক্রোধের অন্তর্ব্বিকাশ যে কিরূপ ভয়ানক ফল উৎপন্ন করে, তাহা বলাই বাহুল্য।

অতএব ক্রোধ উপস্থিত হইলেই তাহার বহির্ব্বিকাশ হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা যেন পুনরায় শরীরে প্রবেশ করিয়া ভীষণ ফল উৎপন্ন না করে। কিন্তু তাহা বলিয়া কোন প্রকার জীবজন্তুর শরীরে যেন ক্রোধের

বহির্বিকাশ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তবে ধর্ম্মাচরণে যাঁহাদের হৃদয় উন্নত এবং যাঁহারা আত্মসংযমে সমর্থ, তাঁহারা ক্রোধের বশীভূত নহেন, ক্রোধই তাঁহাদের সম্যক অধীন। তাঁহাদিগের ন্যায় সংযমী ব্যক্তি ক্রোধের উদ্রেক মাত্র বুঝিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে ক্রোধকে উপযুক্ত ব্যবহারে, কিম্বা সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ। এরূপ ব্যক্তিদিগকে ক্রোধ বিকাশের পক্ষে লক্ষ রাখিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু যাঁহারা ধৈর্য্য প্রভাবে ক্রোধ প্রশমন করিতে অসমর্থ এবং ক্রোধ অন্তরে পোষণ করিয়া শরীর ও মনের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে হয় ক্রোধকে নির্ব্বাণ করা না হয়, সেই ক্রোধ জনিত স্নায়বিক শক্তি বায়ুসাগরে বিলীন করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

সম্পাদকের নিবেদন।

চিকিৎসক ও সমালোচক কার্য্যালয় হইতে মৎকৃত রোগার্থ-চন্দ্রিকা, বিষ-চিকিৎসা এবং ওলাউঠা ও বসন্ত-চিকিৎসার পাণ্ডুলিপি ও কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের প্রবন্ধ অপহৃত হওয়ায়, গ্রাহক বর্গকে তাড়াতাড়ি ২ ফর্ম্মামাত্র ওলাউঠা ও বসন্তচিকিৎসা ছাপাইয়া উপহার দিলাম। এক্ষণে ঈশ্বর কৃপায় এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গের অনুগ্রহে "চিকিৎসক ও সমালোচক" দ্বিতীয় বর্ষে-পদার্পন করিতে চলিল, বোধ-হয় দ্বিতীয় বর্ষে-সমুদায়-ত্রুটি সংশোধন পূর্ব্বক ওলাউঠা ও বসন্ত-চিকিৎসা ও অন্যান্য গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়া গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব। আশা করি গ্রাহকানুগ্রাহক-গণ আমাদের প্রথম বর্ষের সমুদায় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। সম্পাদক।